কার্ল মার্কস
ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

•

রচনা-সংকলন

দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ

•

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয়
অংশ

প্রভপদী ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

সূচি

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

মার্ক্স ও *Neue Rheinische Zeitung*

(১৮৪৮—১৮৪৯)

আমরা যাকে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি বলতাম, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আরম্ভে তা ছিল শুধু একটি স্বল্পসংখ্যকের কোষকেন্দ্র, ছিল গোপন প্রচারমূলক সমিতি হিসাবে সংগঠিত কমিউনিস্ট লীগ। সেই সময়ে জার্মানিতে সঙ্ঘ ও সভাসমিতির কোনো স্বাধীনতা ছিল না বলেই লীগকে গুপ্ত সংগঠন হতে হয়েছিল। বিদেশের বিভিন্ন শ্রমিক সংস্থা থেকে লীগ তার সদস্য সংগ্রহ করত; এই সব সংস্থা ছাড়াও জার্মান দেশেই এর প্রায় ত্রিশটি সমিতি বা বিভাগ ছিল আর নানা জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে সদস্যও ছিল। কিন্তু এই ক্ষুদ্র সংগ্রামী বাহিনীর ছিল একজন প্রথম শ্রেণীর নেতা। তিনি **মার্ক্স**। সবাই স্বেচ্ছায় তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিত। আর তাঁরই দৌলতে লীগ নীতি ও রণকৌশলের এমন এক কর্মসূচি পেয়েছিল যার তাৎপর্য আজো পর্যন্ত পুরোপুরি বজায় আছে। সে কর্মসূচি 'কমিউনিস্ট ইশতেহার।'

এখানে সর্বাগ্রে কর্মসূচির রণকৌশলের অংশটুকু নিয়েই আমাদের আগ্রহ। তার সাধারণ প্রতিপাদ্য হল এই :

'শ্রমিক শ্রেণীর অন্যান্য পার্টিগুলির প্রতিপক্ষ হিসাবে কমিউনিস্টরা স্বতন্ত্র পার্টি গঠন করে না।

সমগ্রভাবে প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র কোনো স্বার্থ তাদের নেই।

প্রলেতারীয় আন্দোলনকে রূপ দেওয়া বা গড়ে পিটে তোলার জন্য তারা নিজস্ব কোনও গোষ্ঠীগত নীতি খাড়া করে না।

শ্রমিক শ্রেণীর অন্যান্য পার্টি থেকে কমিউনিস্টদের তফাতটা শুধু এই : (১) নানা দেশের মজুরদের জাতীয় সংগ্রামের ভিতর তারা **জাতি-নির্বিশেষে** সারা প্রলেতারিয়েতের **সাধারণ স্বার্থটার** দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাকেই সামনে টেনে আনে। (২) বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর লড়াইকে যে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য

দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে হয় তার মধ্যে তারা সর্বদা ও সর্বত্র **সমগ্র আন্দোলনের স্বার্থের** প্রতিনিধিত্ব করে।

সুতরাং কমিউনিস্টরা হল একদিকে **কার্যক্ষেত্রে** প্রতি দেশের শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিগুলির সর্বাপেক্ষা অগ্রসর ও দৃঢ়চিত্ত অংশ — যে অংশ অন্যান্য সবাইকে সামনে ঠেলে নিয়ে যায়। অপরদিকে, **তত্ত্বের দিক দিয়ে** শ্রমিক শ্রেণীর অধিকাংশের তুলনায় তাদের এই সুবিধা যে শ্রমিক আন্দোলনের এগিয়ে যাওয়ার পথ, শর্ত এবং শেষ সাধারণ ফলাফল সম্বন্ধে তাদের স্বচ্ছ বোধ রয়েছে।'*

আর জার্মান পার্টি সম্পর্কে বিশেষ করে বলা হয়েছিল :

'জার্মানিতে বুর্জোয়ারা যখন বিপ্লবী অভিযান করে তখনই কমিউনিস্টরা তাদের সঙ্গে একত্রে লড়ে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র, সামন্ত জমিদারতন্ত্র এবং পেটি বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে।

কিন্তু বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে যে বৈর বিরোধ বর্তমান তার যথাসম্ভব স্পষ্ট স্বীকৃতিটা শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সঞ্চার করার কাজ থেকে তারা মুহূর্তের জন্যও বিরত হয় না; এইজন্য যাতে, বুর্জোয়া শ্রেণী নিজ আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে আসতে বাধ্য, জার্মান মজুরেরা যেন তৎক্ষণাৎ তাকেই বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারে; এইজনাই যাতে, জার্মানিতে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলির পতনের পর যেন বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধেই অবিলম্বে লড়াই শুরু হতে পারে।

কমিউনিস্টরা প্রধানত জার্মানির দিকে মন দিচ্ছে কারণ সে দেশে একটি বুর্জোয়া বিপ্লব আসন্ন.' ইত্যাদি ('ইশতেহার', চতুর্থ পরিচ্ছেদ**)।

এই রণকৌশলগত কর্মসূচি যে পরিমাণ ন্যায্য প্রতিপন্ন হয়েছে তা আর কোনো কর্মসূচি হয়নি। বিপ্লবের প্রাক্কালে ঘোষিত হয়ে এটি সে বিপ্লবের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তারপর থেকে যখনই শ্রমিকদের কোনো পার্টি তাদের কাজকর্মে এর থেকে বিচ্যুত হয়েছে তখনই প্রতিটি বিচ্যুতির শাস্তিও তারা পেয়েছে। আর আজ প্রায় চল্লিশ বছর পরেও এটি মাদ্রিদ থেকে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ পর্যন্ত ইউরোপের সব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সচেতন শ্রমিক পার্টির পথের নিশানা হয়ে রয়েছে।

প্যারিসের ফেব্রুয়ারি মাসের ঘটনাবলীর ফলে জার্মানির আসন্ন বিপ্লব ত্বরান্বিত হল আর তাতে করে সে বিপ্লবের চরিত্র গেল বদলে। নিজস্ব ক্ষমতাবলে জয়লাভ করার

---

* এই উদ্ধৃতিটিতে বড় হরফ এঙ্গেলসের। এই সংস্করণের প্রথম খণ্ডের প্রথম অংশের পৃঃ ৩৮ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

** এই সংস্করণের প্রথম খণ্ডের প্রথম অংশের পৃঃ ৫৭ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

বদলে জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণী জয়ী হল ফরাসী শ্রমিক বিপ্লবের টানে। পুরানো প্রতিদ্বন্দ্বীদের অর্থাৎ নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র, সামন্ততান্ত্রিক ভূমি মালিকানা, আমলাতন্ত্র ও কাপুরুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চূড়ান্ত ফয়সালা করতে পারার আগেই তাকে এক নতুন শত্রুর অর্থাৎ প্রলেতারিয়েতের সম্মুখীন হতে হল। কিন্তু ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের তুলনায় জার্মানির অনেক পশ্চাৎপদ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আর তা থেকে উদ্ভূত তার সমান পশ্চাৎপদ শ্রেণী-সম্পর্কের ফল. সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল।

জার্মান বুর্জোয়া তখন সবেমাত্র তার বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেছে। রাষ্ট্রে নিজের নিঃশর্ত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার শক্তি বা সাহস কোনোটাই তার ছিল না, আর তা করার কোনো চূড়ান্ত প্রয়োজনীয়তাও ছিল না। প্রলেতারিয়েতও সমান অপরিণত। তারা বেড়ে উঠেছিল পরিপূর্ণ মানসিক দাসত্বের মধ্যে। তারা ছিল অসংগঠিত ; স্বতন্ত্র সংগঠন গড়ে তোলার মতো ক্ষমতাও তাদের তখনও হয়নি। বুর্জোয়ার স্বার্থের সঙ্গে তাদের স্বার্থের গভীর বিরোধ সম্বন্ধে কেবল একটা ঝাপসা অনুভূতি তাদের ছিল। তাই মূলতঃ বুর্জোয়ার ভয়াবহ প্রতিপক্ষ হলেও তারা তখনও *বুর্জোয়ার রাজনৈতিক অনুষঙ্গ হিসাবেই রইল*। জার্মান প্রলেতারিয়েত তখন যা ছিল তাই দেখে নয় বরং ভবিষ্যতে সে যা হয়ে উঠবে বলে ভয় ছিল এবং ফরাসী প্রলেতারিয়েত তখনই যা হয়ে উঠেছে, তাই দেখে ভয় পেয়ে বুর্জোয়ারা মনে করল যে, তার পরিত্রাণের একমাত্র পথ হল রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের সঙ্গে কোনো ধরনের একটা আপোস, তা সে আপোস যতই কাপুরুষোচিত হোক না কেন। প্রলেতারিয়েত তখনও নিজের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা জানত না বলে প্রথমে তাদের বেশীর ভাগকে নিয়ে তারা বুর্জোয়াদের অতি-অগ্রণী চরম বামপন্থী অংশের ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হয়। জার্মান শ্রমিকদের সবচেয়ে বড় কাজ ছিল শ্রেণীগত পার্টি হিসাবে স্বতন্ত্র সংগঠন গড়ার জন্য তাদের যেসব অধিকার অপরিহার্য সেগুলি অর্থাৎ মুদ্রণ, সংগঠন আর সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা অর্জন করা। নিজের শাসন ক্ষমতার স্বার্থেই এইসব অধিকারের জন্য লড়াই করা বুর্জোয়ার উচিত ছিল; কিন্তু শ্রমিকদের ভয়ে এখন সে এদের এইসব অধিকারের বিরোধিতা করতে থাকল। যে বিরাট জনসংখ্যাকে অকস্মাৎ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিল তাদের মধ্যে দুএকশত ছাড়া ছাড়া লীগসদস্য হারিয়ে গেল। জার্মান প্রলেতারিয়েত এইভাবে রাজনৈতিক রঙ্গভূমিতে প্রথম অবতীর্ণ হল চরম গণতান্ত্রিক পার্টি হিসাবে।

আমরা যখন জার্মানিতে এক বৃহৎ সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করলাম তখন নিশান কী হবে তা এই থেকেই স্থির হয়ে গেল। সে নিশান একমাত্র গণতন্ত্রের নিশান হওয়াই সম্ভব ছিল। কিন্তু সেটা এমন এক গণতন্ত্র যা সর্বত্র ও সর্বক্ষেত্রে ফুটিয়ে তুলবে তার বিশিষ্ট প্রলেতারীয় চরিত্র যেটা কিন্তু তখনো তার পতাকায় চিরকালের মতো উৎকীর্ণ

করে নেওয়া সম্ভব ছিল না। আমরা যদি তা না করতাম, আন্দোলনে যোগ দিতে, তার তখনই বর্তমান সবচেয়ে অগ্রণী, কার্যত প্রলেতারীয় দিকটার পক্ষ নিয়ে তা আরো এগিয়ে দিতে না চাইতাম তাহলে আমাদের পক্ষে ক্ষুদ্র প্রাদেশিক এক-পাতা কাগজে কমিউনিজম প্রচার করা আর বিরাট সক্রিয় এক পার্টির বদলে অতি ক্ষুদ্র এক সংকীর্ণ সম্প্রদায় গড়া ছাড়া আর কিছু করার থাকত না। কিন্তু বিজনে প্রচারকের ভূমিকা আমাদের জন্য নয়। ইউটোপীয়দের আমরা যে এত ভালো করে পড়েছিলাম, নিজেদের কর্মসূচি রচনা করলাম, সেটা এই উদ্দেশ্যে নয়।

আমরা যখন কলোনে এলাম তখন আংশিকভাবে গণতন্ত্রীদের, আর আংশিকভাবে কমিউনিস্টদের পক্ষ থেকে সেখানে বৃহৎ এক সংবাদপত্রের ব্যবস্থা চলছিল। এটিকে পুরোপুরিভাবে কলোনের সঙ্কীর্ণ স্থানীয় পত্রিকায় পরিণত করে আমাদের বার্লিনে পাঠাবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু প্রধানত মার্কসেরই চেষ্টায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা প্রতিষ্ঠা অর্জন করে নিই আর সংবাদপত্রটি আমাদের হয়ে দাঁড়ায়। এর বদলে আমাদের **হাইনরিখ ব্যুরগের্সকে** সম্পাদকমণ্ডলীতে নিতে হয়েছিল। তিনি (দ্বিতীয় সংখ্যায়) **একটি** প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তারপর আর কোনোদিন লেখেননি।

বার্লিন নয়, বিশেষ করে কলোনই আমাদের প্রয়োজন ছিল। প্রথমত, কলোনই রাইন প্রদেশের কেন্দ্র। রাইন প্রদেশ ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে গেছে, 'কোড নেপোলিয়ন' মারফৎ **আধুনিক** অধিকার-জ্ঞান আয়ত্ত করেছে, নিজস্ব বৃহদায়তন শিল্প গড়ে তুলেছে, আর সর্বদিক দিয়েই তা তখন জার্মানির সবচেয়ে অগ্রণী অংশ। নিজেদের পর্যবেক্ষণ থেকেই আমরা সমসাময়িক বার্লিনকে খুব ভালো করেই চিনতাম। তার বুর্জোয়া তখন সবেমাত্র জন্মগ্রহণ করছে। তার তোষামুদে পেটি বুর্জোয়ার মুখে খুব দুঃসাহস, কিন্তু কাজে তারা কাপুরুষ, আর শ্রমিক শ্রেণী তখনো পর্যন্ত মোটেই বিকাশলাভ করেনি, অসংখ্য আমলাতন্ত্রী, অভিজাত ও দরবারী জঞ্জাল সেখানে। তার পুরো চরিত্রই হল কেবল 'রেসিডেন্সের' মতো। কিন্তু চূড়ান্ত কথা হল: বার্লিনে তখন ঘৃণ্য প্রুশীয় ল্যান্ডর‍্যাখট* বলবৎ রয়েছে আর পেশাদার বিচারকেরা রাজনৈতিক মামলার বিচার করছেন। রাইনে 'কোড নেপোলিয়ন' বলবৎ ছিল, তাতে মুদ্রণ সংক্রান্ত কোনো মামলার প্রশ্নই ছিল না, কারণ আগে থেকেই এতে সেন্সর ব্যবস্থার কথা ধরে নেওয়া হয়েছিল। আর আইন না ভেঙ্গে রাজনৈতিক **অপরাধ** করলে জুরীর সামনে হাজির হতে হত। বার্লিনে বিপ্লবের **পরে** তরুণ শ্লোফেল বাজে কারণে এক বছরের জন্য দণ্ডিত হন। কিন্তু রাইনে আমরা মুদ্রণের শর্তহীন স্বাধীনতা উপভোগ করতাম— আর সেই স্বাধীনতা শেষ বিন্দু পর্যন্ত কাজে লাগাতাম।

* ল্যান্ডর‍্যাখট — সাবেকী সামন্ত আইন। — সম্পাঃ

এইভাবে ১৮৪৮ সালের ১লা জুন আমরা খুব অল্প শেয়ার ক্যাপিটাল নিয়ে কাজ শুরু করলাম। তার খুব সামান্যই মিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আর শেয়ার-হোল্ডাররাও ছিল একান্তই অনির্ভরযোগ্য। প্রথম সংখ্যার পরই তাদের অর্ধেক আমাদের পরিত্যাগ করল আর মাসের শেষে একজনও আর রইল না।

সম্পাদকমণ্ডলীর গঠনতন্ত্র পরিণত হল মার্কসের একনায়কত্বে। বড় একটা দৈনিক পত্রিকা যাকে নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হতে হবে, সেখানে অন্য কোনো ধরনের সংগঠনে স্বীয় নীতির সুসঙ্গত প্রচার সম্ভব নয়। তাছাড়া এ প্রশ্নে আমাদের কাছে মার্কসের একনায়কত্ব ছিল কেমন স্বতঃসিদ্ধ তর্কাতীত, আমরা সবাই সাগ্রহে তা মেনে নিয়েছিলাম। মূলত তাঁর স্বচ্ছদৃষ্টি আর দৃঢ় মনোভাবের জন্যই এই পত্রিকাটি বিপ্লবের বছরগুলিতে সবচেয়ে নাম করা জার্মান সংবাদপত্র হয়ে দাঁড়ায়।

Neue Rheinische Zeitung পত্রিকার রাজনৈতিক কর্মসূচিতে দুটো মূলকথা ছিল: একটি একক অখণ্ড গণতান্ত্রিক জার্মান প্রজাতন্ত্র আর রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ, পোল্যান্ডের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সহ।

সে সময়ে পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্র দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল: উত্তর-জার্মান, — গণতান্ত্রিক এক প্রুশীয় সম্রাটকে মেনে নিতে আপত্তি ছিল না এদের; আর দক্ষিণ জার্মান, সে সময়ে প্রায় পুরোপুরিভাবে ও নির্দিষ্টভাবে বাদেনীয় — এরা সুইজারল্যান্ডের অনুকরণে জার্মানিকে একটি ফেডারাল প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত করতে চাইত। উভয়ের বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই করতে হল। জার্মানির প্রুশীকরণ আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে তার বিভাগ চিরস্থায়ী করা, দুটোই প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের পক্ষে সমান ক্ষতিকর ছিল। এই স্বার্থরক্ষার জন্য জার্মানিকে চূড়ান্তভাবে একটি **জাতি** হিসাবে ঐক্যবদ্ধ করা একান্ত জরুরী হয়ে উঠেছিল। একমাত্র এর ফলেই চিরাচরিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্ত বাধা প্রতিবন্ধক থেকে মুক্ত এমন এক যুদ্ধক্ষেত্রের সৃষ্টি হত যেখানে প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার পরস্পরের শক্তি যাচাই করার কথা। কিন্তু প্রাশিয়ার নেতৃত্বে ঐক্যবন্ধনও ছিল প্রলেতারীয় স্বার্থের একান্ত বিরোধী। জার্মানির বিপ্লবের পক্ষে সত্যকারের একমাত্র যে আভ্যন্তরীণ শত্রুকে উচ্ছেদ করা উচিত ছিল সে হল সমস্ত ব্যবস্থাধারা, সমস্ত ঐতিহ্য ও রাজবংশসহ প্রুশীয় রাষ্ট্র, আর তাছাড়া, জার্মানিকে বিভক্ত করে জার্মান অস্ট্রিয়াকে বাদ দিয়ে তবেই শুধু প্রাশিয়া জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারত। প্রুশীয় রাষ্ট্র ধ্বংস ও অস্ট্রীয় রাষ্ট্র চূর্ণ করে প্রজাতন্ত্র হিসাবে জার্মানির সত্যকারের ঐক্যসাধন, এছাড়া আমাদের আর কোনো আশু বিপ্লবী কর্মসূচি থাকতে পারত না। এবং রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের মাধ্যমে, একমাত্র সেই মাধ্যমেই এ কাজ করা যেত। আমি আবার পরে একথায় ফিরে আসব।

সাধারণত আড়ম্বর গুরুগাম্ভীর্য বা উল্লাসের সুর ছিল না কাগজটিতে। আমাদের

বিরোধীরা ছিল সম্পূর্ণই ঘৃণ্য আর বিনা ব্যতিক্রমে তাদের সকলের প্রতিই ছিল আমাদের চরম ঘৃণা। ষড়যন্ত্রকারী রাজতন্ত্র, দরবারী চক্র, অভিজাততন্ত্র, *Kreuz-zeitung** — সমগ্র সম্মিলিত 'প্রতিক্রিয়া', যাদের সম্পর্কে কূপমণ্ডূকেরা অমন নৈতিক বিরক্তি বোধ করে থাকেন, তাদের প্রতি শুধু ব্যঙ্গ ও উপহাস নিক্ষেপ করতাম আমরা। বিপ্লবের মাধ্যমে রঙ্গমঞ্চে যেসব নতুন পূজ্যজনদের আবির্ভাব ঘটেছিল, অর্থাৎ মার্চ মন্ত্রীবর্গ, ফ্রাংকফুর্ত ও বার্লিন পরিষদ এবং সেখানকার দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী উভয় অংশ, তাদের সম্পর্কেও আমাদের আচরণ ছিল একই। প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধেই ফ্রাংকফুর্ত পার্লামেণ্টের** অকিঞ্চিৎকরতাকে, তার দীর্ঘ বক্তৃতার অনাবশ্যকতাকে, তার ভীরু প্রস্তাবাবলীর উদ্দেশ্যহীনতাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছিল। তার মূল্য হিসাবে আমাদের শেয়ার-হোল্ডারদের অর্ধেককে হারাতে হয়। ফ্রাংকফুর্ত পার্লামেণ্টকে এমনকি একটা বিতর্ক ক্লাবও বলা যেত না, সেখানে প্রায় কোনো বিতর্কই হত না, প্রধানত সেখানে শুধু আগে থেকে তৈরী করা পাণ্ডিত্যপূর্ণ নিবন্ধ পাঠ হত এবং এমন সব প্রস্তাব গৃহীত হত যার উদ্দেশ্য ছিল জার্মান কূপমণ্ডূকদের অনুপ্রেরণা দেওয়া, তবে কেউই সেদিকে দৃষ্টিপাত করত না।

বার্লিন পরিষদের গুরুত্ব এর চেয়ে বেশী ছিল, তাদের বিরুদ্ধে ছিল সত্যিকারের এক শক্তি। শুধু হাওয়ায়, ফ্রাংকফুর্তের মেঘাতীত উচ্চতায় তারা বিতর্ক ও প্রস্তাব গ্রহণ করত না। তাই এদের দিকে বেশি মন দেওয়া হত। কিন্তু সেখানেও শুলৎসে-দেলিচ, বেরেন্দ্‌স, এলস্নার, স্টাইন প্রভৃতি বামপন্থীদের পূজ্যজনদের প্রতিও ফ্রাংকফুর্তের পূজ্যজনদের মতোই তীব্র আক্রমণ চালানো হত; তাদের দৃঢ়তার অভাব, ভীরুতা এবং তুচ্ছ হিসেবীপণাকে নির্মমভাবে উদ্ঘাটন করা হত এবং তারা কীভাবে আপোস মারফৎ ধাপে ধাপে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে তা প্রমাণ করে দেওয়া হত। এর ফলে স্বভাবতই গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়ারা ত্রাস বোধ করত, এই পূজ্যজনদের তারা সবে সৃষ্টি করেছিল নিজের প্রয়োজনেই। তবে এ আতঙ্কে বোঝা গেল আমাদের বাণ ঠিক লক্ষ্যেই বিঁধেছে।

মার্চের দিনগুলির সঙ্গে সঙ্গেই নাকি বিপ্লব শেষ হয়ে গেছে, আর এখন শুধু তার ফল হস্তগত করা বাকি এই বলে পেটি বুর্জোয়া পরম উৎসাহের সঙ্গে যে

---

* ১৮৪৮ সালে বার্লিন থেকে প্রকাশিত রাজতন্ত্রী প্রতিক্রিয়াশীল দৈনিক পত্রিকা *Neue Preussische Zeitung* (নতুন প্রুশীয় গেজেট) *Kreuzzeitung* (ক্রস পত্রিকা) নামে পরিচিত ছিল। এর শীর্ষদেশে ক্রস আঁকা থাকত। — সম্পাঃ

** ফ্রাংকফুর্ত পার্লামেণ্ট — সারা জার্মান জাতীয় সভা, গঠিত হয় ১৮৪৮ সালের মার্চ বিপ্লবের পরে, স্বৈরতন্ত্র ও জার্মান বিখণ্ডীকরণের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রামের জন্য জনগণকে সংগঠিত করার বদলে এটি সম্রাটের সংবিধান নিয়ে নিষ্ফল তর্কবিতর্কে নেমে এসেছিল। — সম্পাঃ

বিভ্রান্তি প্রচার করেছিল আমরা তার বিরুদ্ধেও সমান প্রতিবাদ জানাই। আমাদের কাছে ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ সত্যকার বিপ্লবের তাৎপর্য লাভ করত তখনই যদি সেটা একটি দীর্ঘ বিপ্লবী আন্দোলনের শেষ না হয়ে শুরু হত, মহান ফরাসী বিপ্লবের মতো যার মধ্যে দিয়ে জনগণ তাদের নিজেদের সংগ্রামের ধারায় বিকশিত হয়ে উঠত আর পার্টিগুলি ক্রমশঃ আরো তীক্ষ্নভাবে পৃথক হয়ে হয়ে বড় বড় শ্রেণীগুলির সঙ্গে অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণী, পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী আর প্রলেতারীয় শ্রেণীর সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিশে যেত আর প্রলেতারিয়েত একাধিক লড়াইয়ের মধ্যে একটির পর একটি অবস্থান জিতে নিত। সুতরাং 'আমরা সবাই তো একই জিনিস চাই, সব পার্থক্যের একমাত্র কারণ হল ভুল বোঝাবুঝি,' এই বাঁধাবুলির সাহায্যে গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়া যখনই প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে তার শ্রেণী-বিরোধের কথা চাপা দিতে চাইত তখনই আমরা সর্বত্র তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতাম। কিন্তু পেটি বুর্জোয়াকে আমরা আমাদের প্রলেতারীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা করার সুযোগ যতই কম দিতাম, আমাদের সম্পর্কে তারা ততই নিরীহ এবং আপোসমুখী হয়ে উঠত। যতই তীব্র ও দৃঢ়ভাবে তাদের বিরোধিতা করা যায় ততই তারা নম্র হয়ে ওঠে এবং শ্রমিকদের পার্টিকে ততই সুবিধাদান করতে থাকে। এ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত হয়ে উঠেছি।

শেষত, আমরা বিভিন্ন তথাকথিত জাতীয় পরিষদের পার্লামেন্টীয় ক্রেটিনিজম* (মার্কসের ভাষায়) উদ্ঘাটন করে দিতাম। এই ভদ্রমহোদয়রা ক্ষমতার সব মাধ্যমই হাতছাড়া হয়ে যেতে দিয়েছিলেন — অংশত স্বেচ্ছায় — সেগুলিকে সরকারের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে। বার্লিন ও ফ্রাঙ্কফুর্তে নতুন শক্তিপ্রাপ্ত প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের পাশাপাশি ছিল শক্তিহীন পরিষদগুলি। তারা কল্পনা করত যে, তাদের অক্ষম প্রস্তাবাবলী পৃথিবী উল্টিয়ে দেবে। চরম বামপন্থী পর্যন্ত সকলেই ছিল এই নির্বোধ আত্মপ্রতারণার শিকার। আমরা তাদের বার বার বলতাম, তাদের পার্লামেন্টীয় জয়ই হবে কার্যত তাদের যুগপৎ পরাজয়।

আর বার্লিন ও ফ্রাঙ্কফুর্ত দু জায়গাতেই ঠিক তাই ঘটল। 'বামপন্থীরা' সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই সরকার পরিষদকে ভেঙ্গে দিল। সরকার যে একাজ করতে পারল তার কারণ হল পরিষদ জনগণের আস্থা হারিয়েছিল।

* 'পার্লামেন্টীয় ক্রেটিনিজম' কথাটি মার্কস ও এঙ্গেলসের লেখায় প্রায়ই পাওয়া যায়। 'জার্মানিতে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব' নামক রচনায় এঙ্গেলস লেখেন, '"পার্লামেন্টীয় ক্রেটিনিজম" হল চিকিৎসাতীত এক রোগ, এক ব্যাধি, যার দুর্ভাগা শিকারেরা এই সোল্লাস বিশ্বাসে আচ্ছন্ন যেন গোটা বিশ্ব, তার ইতিহাস, তার ভবিষ্যৎ গতি নির্ধারিত হচ্ছে ঠিক সেই প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাধিক ভোটে, যে প্রতিষ্ঠানটি তাদের সভ্য হিসাবে পেয়ে সম্মানিত হবার সুযোগ পেয়েছে।' — সম্পাঃ

পরে আমি মারাত সম্পর্কে বুজারের বই* পড়ে দেখতে পাই যে, একাধিক ব্যাপারে আমরা না জেনে সত্যিকারের 'জনগণের বন্ধুর' (রাজতন্ত্রীদের নকল 'জনগণের বন্ধু' নয়) মহান আদর্শ অনুকরণ করেছিলাম এবং যে ক্রুদ্ধ গর্জন ও ইতিহাস বিকৃতির ফলে প্রায় এক শতাব্দী ধরে সবাই সম্পূর্ণ বিকৃত এক মারাতের পরিচয় পেয়ে এসেছিল, তার একমাত্র কারণ হল মারাত নির্মমভাবে সেই মুহূর্তের পূজ্যজনদের অর্থাৎ লাফায়েৎ, বায়ির ও অন্যান্যদের মুখোশ টেনে খুলে দিয়েছিলেন এবং দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, তারা ইতিমধ্যেই বিপ্লবের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতক হয়ে উঠেছে। তাছাড়া আমাদের মতো তিনিও এ ঘোষণা চাননি যে, বিপ্লব শেষ হয়েছে, বরং তিনি চেয়েছিলেন বিপ্লব অবিরাম চলুক।

আমরা খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করলাম যে, আমরা যে-ধারার প্রতিনিধি সে ধারা আমাদের পার্টির আসল লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংগ্রাম শুরু করতে পারবে একমাত্র তখনই যখন জার্মানির সমস্ত সরকারী পার্টিগুলির মধ্যে সবচেয়ে চরমপন্থী পার্টিটি ক্ষমতায় আসবে। তখন আমরা হয়ে উঠব তার বিরোধী দল।

কিন্তু ঘটনাচক্রে দাঁড়াল এই যে, আমাদের জার্মান বিরোধীদের ব্যঙ্গ করা ছাড়াও জ্বলাময়ী আবেগও ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল। ১৮৪৮ সালের জুন মাসে প্যারিসের শ্রমিকদের বিদ্রোহ যখন শুরু হয় ততক্ষণে আমরা ঘাঁটি নিয়ে বসেছি। প্রথম গুলিবর্ষণ থেকেই আমরা দৃঢ়ভাবে বিদ্রোহীদের পক্ষ নিলাম। তাদের পরাজয়ের পর মার্কস একটি অত্যন্ত জোরালো প্রবন্ধে পরাজিতদের স্মৃতিতে অঞ্জলি দেন।**

আমাদের অবশিষ্ট শেয়ার-হোল্ডাররাও তখন আমাদের পরিত্যাগ করল। কিন্তু আমাদের এই সন্তোষ রইল যে, জার্মানিতে এবং প্রায় সমগ্র ইউরোপে একমাত্র আমাদেরই কাগজ বিধ্বস্ত প্রলেতারিয়েতের পতাকা উচ্চে তুলে ধরেছিল এমন এক মুহূর্তে যখন সব দেশের বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া পরাজিতদের উদ্দেশে কদর্য গালি বর্ষণ করছে।

আমাদের বৈদেশিক নীতি ছিল সরল: প্রতিটি বিপ্লবী জাতির পক্ষ সমর্থন এবং ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়ার শক্তিশালী দুর্গ রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিপ্লবী ইউরোপের এক সাধারণ যুদ্ধের জন্য আহ্বান। ২৪শে ফেব্রুয়ারি*** থেকে আমাদের কাছে একথাটা

---

* *A. Bougeart, Marat, l'ámi du peuple* (জনগণের বন্ধু মারাত), Paris, 1865, বইটির কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

** কার্ল মার্কসের 'জুন বিপ্লব' দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

*** ২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৮৪৮ — ফ্রান্সে লুই ফিলিপের রাজতন্ত্র উচ্ছেদের দিন।

পুরনো পঞ্জিকা অনুসারে ১৮৪৮ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি (৭ই মার্চ) প্রথম নিকলাই ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের জয়লাভের খবর পেয়ে ইউরোপে বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তুতির জন্য রাশিয়ায় আংশিক সৈন্য-সমাবেশের নির্দেশ দেন তাঁর সমর মন্ত্রীকে। — সম্পাঃ

পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বিপ্লবের সত্যকারের ভয়ংকর শত্রু মাত্র **একটি** -- রাশিয়া, এবং আন্দোলন যতই সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ছে, সংগ্রামে নামার প্রয়োজনীয়তাও এ শত্রুর পক্ষে তত অদম্য হয়ে উঠছে। ভিয়েনা, মিলান ও বার্লিনের ঘটনাবলীর ফলে রুশ আক্রমণ অবশ্য বিলম্বিত হবার কথা, কিন্তু বিপ্লব রাশিয়ার যত কাছে এগিয়ে আসছে সেই আক্রমণের অপরিহার্যতা ততই সুনিশ্চিত হয়ে উঠছে। কিন্তু যদি জার্মানিকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামানো যেত তাহলে হ্যাপসবুর্গ এবং হয়েনৎসলার্নের শেষ হত এবং বিপ্লব সর্বত্র জয়ী হত।

রুশরা যখন সত্যি সত্যি হাঙ্গেরি আক্রমণ করল, সেই মুহূর্ত পর্যন্ত সংবাদপত্রের প্রতিটি সংখ্যায় এই নীতি বিধৃত ছিল। এই আক্রমণ আমাদের ভবিষ্যদ্বাণী পুরোপুরি প্রমাণ করল এবং সুনিশ্চিত করল বিপ্লবের পরাজয়।

১৮৪৯ সালের বসন্তকালে, যখন চূড়ান্ত সংগ্রামের দিন ঘনিয়ে আসছে তখন সংখ্যায় সংখ্যায় সংবাদপত্রটির সুর তীব্র এবং আবেগদীপ্ত হয়ে উঠতে থাকল। 'সিলেজীয় মিলিয়ার্ডে' (৮টি প্রবন্ধ) **ভিলহেলম ভলফ** সিলেজীয় কৃষকদের মনে করিয়ে দিলেন যে, তারা যখন সামন্ততান্ত্রিক অধীনতা থেকে মুক্তি পায় তখন সরকারের সাহায্যে জমিদাররা কীভাবে তাদের টাকা ও জমির ব্যাপারে ঠকিয়েছিল এবং তিনি দাবি করলেন যে, ক্ষতিপূরণ হিসাবে শতকোটি টেলার দিতে হবে।

এইসঙ্গে, এপ্রিল মাসে, **মার্কসের** 'মজুরি-শ্রম ও পুঁজি'* লেখাটি কয়েকটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের আকারে প্রকাশিত হয়ে আমাদের নীতির সামাজিক লক্ষ্য স্পষ্টভাবে নির্ধারিত করে দিল। যে বিরাট সংগ্রামের প্রস্তুতি চলছিল, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি এবং হাঙ্গেরিতে যে বিরোধ তীব্রতর হয়ে উঠছিল, প্রতি সংখ্যায় ও প্রতি বিশেষ সংখ্যায় তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। বিশেষ করে এপ্রিল ও মে মাসের বিশেষ সংখ্যাগুলিতে ছিল জনগণের উদ্দেশে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান।

আমরা যে ৮,০০০ দুর্গসৈন্য ও কারাগার সম্বলিত প্রথম শ্রেণীর এক প্রুশীয় দুর্গের মধ্যে এমন নির্ভয়ে আমাদের কাজ চালিয়ে যেতাম তাতে জার্মানির সর্বত্র বিস্ময় প্রকাশ করা হত। কিন্তু সম্পাদকদের ঘরে ৮টি বন্দুক ও ২৫০টি কার্তুজ এবং কম্পোজিটরদের লাল জ্যাকোবিন টুপির** দরুন আমাদের বাড়িও অফিসারদের কাছে এমন এক দুর্গ বলে প্রতীয়মান হত যা নেহাৎ হানা দিয়ে অধিকার করা সম্ভব নয়।

অবশেষে এল ১৮৪৯ সালের ১৮ই মে তারিখের আঘাত।

* এই সংস্করণের প্রথম খণ্ডের প্রথম অংশের পৃঃ ৬৩—৯৭ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

** লাল টুপি, অথবা ফ্রিজীয় টুপি — প্রাচীন ফ্রিজীয়দের শিরোভূষণ, পরে ১৮ শতকের শেষে ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় হয়ে দাঁড়ায় জ্যাকোবিনদের নিদর্শনী টুপি এবং তখন থেকে এটি স্বাধীনতার প্রতীক। — সম্পাঃ

দ্রেজদেন এবং এলবারফিল্ডে বিদ্রোহ দমিত হল, ইসারলোহ্‌ন বেষ্টিত হল; রাইন প্রদেশ এবং ভেস্তফালিয়া সৈন্যে প্লাবিত হয়ে উঠল। প্রুশীয় রাইনল্যান্ড ধর্ষণের পর তাদের পালাটিনেট ও বাদেনের বিরুদ্ধে পাঠানোর কথা। অবশেষে তখন সরকার আমাদের দিকে এগোবার সাহস পেল। সম্পাদকমণ্ডলীর অনেককে অভিযুক্ত করা হল। অন্যদের অপ্রুশীয় বলে নির্বাসন দেওয়া চলত। এর বিরুদ্ধে কিছুই করার ছিল না কেননা সরকারের পেছনে রয়েছে পুরো একটা সৈন্যবাহিনী। আমাদের দুর্গ সমর্পণ করতে হল। কিন্তু আমরা পিছু হটে এলাম আমাদের অস্ত্রশস্ত্র রসদ সঙ্গে নিয়ে, ব্যান্ড বাজিয়ে, শেষ লাল সংখ্যার পতাকা উড়িয়ে; তাতে আমরা নিষ্ফল অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে কলোনের শ্রমিকদের সাবধান করে দিয়ে বলেছিলাম:

'আপনারা যে সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন তার জন্য *Neue Rheinische Zeitung*-এর সম্পাদকরা বিদায়কালে আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছে। চিরকাল এবং সর্বত্র তাদের শেষ কথা হবে: **শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি।**'

এইভাবে অস্তিত্বের এক বছর পূর্ণ হওয়ার কিছু আগে *Neue Rheinische Zeitung* পত্রিকার অবসান হল। প্রায় কোনো আর্থিক সম্বল ছাড়াই এটি শুরু হয়েছিল -- আমি আগেই বলেছি যে, সামান্য যেটুকুর প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছিল তা-ও আসেনি, -- কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই তার প্রচার প্রায় পাঁচ হাজারে গিয়ে পেঁৗছেছিল। কলোনের অবরুদ্ধ অবস্থার ফলে এটি বন্ধ হয়ে যায়। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি আবার তাকে গোড়া থেকে শুরু করতে হয়। কিন্তু ১৮৪৯ সালের মে মাসে যখন কাগজটি বন্ধ করে দেওয়া হল তখন তার গ্রাহকসংখ্যা আবার ছ' হাজারে গিয়ে পেঁৗছেছিল, যে-ক্ষেত্রে *Kölnische Zeitung* পত্রিকার নিজের স্বীকারোক্তি অনুসারেই গ্রাহকসংখ্যা ন'হাজারের বেশী ছিল না। *Neue Rheinische Zeitung*-এর মতো ক্ষমতা ও প্রভাব, তথা প্রলেতারীয় জনগণকে প্রদীপ্ত করে তোলার সামর্থ্য পরে বা আগে কোনো জার্মান সংবাদপত্রের হয়নি।

এবং এর জন্য সে ঋণী সর্বাগ্রে **মার্কসের কাছে।**

যখন আঘাত এল, সম্পাদকীয় বিভাগের সবাই ছড়িয়ে পড়লেন। **মার্কস** প্যারিসে গেলেন -- সেখানে নাটকের যে শেষ অঙ্কের প্রস্তুতি চলছিল তা অনুষ্ঠিত হল ১৮৪৯ সালের ১৩ই জুন তারিখে*; এখন, যখন ওপর থেকে ভেঙ্গে যাওয়া বা বিপ্লবে

* অন্য জাতির স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ফরাসী সৈন্য নিয়োগ ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সংবিধানে নিষিদ্ধ ছিল। এই সংবিধান লঙ্ঘন করে ইতালিতে বিপ্লব দমনের জন্য ফরাসী সৈন্যবাহিনী প্রেরণের বিরুদ্ধে ১৩ই জুন, ১৮৪৯-এ পেটি বুর্জোয়া পার্টি 'পর্বত' প্যারিসে একটি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করে। সৈন্যবাহিনী দ্বারা বিধ্বস্ত এই শোভাযাত্রার অসাফল্যে ফ্রান্সে পেটি বুর্জোয়া

যোগ দেওয়া এই দুটোর মধ্যে একটাকে বেছে নেওয়ার সময় হল ফ্রাঙ্কফুর্ত পরিষদের, তখন **ভিলহেল্‌ম ভলফ** পরিষদে তাঁর আসন গ্রহণ করলেন, আর আমি পালাটিনেটে গিয়ে ভিলিখের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে অ্যাডজুট্যাণ্ট হলাম।

১৮৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এবং মার্চ মাসের গোড়ায় এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত
১৮৮৪ সালের ১৩ই মার্চ *Sozialdemokrat* পত্রিকায় প্রকাশিত

সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে মুদ্রিত
জার্মান থেকে ইংরেজি অনুবাদের ভাষান্তর

গণতন্ত্রের দেউলিয়াপনাই প্রমাণিত হয়। ১৩ই জুনের পর 'পর্বতের' বহু নেতা তথা তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিদেশী পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা ধৃত ও নির্বাসিত হন অথবা ফ্রান্স ত্যাগ করতে বাধ্য হন। — সম্পাঃ

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

কমিউনিস্ট লীগের ইতিহাস প্রসঙ্গে

১৮৫২ সালে, কলোনের কমিউনিস্টদের দণ্ডাদেশের সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্র জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম যুগের উপর যবনিকা পড়ল। আজ এ যুগের কথা প্রায় সবাই ভুলে গেছে। কিন্তু ১৮৩৬ সাল থেকে ১৮৫২ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এ যুগ, এবং বিদেশে জার্মান শ্রমিকদের বিস্তারলাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সমস্ত সংস্কৃতিমান দেশেই আন্দোলন অবারিত হয়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয়। বর্তমান আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন মূলগতভাবে সে যুগের জার্মান শ্রমিক আন্দোলনেরই সরাসরি ক্রমানুবর্তন। সেটি ছিল সাধারণভাবে **প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন**, এবং পরে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতিতে যাঁরা নেতৃত্ব করছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই এসেছিলেন এর ভেতর থেকে। আর কমিউনিস্ট লীগ ১৮৪৭ সালে 'কমিউনিস্ট ইশতেহারের' যে তাত্ত্বিক মূলনীতি তার পতাকায় লিখে নিয়েছিল তা আজও ইউরোপ ও আমেরিকা উভয় মহাদেশের সমগ্র প্রলেতারীয় আন্দোলনের দৃঢ়তম আন্তর্জাতিক বন্ধন হয়ে রয়েছে।

এখন পর্যন্ত এই আন্দোলনের সুসংবদ্ধ ইতিহাসের মূল উৎস একটিই পাওয়া গেছে। এটি হল তথাকথিত কালা কিতাব, ভের্মুৎ ও স্তিবার লিখিত 'ঊনবিংশ শতাব্দীর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র', বার্লিন, দুই খণ্ড, ১৮৫৩ ও ১৮৫৪। এই স্থূল সংকলনটি ইচ্ছাকৃত বহু মিথ্যাভাষণে পূর্ণ। আমাদের শতকের সবচেয়ে ঘৃণ্য ও জঘন্য দুজন পুলিশ এটি উদ্ভাবন করেছে। তবু সে যুগ সম্পর্কে অকমিউনিস্ট সমস্ত রচনার আদি উৎস এখনও এটিই।

আমি এখানে শুধু সংক্ষিপ্ত একটি বর্ণনাই দিতে পারি এবং তাও যে পরিমাণে লীগের কথা আসে কেবল সেই পরিমাণে এবং 'স্বরূপ প্রকাশ'* বোঝার জন্য যেটুকু

* এঙ্গেলসের এই রচনাটি লেখা হয়েছিল মার্কসের 'কলোনে কমিউনিস্টদের বিচারের স্বরূপ প্রকাশের' তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা হিসেবে। — সম্পাঃ

একান্ত প্রয়োজন শুধু সেইটুকুই। আশা করি, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের যৌবনের সেই গৌরবময় পর্বের ইতিহাস সম্পর্কে আমি ও মার্কস যে মূল্যবান তথ্যাবলী সংগ্রহ করেছি তা গুছিয়ে তোলার সুযোগ আমি হয়ত কোনোদিন পাব।

* * *

জার্মান দেশান্তরীগণ কর্তৃক ১৮৩৪ সালে প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক-প্রজাতন্ত্রী গুপ্ত 'বিধিবহির্ভূতদের লীগ' থেকে সবচেয়ে চরমপন্থী ও প্রধানত প্রলেতারীয় অংশটি ১৮৩৬ সালে আলাদা হয়ে গিয়ে নতুন একটি গুপ্ত সমিতি, **'ন্যায়নিষ্ঠদের লীগ'** গঠন করল। আদি যে সংগঠনে বাকি ছিল কেবল ইয়াকব ভেনেদেই-র মতো অতি নিষ্কর্মারা, সেটির শীঘ্রই পুরোপুরি মৃত্যু হল: ১৮৪০ সালে যখন পুলিস জার্মানিতে এদের কয়েকটি শাখা খুঁজে বের করে তখন তাদের আসল চেহারার ছায়াটুকু পর্যন্ত প্রায় অবশিষ্ট নেই। কিন্তু নতুন লীগটি তুলনামূলকভাবে দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকল। বাবোভিজম* ধারার সঙ্গে যুক্ত যে ফরাসী শ্রমিক কমিউনিজম এই সময়ে প্যারিসে গড়ে উঠছিল, এটি গোড়ায় ছিল তারই জার্মান অংশবিশেষ; 'সাম্যের' অপরিহার্য ফল হিসেবে সম্পত্তির সাধারণ মালিকানা দাবি করা হত। উদ্দেশ্য ছিল সে যুগের প্যারিসের গুপ্ত সংগঠনগুলির মতোই: অর্ধেক প্রচারমূলক সংগঠন, অর্ধেক ষড়যন্ত্রমূলক। তবে প্যারিসকেই বরাবর বিপ্লবী কার্যকলাপের কেন্দ্রস্থল হিসেবে ধরা হত, যদিও সুযোগ এলে জার্মানিতেও অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি বাদ যেত না। কিন্তু প্যারিস চূড়ান্ত যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে রইল বলে লীগ সে যুগে আসলে ফরাসী গুপ্ত সংগঠনের, বিশেষ করে ব্লাঙ্কি ও বার্বে পরিচালিত যে 'ঋতু সমিতির'** সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখত, তার জার্মান শাখার বেশী কিছু হয়ে ওঠেনি। ১৮৩৯ সালে ১২ই মে ফরাসীরা অভ্যুত্থান শুরু করল। লীগের শাখারাও এগিয়ে যায় তাদের সঙ্গে এবং তাদের সঙ্গেই একত্রে সাধারণ পরাজয় বরণ করে।

---

* বাবোভিজম — অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের যুগের গ্রাকাস বাবোফ নামে এক ফরাসী ইউরোপীয় কমিউনিস্টের মতবাদ। — সম্পাঃ

** Société des Saisons ('ঋতু সমিতি') — গোপন প্রজাতন্ত্রী সমাজতান্ত্রিক ষড়যন্ত্রমূলক সংগঠন। ব্লাঙ্কি ও বার্বের নেতৃত্বে ১৮৩৭—১৮৩৯ সালে প্যারিসে সক্রিয় ছিল।

প্যারিসে ১৮৩৯ সালের ১২ই মে-র অভ্যুত্থানে প্রধান ভূমিকা নেয় বিপ্লবী শ্রমিকেরা, 'ঋতু সমিতি' এটির আয়োজন করে; ব্যাপক জনগণের উপর নির্ভর না করায় সরকারী সৈন্যদল ও জাতীয় রক্ষিবাহিনীর হাতে অভ্যুত্থান বিধ্বস্ত হয়। — সম্পাঃ

যেসব জার্মান গ্রেপ্তার হল তাদের মধ্যে ছিলেন **কার্ল শাপার** ও **হাইনরিখ বাউয়েরও**। বেশ দীর্ঘদিন কারাবাসের পর তাঁদের নির্বাসন দিয়ে তুষ্টি লাভ করল লুই ফিলিপের সরকার। দুজনেই লন্ডনে চলে গেলেন। শাপার এসেছিলেন নাসাউয়ের ওয়েলবুর্গ থেকে। ১৮৩২ সালে তিনি যখন গিয়েসেনে বনবিদ্যা কলেজের ছাত্র তখনই গিওর্গ ব্যুখনার পরিচালিত ষড়যন্ত্রে যোগ দেন। ১৮৩৩ সালের ৩রা এপ্রিল ফ্রাঙ্কফুর্তের পুলিস-ফাঁড়ি আক্রমণে অংশ নেন, তারপর বিদেশে পালিয়ে যান এবং ১৮৩৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাৎসিনির স্যাভয় অভিযানে যোগ দেন। ৩০-এর দশকে যেসব পেশাদার বিপ্লবীর কিছুটা ভূমিকা ছিল, তিনি ছিলেন তাদের নিদর্শনস্বরূপ — দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ, যে কোনো মুহূর্তে জীবন সম্পদ এমনকি জীবনটাই বিপন্ন করতে তৈরি এক বীরপুরুষ। চিন্তাধারায় কিছুটা আলস্য থাকা সত্ত্বেও গভীর তাত্ত্বিক উপলব্ধির ক্ষমতাও তাঁর ছিল, তার প্রমাণ 'ডেমাগগ' (demagogue)* থেকে তিনি রূপান্তরিত হলেন কমিউনিস্টে, এবং একবার যে জিনিষটা স্বীকার করে নিলেন তা আঁকড়ে রইলেন আরও অটলভাবে। ঠিক এই কারণেই সময়ে সময়ে তাঁর বিপ্লবী উদ্দীপনা বিচারবুদ্ধির বিরুদ্ধে যেত। তবে সবক্ষেত্রেই তিনি পরে নিজের ভুল বুঝতেন এবং খোলাখুলিভাবে তা স্বীকার করতেন। তিনি ছিলেন বিরাট পুরুষ আর জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের আদি সংগঠনের কাজে তাঁর অবদান কোনোদিনই ভোলার নয়।

ফ্রাঙ্কনিয়ার হাইনরিখ বাউয়ের জুতা তৈরী করতেন। সজীব, সজাগ ও রসিক ছোকরা। কিন্তু তাঁর ক্ষুদ্র দেহে অনেকখানি চাতুর্য ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞাও লুকিয়ে ছিল।

প্যারিসে শাপার কম্পোজিটারের কাজ করতেন। লন্ডনে এসে তিনি ভাষা শিক্ষক হিসেবে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা শুরু করলেন। আর দুজনেই লেগে গেলেন ছিন্ন সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে। লন্ডনকে তাঁরা লীগের কেন্দ্র করে তুললেন। এখানে, হয়তো বা আরো আগে প্যারিসেই, তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন কলোনের ঘড়ি নির্মাতা **জোসেফ মল**। মাঝারি আকারের, হার্কিউলিসের মতো চেহারা তাঁর। কতবার যে শাপার ও তিনি হলের দরজায় দাঁড়িয়ে শতখানেক বিরোধীর আক্রমণ রুখেছেন তার ইয়ত্তা নেই। উৎসাহ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার দিক থেকে তিনি তাঁর দুই কমরেডেরই সমতুল্য

---

* নেপোলিয়নীয় ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধের পরবর্তী পর্বে, জার্মান বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানগুলির এক বিরোধী আন্দোলন, জার্মান রাষ্ট্রগুলির প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার বিরোধিতা এবং জার্মান ঐক্যের দাবিতে রাজনৈতিক শোভাযাত্রা সংগঠন করত। এই বিরোধী আন্দোলনের অংশীদারদের জার্মান প্রতিক্রিয়াশীলেরা ১৮১৯ সালে 'ডেমাগগ' বলে অভিহিত করে এবং প্রতিক্রিয়াশীল সরকারেরা 'ডেমাগগদের' বিরুদ্ধে পুলিসী হানা চালায়। — সম্পাঃ

আর বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে উভয়েরই ঊর্ধ্বে। শুধু এই নয় যে তিনি একজন আজন্ম কূটনীতিক, যার প্রমাণ হয়ে যায় বিভিন্ন দৌত্যে তাঁর অসংখ্য সফরের সাফল্য থেকে। **তাত্ত্বিক সমস্যায়ও তাঁর সামর্থ্য ছিল বেশী।** ১৮৪৩ সালে লন্ডনে এই তিনজনেরই সঙ্গে আমার আলাপ হয়। এঁরাই হলেন আমার দেখা প্রথম বিপ্লবী প্রলেতারীয়। সে সময় খুঁটিনাটি বিষয়ে আমাদের যতই মত পার্থক্য থাকুক না কেন — তাঁদের সংকীর্ণ সমতাবাদী কমিউনিজমের* বিপরীতে আমার ছিল ঠিক সমান সংকীর্ণ দার্শনিক ঔদ্ধত্য — এই সত্যকারের মানুষ তিনটি আমার মনে যে গভীর ছাপ এঁকে দিয়েছিলেন সে কথা কোনোদিন ভুলব না আমি, যে আমি তখন সবে মানুষ হতে চাইছি।

লন্ডনে, এবং আরেকটু কম মাত্রায় সুইজারল্যান্ডে, তাঁরা সংঘবদ্ধ হওয়ার ও সভাসমিতি করার স্বাধীনতা উপভোগ করতেন। ১৮৪০ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারিতেই 'জার্মান শ্রমিকদের শিক্ষা সংঘ' নামে আইনসঙ্গত সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হল। এটি এখনও আছে। এই সংঘ লীগে নতুন সদস্য সংগ্রহের ক্ষেত্র হিসাবে কাজ করত, এবং বরাবরের মতো এখানেও কমিউনিস্টরাই সংঘের সবচাইতে সক্রিয় ও বুদ্ধিমান সদস্য ছিল বলে স্বাভাবিকভাবেই সংঘের নেতৃত্ব পুরোপুরিভাবে গিয়ে পড়ল লীগের হাতে। কিছুদিনের মধ্যেই লন্ডনে লীগের কয়েকটি সমিতি, বা তখনো পর্যন্ত তাদের যা বলা হত, 'লজ' গড়ে উঠল। সুইজারল্যান্ডে ও অন্যান্য জায়গাতেও ঠিক একই স্বতঃসিদ্ধ নীতি অনুসরণ করা হল। যেখানে শ্রমিকদের সংঘ গড়া সম্ভব হত, সেখানেই সেগুলিকে একইভাবে কাজে লাগানো হত। যেখানে সংঘ গড়া বেআইনী ছিল সেখানে গায়ক সংঘ, ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে যোগ দেওয়া হত। যোগাযোগ রক্ষা করা হত প্রধানত এমন সব সদস্য দিয়ে যারা অনবরত যাতায়াত করত। প্রয়োজন হলে তারা দূত হিসাবেও কাজ করত। সরকারের বিচক্ষণতা লীগকে উভয় ব্যাপারেই খুব সাহায্য করত। কারণ, নির্বাসনদণ্ড প্রয়োগ করে সরকার যে-কোনো আপত্তিজনক শ্রমিককেই দূতে পরিণত করত। আর এই ধরনের শ্রমিকদের দশজনের মধ্যে ন জনই ছিল লীগের সদস্য।

পুনঃস্থাপিত লীগ বেশ বিস্তারলাভ করল। বিশেষত সুইজারল্যান্ডে **ভাইৎলিং, আগস্ত বেকার** (খুবই প্রতিভাবান লোক, কিন্তু অন্যান্য বহু জার্মানের মতো চরিত্রের আভ্যন্তরীণ দৃঢ়তার অভাবে এঁরও সর্বনাশ হয়) এবং অন্যান্যরা মোটামুটিভাবে ভাইৎলিং-এর কমিউনিস্ট ব্যবস্থার অনুগামী একটা খুবই শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুললেন। ভাইৎলিং-এর কমিউনিজমের সমালোচনা করার জায়গা এটা নয়। কিন্তু জার্মান প্রলেতারিয়েতের প্রথম স্বাধীন তাত্ত্বিক আলোড়ন হিসাবে তার তাৎপর্যের কথা বলতে

* আগেই বলেছি সমতাবাদী কমিউনিজম বলতে আমি বুঝি শুধুমাত্র সেই কমিউনিজম যার একমাত্র বা প্রধান ভিত্তি হল সমতার দাবি। (এঙ্গেলসের টীকা।)

গেলে মার্কস ১৮৪৪ সালে প্যারিসে *Vorwärts** পত্রিকায় যা লিখেছিলেন তা আমি আজও সমর্থন করি। মার্কস লিখেছিলেন: '(জার্মান) বুর্জোয়া তথা তার দার্শনিকবৃন্দ ও পন্ডিতবর্গ **বুর্জোয়ার মুক্তির** বিষয়ে — তার রাজনৈতিক মুক্তির বিষয়ে — এমন কোন রচনা হাজির করতে পারে যা ভাইৎলিং-এর "সামঞ্জস্য ও স্বাধীনতার গ্যারাণ্টি" বইটির সঙ্গে তুলনীয়? জার্মান শ্রমিকদের এই অতুলনীয় ও উজ্জ্বল প্রথম প্রচেষ্টার সাথে জার্মান রাজনৈতিক সাহিত্যের একঘেয়ে ভীরু মাঝারিপনার তুলনা করলে, **প্রলেতারিয়েতের শিশুকালের এই বিরাট পাদুকার** সঙ্গে বুর্জোয়ার ক্ষয়প্রাপ্ত রাজনৈতিক পাদুকার বামনাকারের তুলনা করলে এ ভবিষ্যদ্বাণী করতেই হবে যে, এই সিন্ডারেলার দেহ হবে মল্লবীরোচিত।' এই মল্লবীর আজ আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যদিও পূর্ণ অবয়ব পেতে তার এখনো দেরি আছে।

জার্মানিতেও লীগের অনেক শাখা ছিল। স্বভাবতই এগুলির প্রকৃতি ছিল অস্থায়ী। কিন্তু যতগুলি ভেঙ্গে যেত তার চেয়ে গড়ে উঠত অনেক বেশী। সাত বছর পরেই কেবল ১৮৪৬ সালের শেষে পুলিস বার্লিনে (মেণ্টেল) ও মাগদেবুর্গে (বেক) লীগের অস্তিত্বের চিহ্ন পায়, কিন্তু আর বেশি খোঁজ বার করতে পারেনি।

প্যারিস ছেড়ে সুইজারল্যান্ডে যাবার আগে ভাইৎলিংও সেখানে লীগের বিক্ষিপ্ত অংশগুলিকে একত্রিত করলেন। তিনি ১৮৪০ সালেও প্যারিসে ছিলেন।

লীগের কেন্দ্র ছিল দর্জিরা। সুইজারল্যান্ড, লন্ডন, প্যারিস — সর্বত্রই জার্মান দর্জিদের দেখা মিলত। প্যারিসে দর্জিদের মধ্যে জার্মান ভাষার প্রচলন এত বেশী ছিল যে, ১৮৪৬ সালে সেখানে আমার এমন একজন নরওয়ে দর্জির সঙ্গে আলাপ হয় যিনি এক্সজেম থেকে সোজা সমুদ্রপথে ফ্রান্সে এসেছেন এবং ১৮ মাসে ফরাসী ভাষার প্রায় একটা কথাও না শিখলেও জার্মান শিখেছেন অতি চমৎকার। ১৮৪৭ সালে প্যারিসে সমিতিগুলির মধ্যে দুটি ছিল প্রধানত দর্জিদের নিয়ে তৈরী আর একটি আসবাব-বানিয়ে সূত্রধরদের নিয়ে।

ভারকেন্দ্র প্যারিস থেকে লন্ডনে সরে আসার পর একটা নতুন বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠল: জার্মান লীগ ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠল **আন্তর্জাতিক**। শ্রমিক সংঘে জার্মান এবং সুইস ছাড়া আরও এমন সব জাতির লোক দেখা যেত যাদের প্রধানত জার্মান ভাষার মাধ্যমেই বিদেশীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হত -- অর্থাৎ স্ক্যান্ডিনেভীয়, ওলন্দাজ, হাঙ্গেরীয়, চেক, দক্ষিণ স্লাভ এবং রুশ ও আলসেসীয়দেরও। ১৮৪৭ সালে নিয়মিত যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে রক্ষিবাহিনীর ইউনিফর্ম পরিহিত একজন ব্রিটিশ

---

* *Vorwärts* (আগুয়ান) — ১৮৪৪ সালে প্যারিস থেকে জার্মান ভাষায় প্রকাশিত জার্মান সমাজতন্ত্রী-দেশান্তরীদের র‍্যাডিকেল পত্রিকা। মার্কস ছিলেন এর অন্যতম সহযোগী। — সম্পাঃ

গ্রিনেডিয়ারও ছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সমিতির নাম দাঁড়াল **কমিউনিস্ট** শ্রমিক শিক্ষা সংঘ। আর সদস্যদের কার্ডে, 'সব মানুষই ভাই' এই কথাটি লেখা থাকত অন্তত বিশটি ভাষায়, অবশ্য দুচারটে ভুল যে তাতে থাকত না তা নয়। প্রকাশ্য সমিতিটির মতো গুপ্ত লীগের চরিত্রও কিছুদিনের মধ্যেই আরো আন্তর্জাতিক রূপ ধারণ করল। প্রথম দিকে সেটা অবশ্য সীমাবদ্ধ অর্থে: কার্যক্ষেত্রে -- সদস্যদের বিভিন্ন জাতিসত্তার মারফত, আর তত্ত্বের ক্ষেত্রে — এই উপলব্ধির মাধ্যমে যে, কোনো বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হতে গেলে তা ইউরোপীয় বিপ্লব হওয়া চাই। তখন পর্যন্ত আর বেশী দূর এগোনো যায়নি, কিন্তু ভিত্তিটা পাতা ছিল।

ফরাসী বিপ্লববাদীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা হত লণ্ডনস্থ দেশান্তরীদের, ১৮৩৯ সালের ১২ই মে তারিখের সংগ্রামসঙ্গীদের মাধ্যমে। র‍্যাডিকেল-পন্থী পোলদের সঙ্গেও তেমনি যোগাযোগ রাখা হত। পোলীয় দেশান্তরী বলে যারা সরকারীভাবে পরিচিত তারা এবং মাৎসিনি অবশ্য আমাদের বন্ধুর বদলে বরং বিরোধীই ছিলেন। ইংরেজ চার্টিস্টদের* আন্দোলনের বিশিষ্ট ইংরেজ চরিত্রের দরুন তাদের অবিপ্লবী বলে উপেক্ষা করা হত। অনেক পরে, আমার মাধ্যমে তাদের সাথে লীগের লণ্ডনস্থ নেতাদের যোগাযোগ হয়।

ঘটনাবলীর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্যদিকেও লীগের চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছিল। তখনো পর্যন্ত প্যারিসকে -- সেকালের পক্ষে সঙ্গত কারণেই -- বিপ্লবের উৎসস্থল বলে মনে করা হলেও প্যারিসের ষড়যন্ত্রকারীদের উপর নির্ভরশীলতা ইতিমধ্যে কেটে গিয়েছিল। লীগের বিস্তারলাভের ফলে তার আত্মসচেতনতাও বৃদ্ধি পেল। বোঝা গেল যে, জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে লীগের ভিত্তি ক্রমেই দৃঢ় হয়ে উঠছে আর উত্তর ও পূর্ব ইউরোপের শ্রমিকদের পতাকাবাহী রূপে কাজ করার ঐতিহাসিক নির্বন্ধ এসে পড়েছে এই জার্মান শ্রমিকদের উপর। ভাইৎলিং-এর মধ্যে এমন একজন কমিউনিস্ট তাত্ত্বিককে পাওয়া গিয়েছিল যাঁকে অসংকোচে তাঁর সমসাময়িক ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বীদের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেওয়া যেত। আর শেষ কথা, ১২ই মে-র অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এই জিনিষটা শিখেছিলাম যে, বলপূর্বক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে তখনকার মত কোনো ফল হবে না। তবু যে প্রতি ঘটনাকেই আসন্ন ঝড়ের সংকেত বলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হত, তবু যে পুরনো, আধা-ষড়যন্ত্রমূলক নিয়মাবলীই অক্ষুণ্ণ রাখা হত, তা ছিল প্রধানত পুরনো

* চার্টিস্টবাদ — দুঃসহ অর্থনৈতিক অবস্থা ও রাজনৈতিক অধিকারহীনতার ফলে উদ্ভূত ইংরেজ শ্রমিকদের গণবিপ্লবী আন্দোলন। আন্দোলন শুরু হয় ১৯ শতকের ৩০-এর দশকের শেষে বড়ো বড়ো সভা-মিছিলের মারফত এবং থেমে থেমে তা চলে ৫০-এর দশকের গোড়া পর্যন্ত। চার্টিস্ট আন্দোলনের অসাফল্যের প্রধান কারণ হল সুসঙ্গত বিপ্লবী প্রলেতারীয় নেতৃত্ব ও পরিচ্ছন্ন কর্মসূচির অভাব। — সম্পাঃ

বিপ্লবীদের একগুঁয়েমির দোষ, যার সঙ্গে ক্রমশ উদীয়মান সঠিকতর মতবাদের সংঘর্ষ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল।

যাই হোক, লীগের সামাজিক মতবাদ অনির্দিষ্ট হলেও তার মস্ত বড় একটা গলদ ছিল, যার মূল ছিল তখনকার পরিস্থিতির মধ্যেই। সদস্যদের মধ্যে যাঁরা শ্রমিক তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন হস্তশিল্পী। বড় বড় শহরগুলিতেও সাধারণত ক্ষুদ্র মালিকই তাঁদের শোষণ করত। দর্জির হস্তশিল্পকে একজন বৃহৎ পুঁজিপতির স্বার্থে চালানো একটা গার্হস্থ্য শিল্পে পরিণত করে বৃহদাকারে দর্জিবৃত্তি, অর্থাৎ যাকে এখন বলা হয় তৈরি পোষাকের উৎপাদন, সেরূপ শোষণ এমনকি লণ্ডনেও তখন সবে শুরু হচ্ছে। একদিকে এই কারিগরদের শোষণ করত ক্ষুদ্র মালিক। অন্যদিকে তাঁরা প্রত্যেকেই আশা রাখতেন যে, শেষে তাঁরা নিজেরাই ক্ষুদ্র মালিক হয়ে উঠবেন। তার উপর সে সময়ে জার্মান হস্তশিল্পীদের মনে উত্তরাধিকার-সূত্রে-প্রাপ্ত বহু গিল্ডযুগীয় ধারণাও থেকে গিয়েছিল। তাঁরা তখনো পুরোপুরি প্রলেতারীয় হয়ে ওঠেননি, তখন পর্যন্ত তাঁরা ছিলেন পেটি বুর্জোয়ার উপাঙ্গ মাত্র। এই উপাঙ্গটি তখন আধুনিক প্রলেতারিয়েতে রূপান্তরিত হচ্ছে, কিন্তু বুর্জোয়া অর্থাৎ বৃহৎ পুঁজির বিরুদ্ধে সরাসরিভাবে তখনও পর্যন্ত দাঁড়ায়নি। তাহলেও এই হস্তশিল্পীরা যে সহজাত প্রবৃত্তিবশে নিজেদের ভবিষ্যৎ বিকাশের ধারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং পূর্ণ সচেতনতার সঙ্গে না হলেও নিজেদের যে তাঁরা প্রলেতারিয়েতের পার্টি হিসেবে সংগঠিত করতে পেরেছিলেন, সেইজন্যই তাঁদের সর্বোচ্চ সম্মান প্রাপ্য। কিন্তু তখনকার সমাজকে খুঁটিনাটিতে সমালোচনা করতে গেলেই অর্থাৎ অর্থনৈতিক তথ্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গেলেই তাঁদের হস্তশিল্পসুলভ পুরনো সব কুসংস্কার প্রতিপদেই যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, সেটাও অনিবার্য। আর আমার বিশ্বাস হয় না যে, পুরো লীগের মধ্যে তখন এমন একজন লোকও ছিলেন যিনি অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে একটি বইও পড়েছেন। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু এসে যেত না। তখনকার মতো 'সমতা', 'ভ্রাতৃত্ব' ও 'ন্যায়'এর সাহায্যে তাঁরা তাত্ত্বিক সব বাধা পার হয়ে যেতেন।

ইতিমধ্যে লীগ ও ভাইৎলিং-এর কমিউনিজমের পাশাপাশি আরেকটি মূলগতভাবে আলাদা ধরনের কমিউনিজম বিকাশলাভ করছিল। আমি যখন ম্যাঞ্চেস্টারে ছিলাম তখন আমায় ঠেকে শিখতে হয় যে, এতদিন পর্যন্ত যদিও অর্থনৈতিক তথ্যাবলী ইতিহাস রচনায় কোনোও স্থানই পায়নি বা নিতান্ত তুচ্ছ স্থানই পেয়েছে, তবু, অন্তত আধুনিক জগতে তা এক নির্ধারক ঐতিহাসিক শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে: এই অর্থনৈতিক তথ্যাবলীই হল আজকের দিনের শ্রেণীবিরোধ উদ্ভবের ভিত্তি; বৃহদায়তন শিল্পের কল্যাণে যেসব দেশে এইসব শ্রেণীবিরোধ পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে, সুতরাং বিশেষভাবে ইংলণ্ডে, সে সব দেশে তা আবার রাজনৈতিক পার্টিগঠনের ও পার্টিসংঘাতের, আর তার ফলে

সব রাজনৈতিক ইতিহাসেরও ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্কসও এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছিলেন শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যেই 'জার্মান ফরাসী বার্ষিকীতে' (১৮৪৪)* তিনি তার এই মর্মে সাধারণীকরণ হাজির করেন যে, সাধারণভাবে বলতে গেলে রাষ্ট্র নাগরিক সমাজকে নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে না বরং সমাজই রাষ্ট্রকে নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেইহেতু অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও তার বিকাশ থেকেই রাজনীতি ও তার ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করতে হবে, বিপরীতভাবে নয়। ১৮৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে যখন আমি প্যারিসে মার্কসের সঙ্গে দেখা করি তখন তত্ত্বগত সমস্ত ক্ষেত্রেই আমাদের পূর্ণ মতৈক্য পরিষ্কার হয়ে উঠল। আর তখন থেকেই শুরু হয় আমাদের মিলিত কাজ। ১৮৪৫ সালের বসন্তকালে ব্রাসেল্‌সে আবার যখন আমাদের দেখা হয় তার মধ্যেই মার্কস উপরিউক্ত ভিত্তি থেকে ইতিহাসের বস্তুবাদী তত্ত্বকে তার প্রধান দিকগুলিতে পুরোপুরি বিকশিত করে তুলেছেন। এবার আমরা এই নব-অর্জিত দৃষ্টিভঙ্গিকে বিভিন্নতম দিকে বিশদে সংরচিত করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম।

এই যে আবিষ্কারটি ইতিহাসবিজ্ঞানে বিপ্লব এনেছিল, সেটা আমরা দেখেছি প্রধানত মার্কসেরই কীর্তি, এতে আমি খুবই নগণ্য অংশই দাবি করতে পারি। তৎকালীন শ্রমিক আন্দোলনে কিন্তু এ আবিষ্কারের একটা প্রত্যক্ষ গুরুত্বও ছিল। ফরাসী ও জার্মানদের মধ্যে কমিউনিজমকে, ইংরেজদের মধ্যে চার্টিস্টবাদকে তখন আর মনে হল না এমন এক আকস্মিক ঘটনা বলে, যা একই ভাবে না-ও ঘটতে পারত। এখন বোঝা গেল যে, এইসব আন্দোলন হল আধুনিক শোষিত শ্রেণী, প্রলেতারিয়েতের আন্দোলন, শাসক-শ্রেণী, বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে তার ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজনীয় সংগ্রামের ন্যূনাধিক বিকশিত বিভিন্ন রূপ, শ্রেণী-সংগ্রামের রূপ, কিন্তু আগেকার সব শ্রেণী-সংগ্রামের সঙ্গে তার পার্থক্য এই যে, সমগ্রভাবে সমাজকে শ্রেণী-বিভাগ থেকে এবং ফলত শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে মুক্ত না করে আজকের দিনের শোষিত শ্রেণী, প্রলেতারিয়েত নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। এখন আর কমিউনিজমের মানে কল্পনার সাহায্যে যতদূর সম্ভব নিখুঁত এক আদর্শ সমাজ বানিয়ে তোলা নয়, এখন কমিউনিজমের মানে দাঁড়াল প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামের প্রকৃতি, সর্তাবলী আর তদনুযায়ী সংগ্রামের সাধারণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি।

আমাদের আদৌ ইচ্ছা ছিল না যে. নতুন এইসব বৈজ্ঞানিক ফলাফল মস্ত মস্ত বইয়ে শুধু 'পণ্ডিত' মহলকে জানানো হবে। আমাদের মত ছিল ঠিক বিপরীত। ইতিমধ্যে আমরা উভয়েই রাজনৈতিক আন্দোলনে বেশ গভীরভাবে জড়িত হয়ে পড়েছি, শিক্ষিত

* *Deutsch-Französische Jahrbücher* — ১৮৪৪ সালে প্যারিসে প্রকাশিত পত্রিকা। মার্কস ও বামপন্থী হেগেলিয়ান আরনোল্দ রুগে এটি প্রকাশ করেন। — সম্পাঃ

মহলে, বিশেষ করে পশ্চিম জার্মানির শিক্ষিত মহলে, আমাদের বেশ কিছু সমর্থকও ছিল, আর সংগঠিত প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে ছিল প্রচুর যোগাযোগ। আমাদের মতবাদের বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি রচনা করা আমাদের কর্তব্য ছিল। কিন্তু ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েতকে এবং প্রথমত জার্মান প্রলেতারিয়েতকে আমাদের মতে টেনে আনার গুরুত্বও কিছু কম ছিল না। আমাদের ধারণা নিজেদের কাছে পরিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা কাজ শুরু করে দিলাম। আমরা ব্রাসেল্‌সে একটি 'জার্মান শ্রমিক সমিতি' গড়লাম আর *Deutsche Brüsseler Zeitung** পত্রিকা তুলে নিলাম নিজেদের হাতে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব পর্যন্ত এ পত্রিকাটি আমাদের মুখপত্র হিসাবে কাজ করেছে। চার্টিস্ট আন্দোলনের কেন্দ্রীয় মুখপত্র *Northern Star* পত্রিকার সম্পাদক জুলিয়ন হার্নে-র মাধ্যমে আমরা ইংরেজ চার্টিস্টদের বিপ্লবী অংশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম। ঐ পত্রিকায় আমিও লিখতাম। ব্রাসেল্‌স গণতন্ত্রীদের সঙ্গেও (মার্কস ছিলেন 'গণতান্ত্রিক সমিতির'** সহসভাপতি) আর *Réforme*-এর*** ফরাসী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সঙ্গেও আমরা এক ধরনের জোট গড়ে তুলেছিলাম। *Réforme* পত্রিকায় আমি ইংরেজী ও জার্মান আন্দোলনের খবর সরবরাহ করতাম। সংক্ষেপে বলা যায়, র‍্যাডিকেল ও প্রলেতারীয় সংগঠনাদি ও তাদের মুখপত্রগুলির সঙ্গে আমাদের আশানুরূপ যোগাযোগই ছিল।

'ন্যায়নিষ্ঠদের লীগের' সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল নিম্নরূপ: ঐ লীগের অস্তিত্বের কথা আমরা অবশ্য জানতাম; ১৮৪৩ সালে শাপার প্রস্তাব করেছিলেন যেন আমি ঐ লীগে যোগ দিই। আমি স্বভাবতই তখন রাজি হইনি। কিন্তু লন্ডনবাসীদের সঙ্গে নিয়মিত চিঠিপত্রের আদান-প্রদান তো আমরা চালাতামই; উপরন্তু প্যারিস গোষ্ঠীগুলির তদানীন্তন নেতা ডাঃ এভেরবেকের সঙ্গে রেখেছিলাম আরো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। লীগের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে না গিয়েও আমরা গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনারই খবর রাখতাম। অন্যদিকে, মৌখিক আলাপে, চিঠিপত্রে আর প্রেসের মাধ্যমে আমরা লীগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের তাত্ত্বিক মতামতের উপর প্রভাব বিস্তার করতাম। এই উদ্দেশ্যে

---

* *Deutsche Brüsseler Zeitung* — ব্রাসেল্‌সে জার্মান রাজনৈতিক দেশান্তরীদের মুখপত্র, প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ থেকে ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ১৮৪৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে পত্রিকার পরিচালনা যায় মার্কস ও এঙ্গেলসের হাতে। — সম্পাঃ

** 'গণতান্ত্রিক সমিতি' — আন্তর্জাতিক চরিত্রবিশিষ্ট এই সমিতিতে বেলজিয়ান গণতন্ত্রীরা ব্রাসেল্‌সবাসী রাজনৈতিক দেশত্যাগীদের সাথে মিলিত হন। ১৮৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। — সম্পাঃ

*** *Réforme* — দৈনিক পত্রিকা, ১৮৪৩ সাল থেকে ১৮৫০ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত প্যারিসে প্রকাশিত হয়। — সম্পাঃ

আমরা লিথোগ্রাফ করা নানা সার্কুলারেরও সাহায্য নিতাম, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সেগুলি আমরা সারা পৃথিবীতে আমাদের বন্ধু ও পত্রদাতাদের কাছে পাঠিয়ে দিতাম যখন প্রশ্ন উঠত নির্মীয়মাণ কমিউনিস্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ে। কখনো কখনো এইসব সার্কুলারে লীগের আলোচনাও থাকত। যেমন, একজন তরুণ ভেস্তফালীয় ছাত্র হের্মান ক্রিগে আমেরিকায় গিয়ে সেখানে লীগের দূত হয়ে দাঁড়ায় এবং পাগলাটে হ্যারো হ্যারিঙের সঙ্গে যোগ দেয় লীগের মাধ্যমে দক্ষিণ আমেরিকাকে উল্টে দেবার জন্য। একটা সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করে তাতে সে লীগের নামে প্রচার করতে থাকল এক প্রেমভিত্তিক, প্রেমে ভরপুর, প্রেমের স্বপ্নে ভাবালু কমিউনিজম। এর বিরুদ্ধে একটা সার্কুলার ছাড়ি আমরা, তার ফলও হল। লীগের মঞ্চ থেকে ক্রিগে অন্তর্হিত হল।

পরে ভাইৎলিং ব্রাসেল্‌সে আসেন। কিন্তু যে সরল তরুণ সহকারী দর্জি একদিন নিজের প্রতিভায় নিজেই বিস্মিত হয়ে কমিউনিস্ট সমাজ ঠিক কেমন দেখতে হবে সেটা নিজের মনের কাছে পরিষ্কার করে নেবার চেষ্টা করেছিল, সে ভাইৎলিং আর নেই। এখন তিনি একজন মহাপুরুষ, যাঁর শ্রেষ্ঠত্বের দরুন হিংসুটেরা তাঁর পেছনে লাগে, সর্বত্রই যিনি প্রতিদ্বন্দ্বী, গুপ্ত শত্রু আর ফাঁদের সন্ধান পান, দেশ থেকে দেশান্তরে বিতাড়িত এক পয়গম্বর; মর্ত্যলোকে স্বর্গ রচনার তৈরী দাওয়াই রয়েছে তাঁর কাছে আর তাঁর বদ্ধমূল ধারণা সবাই নাকি সেটি তাঁর কাছ থেকে চুরি করে নিতে চায়। লণ্ডনে লীগের সদস্যদের সঙ্গে তাঁর ইতিমধ্যেই মনোমালিন্য হয়ে গেছে। ব্রাসেল্‌সে মার্কস ও তাঁর স্ত্রী প্রায় অমানুষিক সহ্যশক্তি নিয়ে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানেও কারুর সঙ্গে তাঁর বনিবনা হল না। তাই কিছুদিন পরেই তিনি আমেরিকায় চলে যান তাঁর পয়গম্বরী ভূমিকাটা সেখানে যাচাই করে দেখার জন্য।

লীগের মধ্যে, বিশেষত লণ্ডনস্থ নেতাদের মধ্যে যে নীরব বিপ্লব সাধিত হচ্ছিল তা এইসব পরিস্থিতিতে সুগম হয়। কমিউনিজমের পূর্ববর্তী সব ফরাসী সহজ সমতাবাদী ধারা আব ভাইৎলিঙের কমিউনিজম এই উভয় ধারণার অপ্রতুলতাই ক্রমশঃ তাঁদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। ভাইৎলিঙের লেখা 'দরিদ্র পাপীর সুসমাচার' বইটির কয়েকটি অংশ যতই প্রতিভাদীপ্ত হোক না কেন, তিনি যে আদিম খ্রীষ্টীয় ধর্ম থেকে কমিউনিজম টানতে চান তার ফলে সুইজারল্যাণ্ডে আন্দোলন প্রথমে আলব্রেখতের মতো বোকাদের হাতে আর পরে কুলমানের মতো লোভী প্রবঞ্চক পয়গম্বরদের হাতে অনেকখানি চলে যায়। কিছু সাহিত্যিক যে 'খাঁটি সমাজতন্ত্রের' কথা প্রচার করেছিলেন — অর্থাৎ বিকৃত হেগেলীয় জার্মানে ফরাসী সমাজতন্ত্রী বুলির এই যে অনুবাদ ও ভাবপ্রবণ প্রেমস্বপ্ন ('কমিউনিস্ট ইশতেহারে' জার্মান বা 'খাঁটি' সমাজতন্ত্রের অংশ দ্রষ্টব্য) ক্রিগে ও তৎসংশ্লিষ্ট সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে লীগের মধ্যে চালু হয়েছিল, তা অচিরেই লীগের পুরনো বিপ্লবীদের কাছে বিরক্তিকর বোধ হল আর কিছুর জন্য

না হলেও অন্তত তার লোল অক্ষমতার জন্য। আগেকার তাত্ত্বিক মতামতের অনুত্তীর্ণতা এবং সে মতামত থেকে উদ্ভূত ব্যবহারিক ভ্রান্তির জন্য লণ্ডনে ক্রমেই বেশি করে উপলব্ধি ঘটল যে, মার্কস ও আমার নতুন তত্ত্ব সঠিক। এ উপলব্ধি নিশ্চয় আরো সুগম হয়েছিল এইজন্য যে, লণ্ডনের নেতাদের মধ্যে তখন এমন দুজন লোক ছিলেন যাঁরা তাত্ত্বিক জ্ঞানের সামর্থ্যে পূর্বোল্লিখিত সবার অনেক উর্ধ্বে। এঁরা হলেন: হিলব্রনের মিনিয়েচর শিল্পী কার্ল ফেনদার আর থুরিঙ্গিয়ার দর্জি গেওর্গ একারিয়স।*

মোট কথা, ১৮৪৭ সালের বসন্তকালে মল ব্রাসল্সে মার্কসের সঙ্গে আর ঠিক তার পরই প্যারিসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন আর তাঁর কমরেডদের তরফ থেকে আরেকবার আমাদের লীগে যোগদানের আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি জানালেন যে, তাঁরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সাধারণ যথার্থতা এবং লীগকে পুরনো ষড়যন্ত্রমূলক ঐতিহ্য ও রূপ থেকে মুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সমান নিঃসন্দেহ হয়েছেন। আমরা যদি লীগে যোগ দিই তাহলে একটি ইশতেহারে লীগের কংগ্রেসের সামনে আমাদের সমালোচনামূলক কমিউনিজম ব্যাখ্যা করার সুযোগ আমাদের দেওয়া হবে। তারপর এই ইশতেহারটি লীগের ইশতেহার হিসেবে প্রকাশিত হবে। সেই সঙ্গে অচল লীগ সংগঠনের বদলে নতুন যুগ ও আদর্শের উপযোগী সংগঠন গড়ার ব্যাপারেও আমরা হাত লাগাতে পারব।

এ ব্যাপারে আমাদের কোনোই সন্দেহ ছিল না যে, শুধুমাত্র প্রচারের উদ্দেশ্যে হলেও জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে একটা সংগঠন থাকা প্রয়োজন, আর সে সংগঠন যেহেতু কেবল স্থানীয় চরিত্রের হবে না তাই তার পক্ষে এমনকি জার্মানির বাইরেও গুপ্ত সংগঠনই হওয়া সম্ভব। লীগ ছিল ঠিক এইরকমই এক সংগঠন। এ লীগের যেসব ব্যাপারে আগে আমাদের আপত্তি ছিল তা এখন লীগের প্রতিনিধিরা নিজেরাই ভুল বলে পরিত্যাগ করছেন। এমনকি তার সংগঠনের কাজেও সহযোগিতা করতে আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হল। 'না' বলা চলত কি? নিশ্চয়ই না। সুতরাং আমরা লীগে যোগ দিলাম। আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিয়ে মার্কস ব্রাসেল্সে লীগের একটি গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করলেন আর আমি প্যারিসের তিনটি গোষ্ঠীতে উপস্থিত থাকতাম।

১৮৪৭ সালের গ্রীষ্মকালে লণ্ডনে লীগের প্রথম কংগ্রেস হয়। এতে ভলফ

* প্রায় আট বছর আগে লণ্ডনে ফেনদারের মৃত্যু হয়। আশ্চর্যরকম সূক্ষ্ম মেধা ছিল তাঁর। কৌতুকপ্রিয়, ব্যঙ্গপটু ও দ্বন্দ্ববাদী লোক ছিলেন তিনি। আমরা জানি যে, একারিয়স পরে বহু বছর শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। এই সাধারণ পরিষদে অন্যান্যদের মধ্যে লীগের নিম্নলিখিত পুরনো সদস্যরাও ছিলেন: একারিয়স, ফনদার, লেসনার, লখনার, মার্কস ও আমি। একারিয়স পরে পুরোপুরিভাবে ইংলণ্ডের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। (এঙ্গেলসের টীকা।)

ব্রাসেল্‌সের আর আমি প্যারিসের গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসাবে ছিলাম। এই কংগ্রেসে প্রথমেই লীগের পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। ষড়যন্ত্রমূলক যুগের পুরনো রহস্যময় নাম যা কিছু বাকি ছিল তা এখন বিলুপ্ত হল। এখন গোষ্ঠী, চক্র, পরিচালক চক্র, কেন্দ্রীয় কমিটি ও কংগ্রেস নিয়ে লীগ গঠিত হল আর এখন থেকে লীগের নাম হল 'কমিউনিস্ট লীগ'। প্রথম ধারায় বলা হয়, 'লীগের উদ্দেশ্য হল বুর্জোয়া শ্রেণীর উচ্ছেদ, প্রলেতারিয়েতের শাসন, শ্রেণীবিরোধের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত পুরনো বুর্জোয়া সমাজের বিলোপ আর শ্রেণীহীন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিবিহীন এক নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা।' সংগঠনটি ছিল পুরোপুরি গণতান্ত্রিক, তার কমিটিগুলি ছিল নির্বাচনমূলক ও যেকোনো সময় অপসারণীয়। শুধু এর ফলেই ষড়যন্ত্রের আকাঙ্ক্ষায় বাধা পড়ল কারণ তার জন্য চাই একনায়কত্ব। আর অন্তত পক্ষে সাধারণ শান্তির সময়ের জন্য লীগ সম্পূর্ণভাবে একটি প্রচারমূলক সমিতিতে রূপান্তরিত হল। এখন যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হল তা এতই গণতান্ত্রিক ছিল যে এই নতুন নিয়মাবলী বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির আলোচনার্থে পেশ করা হয়, তারপর দ্বিতীয় কংগ্রেসে আবার সেগুলির আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত ১৮৪৭ সালের ৮ই ডিসেম্বরে গৃহীত হয়। ভেমর্ৎ ও স্তিবারের রচনার প্রথম খণ্ডে, ২৩৯ পৃষ্ঠায়, দশম পরিশিষ্টে এই নিয়মাবলী মুদ্রিত হয়েছে।

এই বছরই নভেম্বর মাসের শেষে ও ডিসেম্বর মাসের প্রথমে দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল। মার্কসও এবার হাজির ছিলেন এবং যথেষ্ট দীর্ঘ এক বিতর্কে — কংগ্রেস চলেছিল অন্তত পক্ষে দশদিন ধরে — তিনি নতুন মতবাদ সমর্থন করলেন। অবশেষে সব বিরোধ ও সন্দেহের নিরসন হল। নতুন মৌলিক নীতিগুলি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হল। মার্কস আর আমাকে ইশতেহার রচনার ভার দেওয়া হল। ঠিক এর পরেই ইশতেহার রচিত হয় আর ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের কয়েক সপ্তাহ আগে সেটি ছাপানোর জন্য লণ্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর এটি সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছে, প্রায় সব ভাষায় অনূদিত হয়েছে আর আজও বহু দেশে প্রলেতারীয় আন্দোলনের পথ-নির্দেশক হয়ে রয়েছে। 'সব মানুষই ভাই' লীগের এই পুরনো নীতির জায়গায় এল নতুন রণধ্বনি 'দুনিয়ার মজুর এক হও!' সংগ্রামের আন্তর্জাতিক চরিত্রের প্রকাশ্য ঘোষণা হল তাতে। সতের বছর পরে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির মূলধ্বনিরূপে এই রণধ্বনি সারা পৃথিবী জুড়ে প্রতিধ্বনিত হয়, আর আজ সব দেশের জঙ্গী প্রলেতারিয়েত তার পতাকায় এটি উৎকীর্ণ করে নিয়েছে।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব শুরু হল। এতদিন পর্যন্ত লণ্ডনে যে কেন্দ্রীয় কমিটি কাজ চালাচ্ছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে তার ক্ষমতা দিয়ে দিল ব্রাসেল্‌সের পরিচালক চক্রের হাতে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত এল যে সময় তার আগেই ব্রাসেল্‌সে কার্যত অবরোধ অবস্থা জারী

হয়েছে আর বিশেষ করে জার্মানরা সেখানে কোথাও একত্রিত হতে পারছে না। আমরা সবাই তখন প্যারিসে যাওয়ার জন্য তৈরী। কাজেই নতুন কেন্দ্রীয় কমিটিও ঠিক করল যে, কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে মার্কসের হাতে সব ক্ষমতা তুলে দেওয়া হবে আর তাঁকে অবিলম্বে প্যারিসে একটি নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গড়ার ভার দেওয়া হবে। যে পাঁচজন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন (৩রা মার্চ, ১৮৪৮), তাঁরা বিদায় নিতে না নিতেই পুলিস জোর করে মার্কসের বাড়িতে ঢুকে তাঁকে গ্রেপ্তার করল আর পরদিনই তাঁকে ফ্রান্সে রওনা হতে বাধ্য করল। মার্কসও ঠিক সেখানেই যেতে চাইছিলেন।

প্যারিসে শীঘ্রই আমরা সবাই আবার মিলিত হলাম। সেখানে নিম্নলিখিত দলিলটি রচনা করে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির সব সদস্য তাতে সই করলেন। সারা জার্মানিতে এটি বিলি করা হয় আর আজও এর থেকে অনেকের অনেক কিছু শেখার আছে।

জার্মানিতে কমিউনিস্ট পার্টির দাবি*

১। সমগ্র জার্মানিকে একটি একক অবিভাজ্য প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করতে হবে।

৩। জার্মান জনগণের পার্লামেণ্টে যাতে শ্রমিকরাও আসন গ্রহণ করতে পারেন তার জন্য জনগণের প্রতিনিধিদের বেতন দেওয়া হবে।

৪। জনগণের সর্বজনীন সশস্ত্রীকরণ।

৭। রাজরাজড়াদের জমিদারি ও অন্যান্য সামন্ততান্ত্রিক মহাল, সমস্ত খনি, আকর ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত হবে। এইসব জমিতে সমগ্র সমাজের উপকারের জন্য আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে এবং বৃহদাকারে কৃষিকার্য করা হবে।

৮। কৃষকের জমি জায়গার উপর বন্ধক রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বলে ঘোষিত হবে, কৃষক এইসব বন্ধকের সুদ রাষ্ট্রকে দেবে।

৯। যেসব জেলায় ইজারা-চাষের (tenant farming) বিকাশ হয়েছে সেখানে জমির খাজনা বা ইজারার ভাড়া রাষ্ট্রকে কর হিসেবে দেওয়া হবে।

১১। পরিবহনের সব ব্যবস্থা: রেলপথ, খাল, জাহাজ, রাস্তা, ডাক ইত্যাদি রাষ্ট্র স্বহস্তে গ্রহণ করবে। এগুলি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত হবে আর সম্পত্তিবিহীন শ্রেণীর এখতিয়ারে তা তুলে দেওয়া হবে।

১৪। উত্তরাধিকারের অধিকার সীমায়িতকরণ।

১৫। খুব উচ্চহারে ক্রমবর্ধমান কর ব্যবস্থার প্রবর্তন আর ভোগ্যদ্রব্যের উপর থেকে কর অপসারণ।

---

* এখানে এঙ্গেলস শুধু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'দাবিগুলি' উদ্ধৃত করেছেন। — সম্পাঃ

১৬। জাতীয় কর্মশালা প্রতিষ্ঠা। রাষ্ট্র সব শ্রমিকের জীবিকা সুনিশ্চিত করবে আর যারা কাজ করতে অক্ষম তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে।

১৭। বিনা বেতনে সর্বজনীন জনশিক্ষা।

উপরিউক্ত ব্যবস্থাগুলি কাজে পরিণত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করায় জার্মান প্রলেতারিয়েত, পেটি বুর্জোয়া ও কৃষকদের স্বার্থ আছে, কারণ জার্মানির যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এতদিন পর্যন্ত অল্প কয়েকজন শোষণ করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও অধীনতায় আবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করবে, সমগ্র সম্পদের উৎপাদক হিসাবে তাদের যে অধিকার ও যে ক্ষমতা প্রাপ্য তা পাওয়ার একমাত্র পথ হল উপরিউক্ত ব্যবস্থাগুলি কাজে পরিণত করা।

কমিটি: **কার্ল মার্কস, কার্ল শাপার, হ. বাউয়ের, ফ্রে. এঙ্গেলস, জো. মল, ভি. ভলফ।**

সে সময়ে প্যারিসে বিপ্লবী বাহিনী গড়ার খুব একটা হুজুগ ছিল। স্পেনীয়, ইতালীয়, বেলজীয়, ওলন্দাজ, পোল ও জার্মানরা দলে দলে এসে মিলত নিজের নিজের পিতৃভূমি মুক্ত করার উদ্দেশ্যে। জার্মান বাহিনীর নেতৃত্ব করতেন হেরভেগ, বর্নস্তেদ ও বের্নস্তাইন। বিপ্লবের ঠিক পরেই সমস্ত বিদেশী মজুরদের চাকরি তো যায়ই, তার উপর জনসাধারণও তাদের জ্বালাতন করত, এর ফলে এই সব বাহিনীতে খুব বেশী লোক আসতে থাকে। নতুন সরকার এই বাহিনীগুলিকে দেখল বিদেশী মজুরদের বিতাড়নের উপায় হিসাবে। এবং তাদের l'étape du soldat দিল অর্থাৎ তাদের চলার পথের ধারে ধারে তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিল আর সীমানা পর্যন্ত দিনে পঞ্চাশ সেণ্টিম করে পথ খরচা ধার্য করল। এবং তার পরই বৈদেশিক মন্ত্রী সুবক্তা লামার্তিন, খুব সহজেই যাঁর চোখে জল আসত, চট করে সুযোগ বুঝে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের ধরিয়ে দিতেন তাদের নিজের নিজের সরকারের কাছে।

আমরা বিপ্লব নিয়ে এইভাবে খেলা করার বিরুদ্ধে অতি চূড়ান্ত আপত্তি জানিয়েছিলাম। জার্মানিতে তখন যেরকম আলোড়ন চলছে তার মধ্যে দিয়ে আক্রমণ করা, যাতে বাইরে থেকে জোর করে বিপ্লব আমদানি করা হয়, তার মানে হত জার্মানির নিজের বিপ্লবকেই ক্ষতিগ্রস্ত করা, সরকারগুলিকে শক্তিশালী করা আর বাহিনীর লোকদেরই অসহায় অবস্থায় জার্মান সৈন্যবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া — লামার্তিন সে ব্যবস্থা পাকা করেই রেখেছিলেন। পরে যখন ভিয়েনা ও বার্লিনে বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হল তখন বাহিনী আরো উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে পড়ল। কিন্তু একবার যখন খেলা শুরু হয়েছে, তখন তা চালিয়েই যাওয়া হল।

আমরা এক জার্মান কমিউনিস্ট ক্লাব প্রতিষ্ঠা করলাম। সেখানে আমরা শ্রমিকদের পরামর্শ দিতাম যে, তারা যেন বাহিনী থেকে দূরে থাকে, বরং যেন এক একজন করে

দেশে ফিরে গিয়ে সেখানে আন্দোলনের জন্য কাজ করে। আমাদের পুরানো বন্ধু ফ্লকোঁ তখন অস্থায়ী সরকারের একজন সদস্য। আমরা যেসব শ্রমিকদের পাঠাতাম তাদের তিনি বাহিনীর লোকদের মতোই যাতায়াতের সুবিধা আদায় করে দিতেন। এইভাবে আমরা ৩০০ বা ৪০০ শ্রমিককে জার্মানিতে ফেরৎ পাঠালাম, তার মধ্যে বেশীর ভাগ ছিলেন লীগের সদস্য।

যে জিনিষটা আগেই সহজে আন্দাজ করা সম্ভব ছিল তাই ঘটল, তখন যে ব্যাপক গণআন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে তার তুলনায় লীগের কারিকা শক্তি ছিল খুবই দুর্বল। লীগের যেসব সদস্য আগে বিদেশে ছিলেন তাঁদের তিন চতুর্থাংশই দেশে ফিরে গিয়ে তাঁদের স্থায়ী বাসস্থান বদলে নেন। ফলে তাঁদের পূর্বতন গোষ্ঠীগুলি অনেকাংশে ভেঙ্গে গেল আর লীগের সঙ্গে তাঁদের আর কোনো যোগাযোগ রইল না। তাঁদের এক অংশ, তাঁদের মধ্যে যাঁরা বেশী উচ্চাভিলাষী, তাঁরা সে যোগাযোগ পুনঃস্থাপন করার কোনো চেষ্টাও করলেন না বরং তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের এলাকায় নিজেদের উদ্যোগেই একটি করে ছোট ছোট পৃথক আন্দোলন শুরু করে দিলেন। শেষত, প্রতিটি ক্ষুদ্র রাজ্যে, প্রতি প্রদেশে ও প্রতি শহরে অবস্থার এত পার্থক্য ছিল যে, একেবারে সাধারণ ধরনের নির্দেশাবলী দেওয়া ছাড়া আর কিছু করা লীগের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর সে নির্দেশ সংবাদপত্রের মাধ্যমেই অনেক ভালো করে পেঁৗছান যেত। অর্থাৎ, যেসব কারণের জন্য গুপ্ত লীগ প্রয়োজন হয়েছিল, সে কারণগুলি দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত লীগ হিসাবে এরও আর কোনো অর্থ রইল না। কিন্তু সদ্য যাঁরা এই গুপ্ত লীগের ষড়যন্ত্রমূলক চরিত্রের শেষ রেশটুকু দূর করেছেন তাঁদের এতে আশ্চর্য হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম।

তবে লীগ যে বিপ্লবী কার্যকলাপের চমৎকার বিদ্যালয় ছিল সে কথা এবার দেখা গেল। রাইনে যেখানে *Neue Rheinische Zeitung* একটা দৃঢ় কেন্দ্র জুগিয়েছিল সেখানে, নাসাউতে, রেনিশ গিয়েসেনে ইত্যাদিতে সর্বত্র লীগের সদস্যারা চরম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন। হামবুর্গেও ঠিক তাই হয়। দক্ষিণ জার্মানিতে পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রাধান্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ব্রেসলৌতে ভিলহেল্‌ম ভলফ ১৮৪৮ সালের গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত খুবই সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেন। তার উপর তিনি ফ্রাঙ্কফুর্ত পার্লামেন্টে সিলেজিয়া থেকে বিকল্প প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। আর কম্পোজিটার স্তেফান বর্ন, ব্রাসেল্‌স ও প্যারিসে যিনি ছিলেন লীগের সক্রিয় সদস্য তিনি বার্লিনে এক 'শ্রমিক ভ্রাতৃত্বের' প্রতিষ্ঠা করেন। এটি যথেষ্ট বিস্তারলাভ করেছিল আর ১৮৫০ সাল পর্যন্ত টি'কে ছিল। বর্ন ছিলেন খুবই প্রতিভাবান যুবক। কিন্তু রাজনৈতিক নায়ক হয়ে ওঠার একটু বেশী তাড়া ছিল তাঁর। লোক জোগাড় করার জন্য তিনি যত আজেবাজে লোকদের সঙ্গে 'ভ্রাতৃত্ব' করতেন। আদৌ তিনি বিভিন্ন বিরোধী

প্রবণতার মধ্যে একতা আনার, বিশৃংখলার মধ্যে আলোকপাতের উপযোগী লোক ছিলেন না। ফলে 'ভ্রাতৃত্বের' সরকারী প্রকাশনীগুলিতে 'কমিউনিস্ট ইশতেহারের' দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে গিল্ডের স্মৃতি, গিল্ডসুলভ আকাঙ্ক্ষা, লুই ব্লাঁ ও প্রুধোঁর টুকরোটাকরা, সংরক্ষণবাদ ইত্যাদির জগাখিচুড়ি মিলন ঘটে। অর্থাৎ এরা সবাইকে খুশী রাখতে চাইত। বিশেষত, ধর্মঘট, ট্রেড ইউনিয়ন ও উৎপাদক সমবায়-সমিতি চালু করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু একমাত্র যে ক্ষেত্রে এইসব জিনিষ স্থায়ী ভিত্তিতে চালানো যায়, রাজনৈতিক বিজয়ের মাধ্যমে সেই ক্ষেত্রটি জয় করে নেওয়াই যে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন সে-কথা এদের মনে ছিল না। পরে প্রতিক্রিয়ার বিজয়ের ফলে 'ভ্রাতৃত্বের' নেতারা বিপ্লবী সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে যখন বাধ্য হন, তখন কিন্তু নিজেদের চারদিকে তাঁরা যে বিশৃংখল জনতার ভিড় জমিয়েছিলেন তারা স্বভাবতই তাঁদের ফেলে পালাল। বর্ন ১৮৪৯ সালের মে মাসে দ্রেজদেন অভ্যুত্থানে অংশ নেন আর খুব জোর বেঁচে যান। কিন্তু প্রলেতারিয়েতের বিরাট রাজনৈতিক আন্দোলনের বিপরীতে দেখা গেল যে 'শ্রমিক ভ্রাতৃত্ব' হল বিশুদ্ধ এক (son der bund) পৃথক লীগ। তার অস্তিত্ব বহুলাংশেই কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ, আর এর ভূমিকা এতই গৌণ ছিল যে, প্রতিক্রিয়াশীলরা এই সংগঠনকে ১৮৫০ সালের আগে পর্যন্ত আর এর বাকি সব শাখাকে আরো অনেক বছর পরে পর্যন্ত বন্ধ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। বর্নের আসল নাম বুতের্‌মিল্‌খ। বড় একজন রাজনৈতিক নায়ক না হয়ে তিনি হয়েছেন সামান্য এক সুইস অধ্যাপক। এখন আর তিনি গিল্ডের ভাষায় মার্কসের অনুবাদ করেন না, বরং বিনম্র রেনাঁ-র অনুবাদ করেন তাঁর মিষ্টি জার্মানে।

প্যারিসে ১৮৪৯ সালের ১৩ই জুন, জার্মানিতে মে বিদ্রোহের পরাজয় আর রুশীয়দের হাতে হাঙ্গেরীয় বিপ্লব দমনের সঙ্গে সঙ্গে ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের বিরাট এক পর্ব শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তখন পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীলরা আদৌ চূড়ান্ত জয়লাভ করেনি। বিক্ষিপ্ত বিপ্লবী শক্তির পুনর্গঠন এবং সুতরাং লীগেরও পুনর্গঠন প্রয়োজন ছিল। ১৮৪৮ সালের পূর্ববর্তীকালের মতো, তখনকার পরিস্থিতিতে প্রলেতারিয়েতের কোনো প্রকাশ্য সংগঠন গড়া সম্ভব হত না। কাজেই আবার গোপনে সংগঠন গড়তে হল।

১৮৪৯ সালের শরৎকালে পূর্বতন সব কেন্দ্রীয় কমিটি ও কংগ্রেসের বেশীভাগ সদস্য আবার লন্ডনে মিলিত হলেন। অনুপস্থিত ছিলেন শুধু শাপার ও মল। শাপার ভিয়েসবাদেন-এ কারারুদ্ধ ছিলেন, কিন্তু ১৮৫০ সালের বসন্তকালে অনাপরাধী বলে প্রমাণ হবার পর তিনিও এলেন। মল অত্যন্ত বিপজ্জনক বহু দৌত্য ও প্রচারমূলক সফরের পর — শেষ পর্যন্ত রাইন প্রদেশে একেবারে প্রুশীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে তিনি

পালাটিনেট* গোলন্দাজবাহিনীর জন্য অশ্বারোহী গোলন্দাজদের সংগ্রহ শুরু করেন — ভিলিখের সৈন্যদলের বেসানসন শ্রমিক বাহিনীতে যোগ দেন ও মুর্গে এক সংঘর্ষের সময়ে রটেনফেলস সেতুর সামনে মাথায় গুলি লেগে মারা যান। কিন্তু এবার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন ভিলিখ। ১৮৪৫ সাল থেকে পশ্চিম জার্মানিতে যে ধরনের ভাবপ্রবণ কমিউনিস্টদের খুব প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল তাদেরই একজন ভিলিখ। কেবল সেইজন্যই সহজাত প্রবৃত্তিবশেই তিনি আমাদের সমালোচনী প্রবণতার গোপন বিরোধী ছিলেন। তার উপর, তিনি ছিলেন পুরোপুরি এক পয়গম্বর, জার্মান প্রলেতারিয়েতের পূর্বনির্দিষ্ট মুক্তিদাতারূপে তাঁর ব্যক্তিগত ব্রতে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না, আর সেই হিসাবে রাজনৈতিক ও সামরিক উভয় একনায়কত্বেরই তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষ দাবিদার। ফলে ভাইৎলিং যে আদিম খ্রীষ্টান কমিউনিজম প্রচার করেছিলেন, তদুপরি উদয় হল এক ধরনের কমিউনিস্ট ইসলামের। যাই হোক, তখনকার মতো এই নতুন ধর্মের প্রচার ভিলিখের সেনাপত্যাধীন উদ্বাস্তু শিবিরেই সীমাবদ্ধ রইল।

কাজেই লীগ নতুন করে সংগঠিত হল। ১৮৫০ সালের মার্চের অভিভাষণ প্রকাশিত হল আর হাইনরিখ বাউয়েরকে দূত হিসেবে জার্মানিতে পাঠানো হল। মার্কস ও আমার সম্পাদিত এই অভিভাষণটি আজও আগ্রহবহ, কারণ শীঘ্রই ইউরোপে যে উলটপালট হওয়ার কথা (ইউরোপীয় বিপ্লবগুলি — ১৮১৫, ১৮৩০, ১৮৪৮-৫২, ১৮৭০ সালে — আমাদের শতাব্দীতে ১৫ থেকে ১৮ বছর অন্তর হয়েছে) তাতে কমিউনিস্ট শ্রমিকদের হাত থেকে সমাজের পরিত্রাতা হিসাবে জার্মানিতে যে পার্টির প্রথম ক্ষমতায় আসা অবশ্যম্ভাবী আজও তা হল পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্র। ঐ অভিভাষণে যা বলা হয়েছিল তার অনেক কিছুই তাই আজও প্রযোজ্য। হাইনরিখ বাউয়েরের দৌত্য পুরোপুরিভাবে সফল হল। এই আমুদে ক্ষুদ্রাকার জুতাপ্রস্তুতকারকটি ছিলেন আজন্ম কূটনীতিক। লীগের ভূতপূর্ব সদস্যদের কেউ কেউ তখন কাজ ছেড়ে দিয়েছেন, আর কেউ কেউ নিজের মতো করে কাজ করছেন। তাঁদের আর বিশেষত 'শ্রমিক ভ্রাতৃত্বের' তদানীন্তন নেতাদের বাউয়ের সক্রিয় সংগঠনের মধ্যে ফিরিয়ে আনলেন। ১৮৪৮ সালের আগের তুলনায় লীগ শ্রমিক, কৃষক ও ক্রীড়াসংঘগুলিতে অনেক বেশী নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে শুরু করল। ফলে, ১৮৫০ সালের জুন মাসে গোষ্ঠীগুলির কাছে পরবর্তী ত্রৈমাসিক ভাষণেই একথা জানানো সম্ভব হল যে, পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের স্বার্থে জার্মানিতে সফররত বনের ছাত্র শুর্‌স (পরে আমেরিকার প্রাক্তন-মন্ত্রী) 'দেখেছেন যে,

---

* এখানে সেই বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীর গোলন্দাজবাহিনীর কথা বলা হচ্ছে যে বাহিনী ১৮৪৯ সালের মে—জুন মাসে বাদেন-পালাটিনেট বিদ্রোহের সময়ে প্রুশীয় সরকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। — সম্পাঃ

সক্ষম সব শক্তি ইতিমধ্যেই লীগের হাতে চলে গেছে।' নিঃসন্দেহে লীগই ছিল জার্মানির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ একমাত্র বিপ্লবী সংগঠন।

কিন্তু এই সংগঠন কী কাজে লাগবে, তা অনেকখানি নির্ভর করত বিপ্লবের নতুন এক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ নেয় কিনা তার উপর। ১৮৫০ সালে তার আশা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকল, বলতে কি অসম্ভবই হয়ে উঠছিল। ১৮৪৭ সালের যে শিল্প-সংকট ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সোপান রচনা করেছিল, তা কেটে গিয়েছিল; শিল্প সমৃদ্ধির এক নতুন, অভূতপূর্ব যুগ শুরু হয়েছিল। যাদের চোখ ছিল এবং সে চোখ যারা কাজে লাগিয়েছিল, তাদের পরিষ্কার বোঝার কথা যে ১৮৪৮ সালের বিপ্লবী ঝড় ক্রমশঃ শেষ হয়ে আসছে।

'এই যে সাধারণ সমৃদ্ধির মধ্যে বুর্জোয়া সমাজের উৎপাদন-শক্তিগুলি বুর্জোয়া সম্পর্কাদির চৌহদ্দির ভিতরে যথাসম্ভব সতেজভাবেই বিকশিত হচ্ছে, তার ফলে **সত্যকার বিপ্লবের কথা আর ওঠে না**। তেমন বিপ্লব শুধু সে পর্বেই সম্ভব, যখন আধুনিক উৎপাদন-শক্তি ও বুর্জোয়া উৎপাদন-কাঠামো, এই উভয় উপাদানের মধ্যেই পারস্পরিক সংঘাত উপস্থিত হয়। ইউরোপীয় ভূখণ্ডের শৃঙ্খলা পার্টির এক এক উপদলের প্রতিনিধিরা বর্তমানে যে সব ঝগড়াঝাঁটিতে মাতছে ও নিজেদের খেলো করে তুলছে, সেগুলি নতুন বিপ্লবের উপলক্ষ মোটেই যোগাচ্ছে না, পক্ষান্তরে তা সম্ভব হচ্ছে সামাজিক সম্পর্কাদির বনিয়াদটা সাময়িকভাবে অতি মজবুত, আর প্রতিক্রিয়া যা জানে না, অতিশয় **বুর্জোয়া** বলেই। বুর্জোয়া বিকাশ ব্যাহত করার জন্য প্রতিক্রিয়ার সমস্ত প্রচেষ্টা **ওর গায়ে লেগে ঠিক ততখানি নিশ্চিতভাবেই ঠিকরে ফিরে আসবে, যেমন ফিরে আসবে গণতন্ত্রীদের সমস্ত নৈতিক ক্রোধ ও সোৎসাহ সকল ঘোষণা**।' *Neue Rheinische Zeitung, Politischeökonomische Revue,* পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা, হামবুর্গ, ১৮৫০, ১৫৩ পৃষ্ঠায় '১৮৫০ সালের মে থেকে অক্টোবর মাসের পর্যালোচনায়' আমি আর মার্কস এই কথা লিখেছিলাম।*

কিন্তু পরিস্থিতির এই শান্ত মূল্য-নিরূপণকে অনেকেই তখন ধৃষ্টোক্তি বলে গণ্য করেছিলেন। তখন লেদ্রু-রলাঁ, লুই ব্লাঁ, মাৎসিনি, কশুত এবং অপেক্ষাকৃত কম বিখ্যাত জার্মান তারকাদের মধ্যে রুগে, কিনকেল, গ্যোগ ও অন্যান্য সবাই লণ্ডনে গিয়ে গুচ্ছে গুচ্ছে ভবিষ্যতের অস্থায়ী সরকার গড়ার জন্য ভিড় করেছেন এবং সেটা শুধু তাঁদের নিজের নিজের পিতৃভূমির জন্যই নয়, সমগ্র ইউরোপেরও জন্য, বাকি কেবল আমেরিকার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় টাকাটা ধারে পাওয়া, তাহলেই ইউরোপীয় বিপ্লব আর তার স্বাভাবিক অনুষঙ্গ বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রগুলিকে পলকের মধ্যেই ঘটানো যাবে। আর

* এই সংস্করণের প্রথম খণ্ডের প্রথম অংশের পৃঃ ২২৪ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

ভিলিখের মতো লোক যে একথা বিশ্বাস করেছিলেন, পুরানো বিপ্লবী ঝোঁকের বশে শাপারও যে বোকা বনেছিলেন এবং লণ্ডনের যে শ্রমিকরা নিজেরাই অনেকে দেশান্তরী তাঁদের বেশীর ভাগই যে এ'দের পিছন পিছন বিপ্লবের বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক সংঘটক শিবিরে গিয়ে ঢুকেছিলেন, এতে আর আশ্চর্যের কী আছে? মোট কথা, আমাদের সংযমটা এ'দের মনঃপুত হয়নি, এ'দের মতে বিপ্লব ঘটানোর খেলায় যোগ দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সে কাজ করতে আমরা পুরোপুরি অস্বীকার করলাম। ফল হল বিভাগ। এবিষয়ে 'স্বরূপপ্রকাশ' রচনায় বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে। তারপর নত্যুং গ্রেপ্তার হলেন। এ'র পরই হামবুর্গে গ্রেপ্তার হলেন হাউপ্‌ৎ। হাউপ্‌ৎ বিশ্বাসঘাতকতা করে কলোনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের নাম ফাঁস করে দিলেন, বিচারে প্রধান সাক্ষী হবার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু তাঁর আত্মীয়স্বজন এভাবে কলঙ্কিত হতে চাইলেন না, তাঁরা হাউপ্‌ৎকে রিও ডি জ্যানিরোতে চালান করে দিলেন। সেখানে তিনি পরে ব্যবসায়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন আর তাঁর সেবার স্বীকৃতি হিসাবে প্রথমে প্রুশীয় ও পরে জার্মান কন্সাল-জেনারেল রূপে নিযুক্ত হন। এখন তিনি আবার ইউরোপে এসেছেন।*

'স্বরূপপ্রকাশ' রচনাটিকে আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য আমি কলোনের অভিযুক্তদের তালিকা দিচ্ছি: ১) পি. পেতের রোজার, চুরুট তৈরী করতেন; ২) হাইনরিখ ব্যুরগের্স, পরে মারা যান লান্দস্তাগের প্রগতিশীল সদস্য হিসাবে; ৩) পেতের নত্যুং, দর্জি, কয়েকবছর আগে ফটোগ্রাফার হিসাবে ব্রেসলৌতে মারা গেছেন; ৪) ভিলহেলম রাইফ; ৫) ডাঃ হের্মান বেকার, এখন কলোনের প্রধান বার্গোমাস্টার ও উচ্চকক্ষের সদস্য; ৬) ডাঃ রলান্দ দেনিয়েল্‌স, চিকিৎসক, কারাগারে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার ফলে মামলার কয়েক বছর পরে মারা যান; ৭) কার্ল অত্তো, রসায়নবিদ; ৮) ডাঃ আব্রাহাম ইয়াকবি, এখন নিউ ইয়র্কের চিকিৎসক; ৯) ইয়োহান ইয়াকব ক্লাইন, এখন চিকিৎসক আর কলোন শহরের কাউন্সিলার; ১০) ফের্দিনান্দ ফ্রাইলিখরাত, এর আগেই তিনি লণ্ডনে চলে গিয়েছিলেন; ১১) জে. এল. এর্হার্দ, কেরানী; ১২) ফ্রিদরিখ লেসনার, দর্জি, এখন লণ্ডনে আছেন। ১৮৫২ সালের ৪ঠা অক্টোবর থেকে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত জুরীর সমক্ষে প্রকাশ্য বিচারের পর রাজদ্রোহের অভিযোগে

---

* সপ্তম দশকের শেষে লণ্ডনে শাপারের মৃত্যু হয়। ভিলিখ কৃতিত্বের সঙ্গে আমেরিকান গৃহযুদ্ধে অংশ নেন; তিনি ব্রিগেডিয়ার জেনেরাল হন। (টেনেসির) মুরফ্রিসবোরোর যুদ্ধে তাঁর বুকে গুলি লাগে, কিন্তু তিনি সেরে ওঠেন। প্রায় দশ বছর আগে আমেরিকায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। অন্যান্য যাঁদের কথা উপরে উল্লেখ করা হল তাঁদের সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই বলব যে, অস্ট্রেলিয়ায় হাইনরিখ বাউয়েরের আর কোনো খোঁজ রাখা যায়নি আর ভাইৎলিং ও এভেরবেক আমেরিকায় মারা গেছেন। (এঙ্গেলসের টীকা।)

রোজার, ব্যুরগের্স ও নত্যুং-এর ছয় বছর, রাইফ, অত্তো ও বেকারের পাঁচ বছর আর লেসনারের তিন বছর দুর্গে রুদ্ধ থাকার দন্ডাদেশ হয়। দেনিয়েল্‌স, ক্লাইন, ইয়াকবি ও এর্হার্দ মুক্তি পান।

কলোন মামলার সঙ্গেই জার্মান কমিউনিস্ট শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম পর্ব শেষ হল। দন্ডাদেশের ঠিক পরেই আমরা লীগ ভেঙ্গে দিলাম। কয়েকমাস পরে ভিলিখ-শাপারের পৃথক লীগও চিরশান্তি লাভ করল।

* * *

তখনকার সঙ্গে এখনকার এক পুরুষের ব্যবধান। তখন জার্মানি ছিল হস্তশিল্পের আর শুধু কায়িক পরিশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত গার্হস্থ্য শ্রমশিল্পের দেশ। এখন এটা এক বৃহৎশিল্পপ্রধান দেশ, ক্রমাগত তার শিল্পগত রূপান্তর চলছে। শ্রমিক হিসাবে নিজেদের অবস্থা আর পুঁজির বিরুদ্ধে তাঁদের ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক বিরোধ হৃদয়ঙ্গম করেছেন এমন শ্রমিকদের তখন একজন একজন করে খুঁজে বের করতে হত, কারণ এই বিরোধও তখন সবেমাত্র বিকাশলাভ করতে শুরু করেছে। আর আজ নিপীড়িত শ্রেণী হিসাবে নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ চেতনা বিকাশের প্রক্রিয়া ঈষৎ বিলম্বিত করার জন্যই সমগ্র জার্মান প্রলেতারিয়েতকে জরুরী আইনের* অধীনে রাখতে হয়। তখন স্বল্পসংখ্যক যে কয়জন প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক ভূমিকা উপলব্ধি পর্যন্ত এগোতে পেরেছিলেন তাঁদের গোপনে কাজ করতে হত, ৩ থেকে ২০ জনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে লুকিয়ে একত্রিত হতে হত। আর আজ প্রকাশ্য বা গোপন কোনো সরকারী সংগঠনেরই প্রয়োজন হয় না জার্মান প্রলেতারিয়েতের। কোনো নিয়মাবলী, কমিটি, সিদ্ধান্ত বা অন্যান্য প্রত্যক্ষ রূপ ছাড়াই একই মনোভাবসম্পন্ন শ্রেণী কমরেডদের সহজ স্বতঃসিদ্ধ পারস্পরিক যোগাযোগ সমগ্র জার্মান সাম্রাজ্যের মূল ধরে নাড়া দিতে পারে। জার্মানির সীমানার বাইরে বিসমার্ক হলেন ইউরোপীয় ব্যাপারের সালিশ। কিন্তু ১৮৪৪ সালেই মার্কস ভবিষদ্দৃষ্টিতে যা দেখেছিলেন, দেশাভ্যন্তরে জার্মান প্রলেতারিয়েতের সেই বলিষ্ঠ অবয়ব দিন দিন আরো শঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। কূপমন্ডুকের উপযোগী করে যে সংকীর্ণ সাম্রাজ্য কাঠামো গড়া হয়েছিল তা এই দৈত্যের পক্ষে এখুনি অপ্রসর, এর মহাকায় দেহ আর প্রশস্ত স্কন্ধ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে ও শীঘ্রই এমন এক মুহূর্ত আসবে যখন সে তার আসন

---

* সমাজতন্ত্রী বিরোধী জরুরী আইন — জার্মানিতে পাশ হয় ১৮৭৮ সালে। এ আইনে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সমস্ত সংগঠন, গণ শ্রমিক সংগঠন নিষিদ্ধ, শ্রমিক সংবাদপত্র রুদ্ধ, সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য নিষিদ্ধ ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের নির্বাসন দেওয়া শুরু হয়। ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলনের চাপে ১৮৯০ সালে এ আইন উঠে যায়। — সম্পাঃ

ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোমাত্রই সাম্রাজ্যের সংবিধানের পুরো কাঠামো টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়বে। শুধু তাই নয়। ইউরোপীয় ও আমেরিকান প্রলেতারিয়েতের আন্তর্জাতিক আন্দোলন এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে, শুধু তার প্রথম সংকীর্ণ রূপ গুপ্ত লীগই নয়, তার চেয়ে বহুগুণে প্রশস্ত তার দ্বিতীয় রূপ প্রকাশ্য শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতিও তার পক্ষে শৃংখল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর শ্রেণীগত অবস্থার অভিন্নতা উপলব্ধির ভিত্তিতে সংহতির যে সহজ অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে, তা সব দেশের ও সব ভাষার শ্রমিকদের মধ্যেই একটি একক মহান প্রলেতারীয় পার্টি গড়ে তোলা ও সংহত রাখার পক্ষে যথেষ্ট। ১৮৪৭ সাল থেকে ১৮৫২ সাল পর্যন্ত লীগ যে মতবাদের প্রতিনিধিত্ব করত, যাকে জ্ঞানী কূপমণ্ডূকেরা বদ্ধ উন্মাদদের ভ্রম কল্পনা হিসাবে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু গোষ্ঠীভক্তের গুপ্ত মতবাদ হিসাবে উড়িয়ে দিতে পারত, আজ সারা পৃথিবীর সব সভ্য দেশে সে মতবাদের অসংখ্য অনুগামী মিলবে, মিলবে যেমন সাইবেরিয়ার খনিতে দণ্ডিত কয়েদীদের মধ্যে তেমনি কালিফোর্নিয়ায় স্বর্ণ খনির মজুরদের মধ্যে। আর এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা, স্বকালে যিনি ছিলেন সর্বাধিক ঘৃণিত, সর্বাধিক নিন্দিত ব্যক্তি, সেই **কার্ল মার্কস** জীবনের অবসানকালে হয়ে ওঠেন পুরানো ও নতুন উভয় দুনিয়ার প্রলেতারিয়েতের কাছেই চিরবাঞ্ছিত ও সদা প্রস্তুত পরামর্শদাতা।

লণ্ডন, ৮ই অক্টোবর, ১৮৮৫

কার্ল মার্কসের লেখা 'কলোনে কমিউনিস্টদের বিচারের স্বরূপপ্রকাশের' তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা হিসাবে এঙ্গেলস এটি লিখেছিলেন। ১৮৮৫ সালে জুরিখে এই সংস্করণটি প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ সালে *Sozial-Demokrat* সংবাদপত্রে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়

পুস্তকের পাঠ অনুযায়ী মুদ্রিত

জার্মান থেকে ইংরেজি অনুবাদের ভাষান্তর

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

লুদভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান

মুখবন্ধ

১৮৫৯ সালে বার্লিন থেকে প্রকাশিত 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় মার্কস বলেছেন কী ভাবে ১৮৪৫ সালে ব্রাসেল্‌সে 'জার্মান দর্শনের ভাবাদর্শগত মতামতের বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্যটি' অর্থাৎ, ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা, যা প্রধানত মার্কস-এরই রচনা, 'আমরা যুক্তভাবে প্রস্তুত করব, বস্তুতপক্ষে, আমাদের এতদিনকার দার্শনিক বিবেকবুদ্ধির সঙ্গে হিসাব নিকাশ মিটিয়ে নেব' বলে স্থির করেছিলাম। 'আমাদের এই সংকল্প কাজে পরিণত হল হেগেল-পরবর্তী দর্শনের সমালোচনা-রূপে। অক্‌টাভো আকারের দুই বৃহৎ খণ্ডে এই পাণ্ডুলিপিটি ভেস্তফালিয়ায় প্রকাশকেন্দ্রে পৌঁছে যাওয়ার অনেকদিন পরে আমরা খবর পেলাম যে, পরিবর্তিত অবস্থার দরুন লেখাটির মুদ্রণ সম্ভব নয়। পাণ্ডুলিপিটিকে মূষিকের দন্তুর সমালোচনার কবলেই ছেড়ে দেওয়া গেল সাগ্রহেই, কারণ আমাদের প্রধান যে উদ্দেশ্য, নিজেদের ধারণাকে স্বচ্ছ করা, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল।'*

তারপর চল্লিশ বছরের বেশি কেটে গিয়েছে, মার্কস মারা গিয়েছেন, এবং আমাদের দুজনের মধ্যে কেউই এই বিষয়ে প্রত্যাবর্তন করবার সুযোগ পাইনি। নানা প্রসঙ্গে আমরা হেগেলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছি; কিন্তু কোথাও সামগ্রিক ও ধারাবাহিকভাবে নয়। এবং ফয়েরবাখের প্রসঙ্গে আমরা একবারও প্রত্যাবর্তন করিনি, যদিও সব সত্ত্বেও হেগেল-দর্শন ও আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে নানা দিক থেকে তিনিই হলেন অন্তর্বর্তী যোগসূত্র।

ইতিমধ্যে জার্মানি ও ইউরোপের সীমানার বাইরে বহুদূর পর্যন্ত, পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যিক ভাষায় মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির অনুগামীরা দেখা দিয়েছেন। অপরপক্ষে বিদেশে বিশেষত ইংলণ্ড ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় চিরায়ত জার্মান দর্শন যেন একধরনের পুনর্জন্ম লাভ করছে এবং এমনকি জার্মানিতেও বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের নামে যে

* এখানে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের লেখা 'জার্মান ভাবাদর্শের' কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

কাঙালী ভোজনের একলেকটিক খিচুড়ি পরিবেশন করা হয় সে সম্বন্ধেও লোকে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে বলে মনে হয়।

এই পরিস্থিতিতে হেগেল-দর্শনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বিষয়ে — কীভাবে আমরা এই দর্শন থেকেই যাত্রা করেছি এবং কী করে তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি, সে বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণীর প্রয়োজনীয়তা আমি ক্রমশই বেশী করে অনুভব করছিলাম। সেই সঙ্গে আমি অনুভব করছিলাম, আমাদের ঝড়ঝাপ্টার দিনে* আমাদের উপর হেগেলোত্তর অন্যান্য দার্শনিকদের তুলনায় ফয়েরবাখের যে প্রভাব, সেটার পূর্ণাঙ্গ স্বীকৃতি না দিলে আমাদের মর্যাদার ঋণ অপরিশোধিত থাকে। তাই *Neue Zeit* পত্রিকার সম্পাদক যখন ফয়েরবাখ সম্বন্ধে স্তার্কে রচিত গ্রন্থটি সমালোচনা করবার অনুরোধ জানালেন, তখন আমি তা সাগ্রহে স্বীকার করলাম। উক্ত পত্রিকার ১৮৮৬ সালের চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যায় আমার লেখা প্রকাশিত হয় এবং বর্তমানে পরিশোধিতভাবে তাইই স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হচ্ছে।

এ লেখা ছাপাখানায় পাঠাবার আগে আমি ১৮৪৫—১৮৪৬ সালের সেই পুরোনো পাণ্ডুলিপিটি খুঁজে বের করেছি এবং আরেকবার পড়ে দেখেছি। তাতে ফয়েরবাখ সংক্রান্ত অংশটি অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে। সে পাণ্ডুলিপির সমাপ্ত অংশটি হল ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা এবং তাতে শুধু এই প্রমাণ হয় যে, তখনো পর্যন্ত আমাদের অর্থনৈতিক ইতিহাসের জ্ঞান কত অসম্পূর্ণ ছিল। ফয়েরবাখের আসল মতবাদের কোন সমালোচনা এতে নেই; অতএব বর্তমান উদ্দেশ্যে তা ব্যবহারোপযোগী নয়। অপরপক্ষে, মার্কসের একটি পুরোনো খাতায় ফয়েরবাখ সম্বন্ধে এগারোটি থিসিস খুঁজে পেয়েছি; সেগুলি এখানে পরিশিষ্ট হিসেবে প্রকাশিত হল। ভবিষ্যতে বিশদ সংরচনের জন্য তিনি এই নোটগুলি তাড়াহুড়োয় লিখে রেখেছিলেন, মোটেই প্রকাশের জন্য নয়। কিন্তু নতুন বিশ্বদৃষ্টির প্রতিভাদীপ্ত ভ্রূণসত্তার প্রথম দলিল হিসেবে এগুলি অমূল্য।

লণ্ডন, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৮ ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

১৮৮৮ সালে স্টুৎগার্তে প্রকাশিত 'লুদভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান' গ্রন্থের স্বতন্ত্র সংস্করণের জন্য এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত

মূল গ্রন্থের পাঠ অনুসরণে মুদ্রিত জার্মান থেকে ইংরেজি অনুবাদের ভাষান্তর

* ঝড়ঝাপ্টা — আঠার শতকের ৭০—৮০-এর দশকে জার্মান বার্গার শ্রেণীর সাহিত্যিক ও সামাজিক আন্দোলন। এ আন্দোলন ছিল সামন্ত-স্বৈরতন্ত্রী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জার্মানির তরুণ লেখকদের একধরনের সাহিত্যিক বিদ্রোহস্বরূপ। — সম্পাঃ

লুদভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান

১

আলোচ্য পুস্তক প্রসঙ্গে* এমন এক যুগে ফিরে যেতে হয় যা সময়ের হিসেবে এক পুরুষের চেয়ে বেশি পূর্ববর্তী না হলেও জার্মানির বর্তমান পুরুষদের কাছে এমনই সুদূরে যে, মনে হয় বুঝি একশো বছর আগের কথা। অথচ এই যুগটিই ছিল জার্মানির ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের প্রস্তুতির যুগ; এবং তারপর আমাদের দেশে যা কিছু ঘটেছে তা ওই ১৮৪৮-এরই পূর্বানুবর্তন, বিপ্লবের ইচ্ছাপত্রের পরিপূরণ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের মতোই ঊনবিংশ শতাব্দীর জার্মানিতেও দার্শনিক বিপ্লব রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সূচনা করে। কিন্তু উভয়ের রূপে কতই না প্রভেদ! ফরাসীরা সমস্ত সরকারী বিজ্ঞান, গির্জা এবং এমনকি প্রায়ই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও সম্মুখ সমরে লিপ্ত ছিলেন; দেশের সীমানার বাইরে হল্যান্ড বা ইংলন্ডে তাঁদের রচনা প্রকাশিত হত অথচ তখন তাঁরা নিজেরা প্রায়ই ব্যাস্টিলে কারারুদ্ধ। অপরপক্ষে, জার্মানরা ছিলেন অধ্যাপক, তরুণদের রাষ্ট্রনিযুক্ত শিক্ষক, তাঁদের রচনাবলী ছিল মনোনীত পাঠ্যপুস্তক এবং দার্শনিক বিকাশ ধারার চরম পরিণতি যে হেগেলপ্রণালী তাকে যেন কিয়ৎ পরিমাণে এমনকি রাষ্ট্রের রাজকীয়-প্রুশীয় দর্শনের পর্যায়েই তুলে দেওয়া হল। এই অধ্যাপকদের আড়ালে, তাঁদের দুর্বোধ্য, পাণ্ডিত্য-কণ্টকিত পরিভাষা এবং দীর্ঘ, ক্লান্তিকর বাক্যাবলীর পিছনে সত্যই কি কোনো বিপ্লবের আশ্রয়লাভ সম্ভবপর?! এবং যে উদারপন্থীরা তখন বিপ্লবের প্রতিনিধি বলে পরিগণিত তাঁরাই কি এই মস্তিষ্ক-বিভ্রান্তিকর দর্শনের তীব্র পরিপন্থী ছিলেন না? কিন্তু যে-কথা সরকার বা উদারপন্থীরা কেউই লক্ষ্য করেননি তা ১৮৩৩ সালেই অন্তত একজনের চোখে পড়েছিল, এবং তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং হাইনরিখ হাইনে**।

* কার্ল স্তার্কে রচিত 'লুদভিগ ফয়েরবাখ', ফের্দিনান্দ এংকে সংস্করণ, স্তুতগার্ত, ১৮৮৫। (এঙ্গেলসের টীকা।)

** এঙ্গেলস এখানে ১৮৩৩ সালে রচিত হাইনের *Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland* (জার্মানিতে ধর্ম ও দর্শনের ইতিহাস প্রসঙ্গে) এই প্রবন্ধ-সংকলনের অন্তর্ভুক্ত 'জার্মান দার্শনিক বিপ্লব' সংক্রান্ত মন্তব্যের উল্লেখ করেছেন। — সম্পাঃ

একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। হেগেলের বিখ্যাত উক্তি 'যা বাস্তব তাই যৌক্তিক, যা যৌক্তিক তাই বাস্তব' — এটি সংকীর্ণচিত্ত সরকারের কাছ থেকে যে-পরিমাণ কৃতজ্ঞতা এবং সমান সংকীর্ণচিত্ত উদারপন্থীদের কাছ থেকে যে-পরিমাণ উষ্মা অর্জন করেছে তা আর কোনো দার্শনিক বাক্যের পক্ষেই সম্ভব হয়নি। এ বাক্য সুস্পষ্টভাবেই বর্তমান পরিস্থিতিকে প্রমাণসিদ্ধ করে; স্বৈরতন্ত্র, পুলিস সরকার, রাজকীয় নির্দেশসাপেক্ষ বিচার ও সেন্সর ব্যবস্থার উপর বর্ষণ করে দার্শনিক আশীর্বাণী। তৃতীয় ফ্রিদারিখ ভিলহেলম ও তাঁর প্রজারা বাক্যটিকে এই অর্থেই বুঝেছিলেন। কিন্তু হেগেলের মতে বর্তমানে যা-কিছুর অস্তিত্ব আছে নিশ্চয় তার সবই বিনাশর্তে বাস্তব নয়। হেগেলের বিচারে কেবল সেটাই বাস্তবতার গুণবিশিষ্ট যেটা সেই সঙ্গে আবার আবশ্যিকও বটে। 'বিকাশধারার পথে বাস্তব নিজেকে আবশ্যিক বলে প্রতিপন্ন করে।' তাই তাঁর মতে যে-কোনো সরকারী ব্যবস্থা — হেগেল নিজেই 'বিশেষ এক খাজনা আইনের' দৃষ্টান্ত দিয়েছেন — বিনাশর্তে বাস্তব নয়। কিন্তু যেটা আবশ্যিক, শেষ পর্যন্ত তা যৌক্তিক বলেও প্রতিপন্ন হয়। অতএব তখনকার প্রুশীয় রাষ্ট্রের উপর প্রযুক্ত হলে হেগেলীয় বাক্যটির কেবল এই অর্থ দাঁড়ায়: এ রাষ্ট্র যতদূর পর্যন্ত আবশ্যিক, ততদূর পর্যন্তই যৌক্তিক বা যুক্তিসিদ্ধ, এবং যদি তা সত্ত্বেও এটি আমাদের কাছে অশুভ বলে প্রতীয়মান হয় এবং অশুভ চরিত্র সত্ত্বেও যদি তা টিকে থাকে তাহলে সরকারের অশুভ চরিত্রটা সঙ্গত এবং তার ব্যাখ্যা মিলবে প্রজাদের পাল্টা অশুভ চরিত্রের মধ্যে। তখনকার প্রুশীয়রা যে-রকম সরকার পাবার উপযুক্ত তারা তাইই পেয়েছিল।

কিন্তু হেগেলের মতে বাস্তবতা এমন একটা ধর্ম নয় যা কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর সর্বাবস্থায় এবং সর্বকালে প্রযোজ্য। বরং তার বিপরীতই। রোমক প্রজাতন্ত্র বাস্তব ছিল, কিন্তু যে রোমক সাম্রাজ্য তার স্থান নেয় তার সম্বন্ধেও তো একই কথা। ১৭৮৯ সালে ফরাসী রাজতন্ত্র এমনই অবাস্তব হয়ে পড়েছিল, অর্থাৎ হয়ে পড়েছিল এমনই আবশ্যিকতাহীন, যুক্তিবিরুদ্ধ যে 'মহান বিপ্লবের' সাহায্যে তার ধ্বংস প্রয়োজন হল; সে বিপ্লবের প্রসঙ্গে হেগেল সর্বদাই দারুণ উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। অতএব, এ দৃষ্টান্তে রাজতন্ত্র অবাস্তব; বিপ্লবই বাস্তব। এইভাবে, আগে যা ছিল বাস্তব বিকাশধারার পথে তাইই হয়ে পড়ে অবাস্তব, লোপ পায় তার আবশ্যিকতা, তার অস্তিত্বের অধিকার, তার যুক্তিসিদ্ধতা! এবং মুমূর্ষু বাস্তবের স্থানে আসে এক নতুন সজীব বাস্তব, শান্তিপূর্ণভাবেই আসে যদি পুরাতনের পক্ষে বিনা সংগ্রামে বিলীন হবার মতো সুবুদ্ধিটুকু বজায় থাকে; আর ওই পুরাতন যদি এ আবশ্যিকতার প্রতিরোধ করে তাহলে আসে বলপ্রয়োগে। এইভাবে হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্ব অনুসারেই হেগেলের প্রতিপাদ্য পরিণত হচ্ছে তার বিপরীতে: মানব-ইতিহাসের ক্ষেত্রে সমস্ত বাস্তবই কালক্রমে যুক্তিবিরুদ্ধ হয়ে পড়ে; অতএব নিজের প্রকৃতি অনুসারেই তা যুক্তিবিরুদ্ধ, আগে

থাকতেই অযৌক্তিকতায় কলঙ্কিত; এবং মানব-মনের মধ্যে যা-কিছু যুক্তিসঙ্গত তাই শেষ পর্যন্ত বাস্তব হতে বাধ্য, সমসাময়িক আপাত বাস্তবের সঙ্গে তার যতই বিরোধ থাকুক না কেন। হেগেলীয় চিন্তাপদ্ধতির সমস্ত নিয়ম অনুসারে সমস্ত বাস্তবের যৌক্তিকতা সংক্রান্ত প্রতিপাদ্যটি শেষ পর্যন্ত আর একটি প্রতিপাদ্যে পরিণত হয়: যা-কিছু অস্তিত্বশীল তাই বিনাশের যোগ্য।

কিন্তু হেগেল দর্শনের (এবং ক্যাণ্টের সময় থেকে দর্শনের সমগ্র আন্দোলনের এই শেষ পর্বে আমরা আবদ্ধ থাকব) প্রকৃত তাৎপর্য ও বৈপ্লবিক চরিত্র আসলে ঠিক এই যে, মানবিক চিন্তা ও ক্রিয়ার ফলাফলগুলি সম্পর্কে চূড়ান্তপনার সমস্ত ধারণার উপর তা চিরকালের মতো মরণ আঘাত হেনেছে। সত্য — যাকে জানাই হল দর্শনের উদ্দেশ্য, সে সত্য আর হেগেলের কাছে কয়েকটি চূড়ান্ত আপ্তবাক্যের সমষ্টিমাত্র নয়, যা কিনা একবার আবিষ্কৃত হবার পর শুধু মুখস্থ করতে পারলেই হল। এখন থেকে সত্য মিলবে জ্ঞান-আহরণ প্রক্রিয়ার মধ্যেই, বিজ্ঞানের সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক বিকাশের মধ্যেই, যে বিজ্ঞান ক্রমশই জ্ঞানের নিম্ন থেকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়, কিন্তু কখনোই তথাকথিত পরম সত্যকে আবিষ্কার করে এমন কোনো স্তরে পৌঁছোয় না যার পর আর তার অগ্রগতি সম্ভব নয়, যেখানে ওই লব্ধ পরম সত্যটির সামনে করজোড়ে অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া তার কিছুই করবার নেই। এবং দার্শনিক জ্ঞান সম্বন্ধে প্রযোজ্য এই কথা অন্যান্য সমস্ত জ্ঞান ও বাস্তব কর্ম সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। মানবতার কোনো এক নিখুঁত আদর্শ অবস্থায় জ্ঞান যেমন কোনো পরিপূর্ণ সমাপ্তিতে উপনীত হতে পারে না, তেমনি ইতিহাসও তা পারে না। কোনো নিখুঁত সমাজ বা নিখুঁত 'রাষ্ট্রের' অস্তিত্ব শুধুমাত্র কল্পনাতেই সম্ভব। পক্ষান্তরে একের পর এক প্রতিটি ঐতিহাসিক ব্যবস্থাই হল মানব-সমাজের নিম্ন থেকে ক্রমশ উচ্চতর পর্যায়ে শেষহীন বিকাশধারার মধ্যে উৎক্রমণমূলক পর্যায়মাত্র। প্রতিটি পর্যায়ই আবশ্যিক, অতএব যে যুগ ও পরিবেশের কারণে তার উদ্ভব সেই যুগ ও পরিবেশের পক্ষে তা সঙ্গত। কিন্তু তারই গর্ভে যে নতুন ও উচ্চতর পরিস্থিতি ক্রমশ বিকাশলাভ করে তার সামনে তার বৈধতা ও যুক্তিসঙ্গতি লোপ পায়। উন্নততর পর্যায়ের জন্য তাকে পথ ছেড়ে দিতেই হবে, যে পর্যায় নিজেও আবার ক্ষয় ও বিনাশ লাভ করবে। ঠিক যেমন বুর্জোয়া বৃহদায়তন শিল্প প্রতিযোগিতা এবং বিশ্ববাজার সৃষ্টি করে কার্যত সমস্ত কায়েমী যুগপূজ্য প্রতিষ্ঠান বিলীন করেছে, তেমনি এই দ্বান্দ্বিক দর্শনও বিলীন করেছে পরম সত্যের সমস্ত ধারণা এবং তদনুগামী মানবতার একটা চূড়ান্ত অবস্থার ধারণা। দ্বন্দ্বতাত্ত্বিক দর্শনের কাছে চূড়ান্ত, পরম বা পূত বলে কিছুই নেই। এ দর্শন সবকিছুর ক্ষেত্রে ও মধ্যে অনিত্যতা প্রকাশ করে দেয়; তার সামনে উদ্ভব ও বিলয়ের অবিচ্ছিন্ন ধারা ছাড়া, নিম্ন থেকে উচ্চতর অবস্থায় শেষহীন উন্নয়ন ছাড়া আর কিছুই টিকতে পারে না। এবং দ্বান্দ্বিক দর্শন নিজেই আসলে

চিন্তাপরায়ণ মস্তিষ্কে এই পদ্ধতির প্রতিবিম্বমাত্র। তার একটি রক্ষণশীল দিকও অবশ্যই আছে: এ দর্শন অনুসারে জ্ঞান ও সমাজের নির্দিষ্ট এক একটা পর্যায় তাদের কাল ও পরিস্থিতির পক্ষে সঙ্গত, কিন্তু তার বেশী আর কিছুই নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির রক্ষণশীলতাটুকু আপেক্ষিক, এর বৈপ্লবিক তাৎপর্যই অনাপেক্ষিক — একমাত্র এই পরমটুকুই দ্বন্দ্বতাত্ত্বিক দর্শনে স্বীকৃত।

এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে প্রকৃতিবিজ্ঞানের বর্তমান পরিস্থিতির পরিপূর্ণ সংগতি আছে কিনা — এ বিজ্ঞান অনুসারে এমনকি পৃথিবীরও সম্ভাব্য অবসান এবং তার অধিবাসীদের বেশ সুনিশ্চিত অবসানের কথা বলা হয়, অতএব তাতে মানব-ইতিহাসেরও ঊর্ধ্বগতির দিক ছাড়াও একটি অধোগতির দিক স্বীকৃত — সে প্রশ্ন এখানে উত্থাপন করবার প্রয়োজন নেই। সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তন যখন মোড় ঘুরে নিম্নমুখী হবে সে বিন্দু থেকে আমরা অন্তত এখনো যথেষ্ট দূরে আছি এবং যে বিষয় এখনো প্রকৃতিবিজ্ঞানের কাছে আলোচ্য হয়ে ওঠেনি, হেগেল-দর্শন তা নিয়ে ভাবিত হবে এ আশা করতে পারি না।

কিন্তু এ কথাটা এখানে অবশ্যই বলা দরকার: হেগেলের রচনায় উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি এত সুস্পষ্টভাবে সুনির্দিষ্ট হয়নি। এগুলি তার পদ্ধতির অনিবার্য সিদ্ধান্ত, কিন্তু তিনি নিজে কখনো এতটা সুস্পষ্টভাবে সে সিদ্ধান্ত টানেননি এবং বস্তুত তার সহজ কারণ এই যে, তিনি একটি দর্শন-তন্ত্র গড়ে তুলতে বাধ্য ছিলেন এবং চিরাচরিত চাহিদা অনুসারে দর্শন-তন্ত্রের উপসংহারে কোনো না কোনো চরম সত্য থাকতে বাধ্য। অতএব, বিশেষত তাঁর 'যুক্তিতত্ত্বে' (Logic) হেগেল যত জোর দিয়েই বলুন না কেন যে, এই পরম সত্য কেবল যুক্তিমূলক (তাই ঐতিহাসিক) প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়, তবু তিনি সে প্রক্রিয়ার এক পরিসমাপ্তি যোগাতে বাধ্য বোধ করলেন, কেননা তাঁর দর্শন-তন্ত্রকে কোনো না কোনো এক বিন্দুতে এনে শেষ করতেই হবে। তাঁর 'যুক্তিতত্ত্বে' তিনি এই শেষটাকে আবার শুরুতে পরিণত করতে পারেন, কেননা এখানে তাঁর সমাপ্তি বিন্দু অর্থাৎ পরম ভাবসত্তা — এবং তা এই অর্থেই পরম যে, সে বিষয়ে তাঁর বক্তব্যের পরম অভাব বর্তমান — 'অন্যীভূত হয়' (alienats) (অর্থাৎ রূপান্তরিত হয়) প্রকৃতিরূপে এবং পরে চৈতন্যের মধ্যে — অর্থাৎ চিন্তা ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে — ফের স্বরূপ লাভ করে। কিন্তু এই সমগ্র দর্শনের শেষে অনুরূপ ভাবে ফের শুরুতে প্রত্যাবর্তন সম্ভব কেবল এক উপায়ে, অর্থাৎ কিনা, ইতিহাসের পরিসমাপ্তি নিম্নোক্তভাবে কল্পনা করতে হবে: মানবজাতি এই পরম ভাবসত্তার জ্ঞান লাভ করছে এবং ঘোষণা করছে যে, হেগেলীয় দর্শনেই সে জ্ঞান অর্জিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর যে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে সমস্ত গোঁড়ামি লোপ পায় তার বিপরীতে এইভাবে হেগেলীয় দর্শনতন্ত্রের গোঁড়ামির সবটুকুই পরম সত্য বলে ঘোষিত হয়েছে। বৈপ্লবিক দিকটি

তাই রক্ষণশীলতার অতি বৃদ্ধিতে চাপা পড়ে গিয়েছে এবং শুধু দার্শনিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে নয়, সেটা ঐতিহাসিক কর্মের ক্ষেত্রেও। মানবজাতি হেগেলের মাধ্যমেই যখন ওই 'পরম ভাবসত্তার' পরিব্যাখ্যানের পর্যায়ে পৌঁছেছে তখন কার্যক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই এত দূর এগিয়েছে যে, এই 'পরম ভাবসত্তাকে' বাস্তবে রূপান্তরিত করা তার পক্ষে সম্ভব। অতএব সমসাময়িকদের উপর ওই 'পরম ভাবসত্তা'র বাস্তব রাজনৈতিক দাবিও খুব বেশি লম্বা করা উচিত নয়। তাই 'অধিকারের দর্শনের' উপসংহারে আমরা দেখি, তৃতীয় ফ্রিদরিখ ভিলহেলম বারবার কিন্তু ব্যর্থভাবে প্রজাদের কাছে সাবেকী সমাজ বিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত যে রাজতন্ত্রের অর্থাৎ, তখনকার পেটি বুর্জোয়া জার্মান অবস্থার উপযোগী মালিক-শ্রেণীর সীমাবদ্ধ নরমপন্থী পরোক্ষ শাসন-ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তারই মধ্যেই নাকি ওই পরম ভাবসত্তা রূপ নেবে এবং তাছাড়াও আমাদের কাছে আভিজাত্যের আবশ্যিকতা মনন পদ্ধতিতে প্রমাণ করা হয়েছে।

তাই, এমন এক সমূহ বৈপ্লবিক চিন্তাপদ্ধতি যে কেমন করে এহেন চূড়ান্ত নিরীহ এক রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে উপনীত হল তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাঁর দর্শনতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ আবশ্যিকতাগুলির মধ্যেই। আসলে এই বিশেষ ধরনের সিদ্ধান্তের কারণ এই যে, হেগেল হলেন জার্মান, এবং সমসাময়িক গ্যেটের মতো তাঁর মাথাতেও একটি কূপমণ্ডূক টিকি ছিল। নিজ নিজ ক্ষেত্রে এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন এক একজন অলিম্পীয় জিউস*, কিন্তু কেউই জার্মান কূপমণ্ডূকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেননি।

কিন্তু এ সমস্ত সত্ত্বেও পূর্ববর্তী যে-কোনো দর্শনতন্ত্রের তুলনায় হেগেলীয় তন্ত্র বহু বিস্তৃত ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হতে বাধা পায়নি, এই সব ক্ষেত্রে চিন্তার এমন ঐশ্বর্য তা বিকশিত করতে পারল যা আজো বিস্ময়কর মনে হয়। মনের ফেনমেনলজি (phenomenology) (তাকে মনের ভ্রূণতত্ত্ব ও প্রত্নজীববিদ্যার সমান্তরাল বলা যায়, বিকাশের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিচেতনার প্রকাশ, যে-স্তরগুলো ইতিহাসগতভাবে অতিক্রান্ত মানুষের চেতনার স্তরের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হিসেবে আলোচিত), যুক্তিতত্ত্ব, প্রকৃতি-দর্শন, মনোদর্শন, শেষটি বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভাগ অনুসারে আলোচিত: ইতিহাসের দর্শন, অধিকারের দর্শন, ধর্মের দর্শন, দর্শনের ইতিহাস, নন্দনতত্ত্ব, ইত্যাদি — এই সব বিভিন্ন ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে হেগেল বিকাশের মূলসূত্র আবিষ্কার ও প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন। এবং তিনি যে-হেতু শুধুই সৃজনী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তাই নয়, তাছাড়াও তাঁর ছিল বিশ্বকোষসুলভ পাণ্ডিত্য, তাই প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর কীর্তি যুগান্তকারী। একথা অবশ্য স্বতঃই বোঝা যায় যে, 'দর্শনতন্ত্রের' খাতিরে তাঁকে প্রায়ই কয়েকটি কৃত্রিম ছক সৃষ্টি করতে হয়েছে, যা নিয়ে তাঁর বামন প্রতিপক্ষের

* জিউস — প্রাচীন গ্রীকদের মহাদেব, অলিম্পীয় পর্বতে অধিষ্ঠিত। — সম্পাঃ

দল আজো পর্যন্ত অমন ভয়ঙ্কর সোরগোল তোলে। কিন্তু এগর্লি তাঁর কীর্তির নেহাতই ভারা-বাঁধা মাচা। এখানে অনর্থক এলোমেলো না ঘ্বরে কেউ যদি আরো এগিয়ে প্রকান্ড সৌধটির মধ্যে ঢুকতে পারেন তাহলে তাঁর চোখে পড়বে অসীম ঐশ্বর্য, যার প্বরো ম্ল্য আজো ম্লান হয়নি। সমস্ত দার্শনিকদের ক্ষেত্রেই ঠিক **দর্শনতন্ত্রটাই** অনিত্য এবং তার সহজ কারণ মানবমনের এক অমর বাসনা, সমস্ত দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হবার বাসনা। কিন্তু যদি সমস্ত দ্বন্দ্ব সত্যই একবার উত্তীর্ণ হওয়া যায় তাহলে আমরা উপনীত হব পরম সত্যে — শেষ হবে বিশ্ব ইতিহাসের, তব্ব সে ইতিহাসকে চলতেই হবে, যদিও তখন তার আর করণীয় কিছ্ব নেই। অতএব এখানে এক নতুন সমাধানহীন অন্তর্দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়। একবার যদি এই কথা হৃদয়ঙ্গম করা যায় — এবং সেকথা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য শেষ পর্যন্ত আর কোন দার্শনিক হেগেলের চেয়ে বেশী সহায়তা করেননি — যে, এইভাবে ব্বঝলে দর্শনের কর্তব্য দাঁড়ায় একজন একক দার্শনিককে দিয়ে সেইটে সম্পন্ন করানো যা কিনা সমগ্র মানবজাতির ক্রমবিকাশের দ্বারা সাধ্য, একথা হৃদয়ঙ্গম করা মাত্র, এতদিন ধরে দর্শনকে যে অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে সে অর্থে সমস্ত দর্শনের অবসান অনিবার্য। তখন এই পথে ও একক দার্শনিকের পক্ষে যা অনধিগম্য, সেই 'পরম সত্যকে' শান্তিতে ছেড়ে দেওয়া হবে, কিন্তু তার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানের পথ ধরে সন্ধান করা যাবে অধিগম্য আপেক্ষিক সত্যাবলীর এবং দ্বান্দ্বিক চিন্তাপদ্ধতি অন্বসারে সে সত্যগর্লির সাধারণীকরণ। অন্তত হেগেলের সঙ্গে সঙ্গে দর্শনেরও পরিসমাপ্তি ঘটল; কেননা, একদিকে তিনি তাঁর দর্শনতন্ত্রে সমগ্র দার্শনিক বিকাশের অত্যাশ্চর্য সাধারণীকরণ করেছেন এবং অপরদিকে, অচেতনভাবে হলেও তিনি আমাদের পথ দেখিয়েছেন, কীভাবে দর্শনতন্ত্রের গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে প্থিবীর বাস্তব সদর্থক জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হতে হবে।

জার্মানির দর্শন-রঞ্জিত আবহাওয়ায় হেগেলীয় তন্ত্রের প্রচণ্ড প্রভাবের কথা কল্পনা করা কঠিন নয়। কয়েক দশক ধরে এক বিজয় যাত্রা চলল, হেগেলের মৃত্যুতেও তার পরিসমাপ্তি ঘটেনি। বরং ১৮৩০ থেকে ১৮৪০ সালেই 'হেগেলবাদ' প্রায় একচ্ছত্র রাজত্ব করেছে এবং এমনকি বিরোধীদের মধ্যেও তার প্রভাব কমবেশি সংক্রামিত হয়েছে। ঠিক এই পর্বেই, সচেতন বা অচেতন যেভাবেই হোক, বহ্ব বিচিত্র বিজ্ঞানে হেগেলীয় মতবাদের ব্যাপক অন্বপ্রবেশ ঘটে এবং যে-জনবোধ্য সাহিত্য ও দৈনিকপত্র সাধারণ 'শিক্ষিত বিবেকের' খোরাক যোগায় তাকেও তা স্ববাসিত করেছে। কিন্তু গোটা রণক্ষেত্র জ্বড়ে এই যে জয়, সেটাই হল এক আভ্যন্তরীণ সংগ্রামের ভূমিকা।

আগেই দেখেছি, সামগ্রিকভাবে দেখলে হেগেলীয় মতবাদের মধ্যে অতি বিভিন্ন সব ব্যবহারিক পার্টি-মতামত ধারণ করার মতো প্রচুর অবকাশ আছে। অথচ তখনকার জার্মানির তত্ত্বগত পরিমন্ডলে ব্যবহারিক তাৎপর্য ছিল সর্বোপরি দ্বটি জিনিসের:

ধর্ম এবং রাজনীতির। হেগেলীয় **তন্ত্রের** ওপর প্রধান জোর দিলে যে কেউ উভয় ক্ষেত্রেই যথেষ্ট রক্ষণশীল হতে পারত; **দ্বন্দ্ব পদ্ধতিকে** প্রধানতম বিবেচনা করলে যে কারোর পক্ষেই রাজনীতি ও ধর্ম উভয় ব্যাপারেই চরম বিরোধী দলের অন্তর্গত হওয়া সম্ভব। তাঁর রচনায় বৈপ্লবিক উষ্মার প্রভূত অভিব্যক্তি সত্ত্বেও মনে হয় হেগেল নিজে মোটের উপর রক্ষণশীলতারই পক্ষপাতী ছিলেন। বস্তুত পদ্ধতির তুলনায় তাঁর দর্শনতন্ত্রের জন্য হেগেলকে ঢের বেশি 'কঠিন মানসিক পরিশ্রম' করতে হয়েছিল। তিরিশের দশকের শেষাশেষি তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ ক্রমশই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। গোঁড়া পিয়েটিস্ট* ও সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তথাকথিত তরুণ হেগেলবাদীরা — বামপন্থীরা — একটু একটু করে তৎকালীন তীব্র সমস্যাবলীর প্রতি তাঁদের দার্শনিক-ভদ্রলোকী আচরণ পরিহার করলেন — এতদিন পর্যন্ত এই জন্যই তাঁদের মতবাদের প্রতি রাষ্ট্রের সহনশীলতা এমনকি আনুকূল্য জুটেছিল। এবং ১৮৪০-এ চতুর্থ ফ্রিদরিখ ভিলহেল্মের সঙ্গে সঙ্গে গোঁড়া ভণ্ডামি ও স্বৈরপন্থী সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া সিংহাসনে আসীন হবার পর খোলাখুলি পক্ষগ্রহণ প্রায় অনিবার্য হয়ে পড়ল। তখনো দার্শনিক অস্ত্র নিয়েই সংগ্রাম চলেছে, কিন্তু তা আর অমূর্ত দার্শনিক আদর্শের জন্য নয়। সরাসরি সাবেকী ধর্ম ও সমসাময়িক রাষ্ট্র উচ্ছেদের কথাই উঠল। *Deutsche Jahrbücher***-এ এখনো ব্যবহারিক লক্ষ্যের কথাটা দার্শনিক ছদ্মবেশে উপস্থাপিত হলেও ১৮৪২ সালের *Rheinische Zeitung*-এ তরুণ হেগেলবাদী প্রচার সরাসরি উদীয়মান র‍্যাডিকেল বুর্জোয়ার দর্শন হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করল, দার্শনিক আলখাল্লাটা ব্যবহৃত হত কেবল সেন্সরকে ছলনা করার জন্য।

সে সময়ে কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্র নেহাতই কণ্টকিত, তাই প্রধান সংগ্রাম ধর্মের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হল। অবশ্য এ সংগ্রাম পরোক্ষভাবে রাজনৈতিকও ছিল, বিশেষ করে ১৮৪০ থেকে। ১৮৩৫ সালে প্রকাশিত স্ট্রাউসের 'যীশুর জীবন' তার প্রথম প্রেরণা জোগায়। এই গ্রন্থে খ্রীষ্টীয় পুরাকথার (gospel myths) উৎস সংক্রান্ত যে মতবাদ প্রস্তাবিত হয়েছিল পরে ব্রুনো বাউয়ের তার বিরোধিতা করেন এবং প্রমাণ দেন যে, বহু খ্রীষ্টীয় গল্পই শাস্ত্রকারদের উদ্ভাবন-মাত্র। মতবাদদুটির মধ্যে সংঘর্ষ চলে 'আত্মচেতনা' ও 'বস্তুসত্তা' **(substance)** নিয়ে দার্শনিক বিতর্কের ছদ্মবেশে।

* পিয়েটিজম — লুথারীয় খ্রীষ্টধর্মের একটি ধারা, সতের শতকে জার্মানিতে এর উদ্ভব। — সম্পাঃ

** *Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst* (বিজ্ঞান শিল্পকলার জার্মান বার্ষিকী) — আ. রুগে ও এখতেরমেয়ার সম্পাদিত তরুণ হেগেলবাদীদের মুখপত্র, ১৮৪১ সাল থেকে ১৮৪৩ সাল পর্যন্ত লাইপজিগ থেকে প্রকাশিত। — সম্পাঃ

বাইবেলের অলৌকিক উপাখ্যানগুলি গোষ্ঠীর গর্ভে অচেতন, চিরাচরিত পুরাকথা-উদ্ভাবন প্রবৃত্তির পরিণাম, না সেগুলি শাস্ত্রকারদেরই উদ্ভাবন, এই সমস্যাকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে প্রশ্ন তোলা হল: বিশ্ব ইতিহাসের ক্ষেত্রে নির্ধারক সক্রিয় শক্তি 'বস্তুসত্তা' না 'আত্মচেতনা'? শেষ পর্যন্ত এলেন সমসাময়িক নৈরাজ্যবাদের পয়গম্বর স্তিরনার — বাকুনিন তাঁর কাছে অনেক ঋণী — এবং তিনি সার্বভৌম 'আত্মচেতনার' মাথায় পরালেন তাঁর সার্বভৌম 'অহং'-এর মুকুট।*

হেগেলীয় সম্প্রদায়ের ভাঙনের এই দিকটার বিস্তারিত আলোচনা আমরা আর তুলব না। আমাদের কাছে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই: তরুণ হেগেলবাদীদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাঁদের অনেকেই প্রত্যক্ষ ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বাস্তব প্রয়োজনে ইঙ্গো-ফরাসী বস্তুবাদে গিয়ে পেঁৗছলেন। এখানে সংঘর্ষ ঘটল তাঁদের সম্প্রদায়গত দর্শনতন্ত্রের সঙ্গে। বস্তুবাদ অনুসারে প্রকৃতিই একমাত্র সত্য; পক্ষান্তরে হেগেলীয় তন্ত্র অনুসারে প্রকৃতি আসলে পরম ভাবসত্তার 'অন্যীভবন' মাত্র অর্থাৎ, বলতে কি তা 'ভাবসত্তার' অধঃপতন বিশেষ; যাই হোক, এখানে চিন্তা প্রক্রিয়া ও তার চিন্তাফল, বা ভাবসত্তাই হল আদি এবং প্রকৃতি হল উৎপন্ন বস্তু, তার অস্তিত্ব রয়েছে কেবল ভাবসত্তার অনুমতিসাপেক্ষে। এবং এই অন্তর্বিরোধের মধ্যেই তরুণ হেগেলবাদীরা নানারকম হাবুডুবু খেয়েছেন।

তারপর এল ফয়েরবাখের 'খ্রীষ্টধর্মের মর্মবস্তু',** ঘোরপ্যাঁচ বাদ দিয়ে সরাসরি বস্তুবাদকে আবার প্রতিষ্ঠিত করে তা এক ফুৎকারে ওই অন্তর্বিরোধকে ধুলো করে দিল। কোনো রকম দর্শনের অপেক্ষা না করেই প্রকৃতি বর্তমান। মানুষ আমরা নিজেরাই হলাম প্রকৃতির উৎপন্ন, বেড়ে উঠেছি প্রকৃতির এই ভিত্তির ওপরেই। প্রকৃতি এবং মানুষের বাইরে কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই এবং আমাদের ধর্মীয় উৎকল্পনায় যে সমস্ত উচ্চতর সত্তা উদ্ভাবিত হয়েছে, তারা হল আমাদের নিজেদেরই সত্তার কাল্পনিক প্রতিবিম্ব মাত্র। ভাঙল মোহ; 'দর্শনতন্ত্র' ফেটে গিয়ে পরিত্যক্ত হল। প্রমাণ হল, অন্তর্বিরোধটির অবস্থান মাত্র আমাদের কল্পনাতেই, অতএব তা বিলীন হয়ে গেল। এ গ্রন্থ যে কী মুক্তির আস্বাদ দিল, অভিজ্ঞতা ছাড়া তার ধারণা করা যায় না। সঞ্চারিত হল সর্বব্যাপী উৎসাহ; আমরা সকলে তৎক্ষণাৎ ফয়েরবাখপন্থী হয়ে গেলাম। এই নতুন ধারণাকে মার্কস যে কী উৎসাহে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং সমস্ত

* মাক্স স্তিরনার (কাস্পার শ্মিদের ছদ্মনাম) রচিত *Der Einzige und sein Eigentum* (অহং ও তার স্বাধিকার) বইটির কথা বলছেন এঙ্গেলস। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৪৫ সালে। — সম্পাঃ

** ১৮৪১-এ লাইপজিগ থেকে প্রকাশিত ফয়েরবাখের *Das Wesen des Christentums* ('খ্রীষ্টধর্মের মর্মবস্তু')। — সম্পাঃ

সমালোচনামূলক আপত্তি সত্ত্বেও তিনি এর দ্বারা কতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন তা 'পবিত্র পরিবার' বইটি পড়লে বোঝা যায়।

বইটির ত্রুটিগুলি পর্যন্ত তার আশু প্রভাবকে বাড়াতে সাহায্য করে। তার সাহিত্যসুলভ, কখনো কখনো এমনকি সাড়ম্বর, রচনারীতি ব্যাপক পাঠকসাধারণকে আকৃষ্ট করেছিল, এবং অনেক বছর ধরে অমূর্ত ও দুর্বোধ্য হেগেলীয়তার পর তা অন্তত স্বস্তিকর মনে হয়েছিল। বইটিতে প্রেম নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত উচ্ছ্বাস সম্বন্ধেও একই কথা; অবশ্য 'শুদ্ধ মননের' অধুনা অসহ্য একাধিপত্যের পর তার যৌক্তিকতা যদিই বা না থাকে, অন্তত কৈফিয়ৎ ছিল। কিন্তু আমাদের পক্ষে কিছুতেই ভোলা চলবে না যে, ১৮৪৪ থেকে জার্মানির 'শিক্ষিত' সমাজে মহামারীর মতো যা সংক্রামিত হয়েছে সেই 'সাঁচ্চা সমাজতন্ত্র' শুরু করে ফয়েরবাখের ঠিক এই দুটি দুর্বলতা থেকেই। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বদলে তা সামনে আনে সাহিত্যিক বাণী, উৎপাদন-ব্যবস্থার অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রলেতারিয়েতের মুক্তির বদলে আনে 'প্রেমের' সাহায্যে মানবজাতির মুক্তি। সংক্ষেপে, নক্কারজনক ফুললিত ভাষা ও প্রেমের উচ্ছ্বাসে তা আত্মহারা হয়। এই ধারার প্রকৃষ্ট উদাহরণ কার্ল গ্র্যুন মশাই।

আরো একটি কথাও ভোলা চলবে না: হেগেলীয় সম্প্রদায়ে ভাঙন ধরলেও সমালোচনার সাহায্যে হেগেলীয় দর্শনের খণ্ডন হয়নি। স্ত্রাউস এবং বাউয়ের তার এক একটি দিক গ্রহণ করে পরস্পরের বিরুদ্ধে বিতর্ক চালান। ফয়েরবাখ সেই দর্শনতন্ত্র ভেঙ্গে বেরিয়ে আসেন এবং তা স্রেফ বর্জন করেন। কিন্তু কোনো একটি দর্শনকে শুধু ভুল বলে ঘোষণা করলেই তা খণ্ডিত হয় না। এবং হেগেল দর্শনের মতো অমন শক্তিশালী যে কীর্তি জাতির মানসিক বিকাশের উপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছে, তাকে শুধু অবজ্ঞা দিয়ে দূর করা যায় না। তার নিজের অর্থেই তাকে 'মুছে দেওয়া' প্রয়োজন, অর্থাৎ সমালোচনার সাহায্যে তার আধার ধ্বংস করে তার লব্ধ নতুন আধেয়টিকে রক্ষা করা প্রয়োজন। এই কাজ কী করে সমাধা হয়েছিল তা আমরা পরে দেখব।

কিন্তু ফয়েরবাখ যেমন বিনা বাক্যব্যয়ে হেগেলকে ঠেলে সরিয়ে দেন, ইতিমধ্যে ১৮৪৮-এর বিপ্লবও তেমনি বিনা বাক্যব্যয়েই সমস্ত দর্শনকেই ঠেলে সরিয়ে দেয়। এবং সে প্রক্রিয়ার মধ্যে ফয়েরবাখ নিজেও আড়ালে পড়ে যান।

২

সমস্ত দর্শনের, বিশেষত সাম্প্রতিকতম দর্শনের বৃহৎ বনিয়াদী প্রশ্ন হল চিন্তা ও সত্তার সম্পর্ক সংক্রান্ত প্রশ্ন। খুব আদিম কাল থেকেই, মানুষ যখন নিজের দেহ গঠন

সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং স্বপ্নচ্ছায়ার ব্যাখ্যা করতে না পেরে* তার বিশ্বাস হয়েছে যে, তার চিন্তা ও সংবেদনা তার নিজস্ব দৈহিক প্রক্রিয়া নয়, কোনো এক বিশিষ্ট আত্মার কাজ, সে আত্মা দেহতে বাস করে এবং মৃত্যুর সময় দেহকে পরিত্যাগ করে, সেই যুগ থেকেই মানুষকে এই আত্মার সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক নিয়ে চিন্তা করতে হয়েছে। এ আত্মা যদি মৃত্যুর পর দেহকে পরিত্যাগ করেও বেঁচে থাকে, তাহলে তার আরো এক স্বতন্ত্র মৃত্যু সম্ভাবনা আবিষ্কার করবার কারণ থাকে না। এইভাবেই ধারণা জন্মাল আত্মা অমর; বিকাশের সে পর্যায়ে এই অমরত্বের কথাটা মোটেই সান্ত্বনা নয়, বরং এমনই এক নিয়তি যার বিরুদ্ধে যোঝবার প্রচেষ্টা নিষ্ফল, এবং প্রায়ই, যেমন গ্রীকদের মধ্যে, তাকে ধরা হত রীতিমতো এক দুর্ভাগ্য বলে। ধর্মমূলক সান্ত্বনার আকাঙ্ক্ষা থেকে নয়, বরং আত্মার অস্তিত্ব একবার স্বীকার করার পর দেহাবসানে আত্মা নিয়ে কী করা যাবে, এ বিষয়ে সাধারণ সীমাবদ্ধতাপ্রসূত বিহ্বলতা থেকে উদ্ভব হল ব্যক্তির অমরত্ব সংক্রান্ত বীরস ধারণার। ঠিক এইভাবেই বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিতে ব্যক্তিত্বারোপ করে প্রথম দেবতাদের উদ্ভব হল এবং ধর্মের আরো বিকাশের পর্যায়ে এই দেবতারা ক্রমশই অপ্রাকৃত রূপ লাভ করে এবং শেষ পর্যন্ত মানুষের স্বাভাবিক মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যা দেখা দেয় সেই অমূর্তায়ন প্রক্রিয়ার — এমনকি বলতে পারি পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ার — মাধ্যমে বহু ন্যূনাধিক সীমাবদ্ধ এবং পরস্পরকে সীমাবদ্ধকারী দেবতাদের মধ্যে থেকে মানুষের মনে উদ্ভব হল একেশ্বরবাদী ধর্মগুলির একক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ধারণা।

তাই, যে-কোনো ধর্মের মতোই চিন্তা ও সত্তার, আত্মা ও প্রকৃতির সম্পর্ক সংক্রান্ত প্রশ্নের, সমগ্র দর্শনের সর্বপ্রধান প্রশ্নের মূলে আছে বন্য দশার সংকীর্ণ ও অজ্ঞ ধারণা। কিন্তু ইউরোপের মানুষ খ্রীষ্টীয় মধ্য যুগের সুদীর্ঘ আচ্ছন্নতা থেকে জেগে ওঠবার পরই প্রশ্নটি পুরো তীক্ষ্ণতার সঙ্গে প্রথম উত্থাপিত হতে, তার পূর্ণ তাৎপর্য অর্জন করতে পারল। চিন্তার সঙ্গে সত্তার সম্পর্ক কী, — চৈতন্য ও প্রকৃতির মধ্যে কোনটি আদি — এই প্রশ্নটি প্রসঙ্গত মধ্যযুগীয় স্কলাস্টিকস-এর** ক্ষেত্রেও একটা বড়ো ভূমিকা

* বন্য এবং নিম্ন বর্বর স্তরের মানুষদের মধ্যে এখনো এই ধারণা সর্বব্যাপী যে স্বপ্ন-দৃষ্ট মানব মূর্তি আসলে সাময়িকভাবে দেহ ছেড়ে আসা আত্মা; তাই কোনো লোকের মূর্তি স্বপ্নে দেখা দিয়ে স্বপ্নদ্রষ্টার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করলে দায়ী করা হয় সেই আসল লোকটিকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইমথার্ন ১৮৮৪ সালে লক্ষ্য করেছেন 'গায়েনা ইণ্ডিয়ানদের' মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত ছিল। — সম্পাঃ

** স্কলাসটিক্স — মধ্য যুগের ধর্মীয়-ভাববাদী দর্শনের যে সব ধারার প্রাধান্য ছিল তাদের সাধারণ নাম: স্কুলে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তা পড়ানো হত। ধর্মতত্ত্বের সেবক এই দর্শন প্রকৃতি ও পরিবেশের বাস্তবতা নিয়ে কোনো অনুসন্ধান চালাত না, খ্রীষ্টীয় চার্চের আপ্তবাক্যগুলি ভিত্তি করে অনুমান-পদ্ধতিতে তার সাধারণ মূলনীতিগুলি থেকে প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্ত ও অনুশাসন টানার চেষ্টা করত। — সম্পঃ

নিয়েছে, আর খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত রূপে শাণিত হয়েছিল: ঈশ্বর কি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, না, চিরকালই জগতের অস্তিত্ব ছিল?

এ প্রশ্নের যে যেমন উত্তর দিয়েছেন সেই অনুসারে দার্শনিকেরা দুটি বৃহৎ শিবিরে বিভক্ত হয়েছেন; যাঁরা প্রকৃতির তুলনায় চৈতন্যকে আদি বলেছেন, অতএব কোনো না কোনো ভাবে শেষ পর্যন্ত মেনেছেন জগৎ সৃষ্টির কথা — এবং দার্শনিকদের মধ্যে, যেমন হেগেলের বেলায়, এই সৃষ্টির ব্যাপারটা খ্রীষ্টধর্মের চেয়েও প্রায়ই অনেক বেশী জট-পাকানো ও বিদঘুটে হয়ে ওঠে -- তাঁরা গঠন করেছেন ভাববাদীর শিবির। অন্যেরা যাঁরা প্রকৃতিকে আদি মনে করেছেন তাঁরা বিভিন্ন বস্তুবাদী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

ভাববাদ এবং বস্তুবাদ এই দুটি পরিভাষা শুরুতে এ ছাড়া আর কিছুই বোঝায়নি, এবং এখানেও এগুলি অন্য কোনো অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। আমরা পরে দেখব এগুলির উপর অন্য কোনো অর্থ আরোপ করলে কী রকম বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

কিন্তু চিন্তার সঙ্গে সত্তার সম্পর্কের প্রশ্নটির আরো একটা দিক আছে: যে পৃথিবী দ্বারা আমরা পরিবৃত সে সম্বন্ধে আমাদের চিন্তার সঙ্গে সেই পৃথিবীর সম্পর্ক কী রকম? আমাদের চিন্তা কি বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে সক্ষম, বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যা ধারণা সেটা কি বাস্তবতার সঠিক প্রতিবিম্ব দিতে পারে? দর্শনের পরিভাষায় এই সমস্যাটিকে বলা হয় চিন্তা ও সত্তার অভিন্নতার সমস্যা। দার্শনিকদের বিপুল অধিকাংশই প্রশ্নটির ইতিবাচক উত্তর দিয়েছেন। যেমন হেগেলের ক্ষেত্রে এই ইতিবাচক উত্তর স্বতঃসিদ্ধ: কেননা বাস্তব জগতের ক্ষেত্রে আমরা যার জ্ঞানলাভ করি তা হল সে জগতের মননসার, সেইটে যার কল্যাণে এ বিশ্ব হয়ে উঠছে পরম ভাবসত্তার ক্রমিক রূপায়ণ, যে ভাবসত্তা অনাদিকাল থেকে বিশ্ব থেকে স্বাধীনভাবে এবং বিশ্বের আগে থেকে কোথাও না কোথাও বর্তমান ছিল। এ কথা স্বতঃস্পষ্ট যে, মননপ্রক্রিয়া এমন একটা সারবস্তুকে জানতে সক্ষম, যা আগে থেকেই একটা মননসার। একথাও সমান সুস্পষ্ট যে, এখানে যা প্রতিপাদ্য সেটা মূল বাক্যের মধ্যেই সঙ্গোপনে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও চিন্তা ও সত্তার অভিন্নতা সংক্রান্ত তাঁর প্রমাণ থেকে আরো এই সিদ্ধান্ত করতে হেগেলের কোন বাধা হয়নি যে, তাঁর দর্শন তাঁর নিজের চিন্তার কাছে সঠিক বলেই সেটা একমাত্র সঠিক দর্শন, তাই চিন্তা ও সত্তার অভিন্নতার জন্য মানবজাতিকে তাঁর দর্শনকে তত্ত্বের ক্ষেত্র থেকে ব্যবহারে পরিবর্তিত করে সমগ্র জগৎকে হেগেলীয় মূলসূত্র অনুসারে রূপান্তরিত করতে হবে। প্রায় সমস্ত দার্শনিকের মতোই হেগেলও এই ভ্রান্তিটি পোষণ করেন।

এ ছাড়া আরো একদল দার্শনিক আছেন, যাঁরা বিশ্ব বিষয়ে কোনো জ্ঞানের সম্ভাবনা বা অন্তত পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের সম্ভাবনা অস্বীকার করেন। আধুনিকদের মধ্যে এই দলে

পড়েন হিউম এবং ক্যাণ্ট এবং তাঁরা দর্শনের বিকাশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এই মতের খণ্ডনে চূড়ান্ত কথাটা ভাববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে যতটা সম্ভব তা হেগেল ইতিপূর্বেই বলে গেছেন। ফয়েরবাখ-সংযোজিত বস্তুবাদী আপত্তিগুলিতে গভীরতার চেয়ে চাতুর্য বেশি। অন্যান্য দার্শনিক উদ্ভটত্বের মতই এ-কথারও চূড়ান্ত খণ্ডন হল প্রয়োগ, অর্থাৎ পরীক্ষা ও শিল্প। আমরা যদি কোন এক প্রাকৃতিক ঘটনা নিজেরাই ঘটাতে পারি, তার সমস্ত শর্ত পূরণ করে তাকে সম্ভব করে তুলতে পারি এবং তার উপরে তাকে আমাদের কাজে লাগাতে পারি, তাহলে সে ঘটনা বিষয়ে আমাদের ধারণার যাথার্থ্য প্রমাণ হবে ও তার ফলে ক্যাণ্টের অজ্ঞেয় 'প্রকৃত-বস্তুর' (thing-in-itself) অবসান ঘটবে। যতদিন না জৈব রসায়ন একের পর এক উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের রাসায়নিক বস্তুগুলি উৎপাদন করতে শুরু করে ততদিন পর্যন্ত এগুলিও ছিল ওই জাতীয় 'প্রকৃত-বস্তু'; 'প্রকৃত-বস্তুটি' তখন আমাদের বস্তুতে পরিণত হল, যেমন হয়েছে অ্যালিজারিন অর্থাৎ ম্যাডারের রং বস্তুটি — এখন আমরা ক্ষেতে চাষ করা ম্যাডারের শিকড় থেকে তা নিষ্কাশন করি না, অনেক সহজে আর সস্তায় তা উৎপাদন করি আলকাতরা থেকে। তিনশো বছর ধরে কোপের্নিকাস্ বর্ণিত সৌর প্রণালী ছিল একটি প্রকল্প, সেটা খুব সম্ভবপর হলেও তবুও শেষ পর্যন্ত প্রকল্প মাত্রই। কিন্তু যখন লেভেরিয়ে এই প্রণালীর তথ্য অনুসারে শুধু যে একটি অজ্ঞাত গ্রহের অস্তিত্বের প্রয়োজন অনুমান করলেন তাই নয়, এমনকি সেই গ্রহ আকাশের কোথায় থাকতে বাধ্য তাও হিসেব করে ঠিক করলেন, এবং যখন গাল্লে বাস্তবিকই সেই গ্রহকে খুঁজে বার করলেন,* তখন কোপের্নিকাসের প্রণালী প্রমাণিত হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি জার্মানিতে নব্য-ক্যাণ্টপন্থীরা ক্যাণ্টের মতবাদ এবং ইংলণ্ডে অজ্ঞেয়তাবাদীরা হিউমের মতবাদ (যেখানে বস্তুত এ মতবাদ কখনো নিশ্চিহ্ন হয়নি) পুনরুজ্জীবিত করবার প্রচেষ্টা করেন, তাহলে বহুকাল আগেই উভয় মতটির তত্ত্বগত ও প্রয়োগগত খণ্ডন হয়ে যাবার পর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ হল পশ্চাদপসরণ মাত্র এবং কার্যক্ষেত্রে এ হল কেবল বস্তুবাদকে জগতের সামনে অস্বীকার করে গোপনে তা গ্রহণ করার এক লজ্জিত ধরন মাত্র।

কিন্তু দেকার্ত থেকে হেগেল এবং হব্‌স থেকে ফয়েরবাখ পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাল ধরে দার্শনিকেরা মোটেই বিশুদ্ধ মননের শক্তিতে পরিচালিত হননি, যদিও তাঁরা তাই মনে করেছেন। পক্ষান্তরে, যা তাঁদের প্রকৃতপক্ষে সবচেয়ে বেশি ঠেলে এগিয়ে দিয়েছে তা হল প্রকৃতিবিজ্ঞান এবং শিল্পের দ্রুত অগ্রগতির জোয়ার। বস্তুবাদীদের বেলায় সেটা এমনিতেই পরিষ্কার। কিন্তু ভাববাদী দার্শনিকদের তন্ত্রগুলিও ক্রমবর্ধমানভাবে বস্তুবাদী আধেয় দিয়ে নিজেদের পূর্ণ করতে লাগল এবং সর্বভূতেশ্বরবাদ (pantheism)

* উল্লিখিত গ্রহটির নাম 'নেপ্‌চুন', ১৮৪৬ সালে বার্লিন মানমন্দিরের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইয়োহান গাল্লে তা আবিষ্কার করেন। — সম্পাঃ

ধরনে আত্মা ও পদার্থের বিরোধ সমন্বয়ের প্রয়াস করল। এইভাবে শেষ পর্যন্ত হেগেলীয় দর্শনতন্ত্র হল পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে ভাববাদী ভঙ্গিতে উল্টো করে দাঁড় করানো বস্তুবাদ।

অতএব বুঝতে পারা যায় স্তার্কে কেন ফয়েরবাখের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় প্রসঙ্গে প্রথমেই চিন্তা ও সত্তার সম্পর্ক সংক্রান্ত এই মৌলিক সমস্যাটির প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কী তাই অনুসন্ধান করেছেন। একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় পূর্ববর্তী দার্শনিকদের, বিশেষত ক্যান্ট-পরবর্তী দার্শনিকদের কথা অনাবশ্যক গুরুগম্ভীর দার্শনিক ভাষায় আলোচনার পর এবং হেগেলের রচনার কয়েকটি অনুচ্ছেদের প্রতি অতিরিক্ত রকমের ফর্মালিস্ট মনোযোগ অর্পণ করে তাঁর প্রকৃত প্রাপ্য না দিয়ে ফয়েরবাখের প্রাসঙ্গিক সব রচনা-পারম্পর্যে প্রতিফলিত তাঁর 'অধিবিদ্যার' ক্রমবিকাশ খুঁটিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এ বর্ণনা সযত্নে ও প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যাত, কেবল সমগ্র গ্রন্থের মতোই তা দার্শনিক পরিভাষায় কণ্টকিত, যা সর্বত্র অপরিহার্য নয়। এই পরিভাষা আরো বিরক্তিকর লাগে এই কারণে যে, লেখক কোনো একটি দার্শনিক সম্প্রদায়ের এমনকি ফয়েরবাখেরও বাগধারা অনুসরণ করে যাননি, অতি বিভিন্ন সব ধারার বিশেষত আজকাল দর্শনমন্য যেসব ধারার বহুল প্রচলন, সেগুলির পরিভাষা তার মধ্যে গুঁজে দিয়েছেন।

যদিও অবশ্য ফয়েরবাখ কখনো ঠিক গোঁড়া হেগেলপন্থী ছিলেন না, তবু তাঁর বিবর্তনধারা হল জনৈক হেগেলপন্থীর বস্তুবাদীতে পরিণতির বিবর্তন। এই বিকাশের কোনো এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে তাঁর পূর্বসূরির ভাববাদী দর্শন-তন্ত্রের সঙ্গে পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ প্রয়োজন হয়। শেষপর্যন্ত অনিবার্যভাবেই তাঁর উপলব্ধি হয় যে, হেগেলীয় 'পরম ভাবসত্তার' প্রাক-বিশ্ব অস্তিত্ব, বিশ্বের অস্তিত্বের আগেই 'যৌক্তিক বর্গসমূহের পূর্বস্থিতি' আসলে বিশ্ববহির্ভূত এক স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসের আজগুবি জের ছাড়া আর কিছুই নয়, আমরা যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভৌতিক জগতের অন্তর্গত সেটাই একমাত্র সত্য, এবং আমাদের চেতনা ও চিন্তা যতই অতীন্দ্রিয় বলে প্রতীত হোক না কেন তা একটি পদার্থময় দেহাঙ্গ মস্তিষ্কের সৃষ্টি। চৈতন্য থেকে পদার্থ উৎপন্ন নয়, বরং চৈতন্য হল পদার্থের সর্বোচ্চ সৃষ্টি। নিঃসন্দেহেই এ কথা হল বিশুদ্ধ বস্তুবাদ। কিন্তু এই পর্যন্ত অগ্রসর হয়েই ফয়েরবাখ হঠাৎ থেমে যান। তিনি প্রচলিত দার্শনিক সংস্কার উত্তীর্ণ হতে পারেন না, যদিও সে সংস্কার জিনিসটার বিরুদ্ধে নয়, 'বস্তুবাদ' নামটির বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, 'আমার কাছে বস্তুবাদ হল মানবিক সত্তা ও জ্ঞানরূপী ইমারৎটির ভিত্তি; কিন্তু শারীরবৃত্তবিদ, সংকীর্ণ অর্থে প্রকৃতিবিজ্ঞানীর কাছে, যেমন মলেশৎ-এর কাছে বস্তুবাদ যা আমার কাছে তা নয় — তাদের পেশা ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে ঐ ইমারৎটাই হল বস্তুবাদ। বস্তুবাদীদের সঙ্গে পেছনের দিকে আমি সম্পূর্ণ একমত, কিন্তু সামনের দিকে নয়।'

পদার্থ ও চৈতন্যের সম্পর্ক বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট ধারণার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সাধারণ বিশ্ববীক্ষা রূপে বস্তুবাদ এবং ইতিহাসের কোন এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে যথা অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই বিশ্ববীক্ষা যে বিশিষ্ট রূপে প্রকাশিত হয়েছিল, এই দুটি জিনিসকে এখানে ফয়েরবাখ গুলিয়ে ফেলেছেন। শুধু তাই নয়, আজও প্রকৃতিবিজ্ঞানী এবং শারীরবৃত্তবিদদের মাথায় অষ্টাদশ শতাব্দীর বস্তুবাদটি যে অগভীর ও স্থূল রূপে বিরাজমান, এবং পঞ্চাশের দশকে ব্যুখনার, ফগ্‌ত ও মলেশৎ তাঁদের সফরকালে তার যে রূপটি প্রচার করেছেন, ফয়েরবাখ সেটাকেও এর সঙ্গে তাল পাকিয়েছেন। কিন্তু ভাববাদ যেমন পরপর নানা স্তরের মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয়েছে বস্তুবাদও তাই। এমনকি প্রকৃতিবিজ্ঞানের প্রতিটি যুগান্তকারী আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তারও রূপ বদল করতে হয়েছে। এবং ইতিহাসের উপরও বস্তুবাদ প্রযুক্ত হবার পর এখানেও তার বিকাশের একটি নূতন পথ উন্মোচিত হয়েছে।

গত শতাব্দীর* বস্তুবাদ ছিল প্রধানতই যান্ত্রিক, কেননা সে সময়ে প্রকৃতিবিজ্ঞানের মধ্যে শুধুমাত্র বলবিজ্ঞান একটা নির্দিষ্ট উপসংহারে পেণছেছে, তাও আবার সে হল শুধুমাত্র কঠিন (পার্থিব ও নভোচারী) বস্তুর বলবিজ্ঞান, অর্থাৎ সংক্ষেপে অভিকর্ষের বলবিজ্ঞান। রসায়ন তখন নেহাতই তার শৈশবে, ফ্লজিস্টন তত্ত্বের পর্যায়ে**। জীববিজ্ঞানের তখনো কাঁথামোড়া নবজাতকের মতো অবস্থা: উদ্ভিদ ও প্রাণীজীব-সত্তা নিয়ে স্থূল ধরনে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং শুধুমাত্র যান্ত্রিক কারণের সাহায্যে সেগুলির ব্যাখ্যা হচ্ছে। দেকার্তের কাছে জীবজন্তু যা, অষ্টাদশ শতাব্দীর বস্তুবাদীদের কাছে মানুষও তাই, যন্ত্রমাত্র। চিরায়ত ফরাসী বস্তুবাদের প্রথম বিশিষ্ট এবং সেকালের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী ত্রুটি হল রাসায়নিক ও জৈব প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বলবিদ্যার মাপকাঠি প্রয়োগ — এই সব প্রক্রিয়ায় অবশ্য বলবিদ্যার নিয়মাবলীও বৈধ, কিন্তু তা অন্য উন্নততর নিয়মের চাপে পিছনে হটে গিয়েছে।

এই বস্তুবাদের দ্বিতীয় বিশিষ্ট সীমাবদ্ধতা হল, বিশ্বকে একটা প্রক্রিয়া হিসাবে, অবিচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক বিকাশের মধ্য দিয়ে যাওয়া পদার্থ হিসাবে উপলব্ধির অক্ষমতা। এই অক্ষমতার সঙ্গে সে সময়কার প্রকৃতিবিজ্ঞানের মাত্রা ও তৎসংযুক্ত অধিবিদ্যামূলক অর্থাৎ দ্বন্দ্বতত্ত্ব-বিরোধী দার্শনিকতার সঙ্গতি ছিল। এটুকু জানা ছিল যে, প্রকৃতি অন্তত

* অষ্টাদশ শতাব্দী। — সম্পাঃ

** অষ্টাদশ শতকে রসায়ন ক্ষেত্রের প্রচলিত মতবাদ অনুসারে দাহ্য বস্তুর দেহে ফ্লজিস্টন নামক বিশেষ এক বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করা হত, যা নাকি দহন ক্রিয়ার সময় বস্তুর দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। এ তত্ত্বের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করেন বিখ্যাত ফরাসী রাসায়নিক আ. ল. লাভুয়াজিয়ে, ইনি সঠিক ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে, দহন ক্রিয়া হল দাহ্য বস্তুটির সঙ্গে অক্সিজেন সংযোজনের প্রতিক্রিয়া। — সম্পাঃ

গতিময়। কিন্তু তখনকার ধারণা অনুসারে এই গতি অনন্তকাল ঘটে চলেছে একই বৃত্তে এবং অতএব একই স্থানে আবদ্ধ, বারবার একই ফলাফল সৃষ্টি করছে। এই ধারণা তখন অনিবার্য ছিল। সৌরজগতের উদ্ভব বিষয়ে ক্যান্টের মতবাদ তখন সবেমাত্র প্রস্তাবিত হয়েছে এবং তখনো মতবাদটি শুধুমাত্র কৌতুকাবহ। পৃথিবীর বিকাশের ইতিহাস বা ভূতত্ত্ব তখনো একান্তভাবেই অজ্ঞাত এবং সে সময়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এ ধারণা হাজির করাই সম্ভব হয়নি যে, আজকের দিনের জীবন্ত প্রাণীগুলি সরল থেকে জটিলে বিবর্তনের এক সুদীর্ঘ ধারার পরিণাম। অতএব প্রকৃতি সংক্রান্ত অনৈতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি অনিবার্য ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিকদের এ নিয়ে দোষারোপ করা এই কারণে আরো অসঙ্গত হবে যে, হেগেলের মধ্যেও একই ব্যাপার দেখা যায়। তাঁর মতে ভাবসত্তার মাত্র 'অন্যীভবন' হিসাবে প্রকৃতির কোন কালগত বিকাশ সম্ভব নয়; তার শুধুমাত্র দেশগত (space) বৈচিত্র্য প্রসারিত হতে পারে, অতএব তার মধ্যে বিধৃত বিকাশের সমস্ত স্তর তা একই সময়ে এবং পাশাপাশি উদ্ঘাটিত করে দেয় এবং একই প্রক্রিয়ার অনন্ত পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য। দেশগত, কিন্তু কালবহির্ভূত - অথচ সেটা হল যে-কোনো বিকাশের মূল সর্ত — বিকাশের এই আজগুবি ধারণাটা হেগেল প্রকৃতির উপর আরোপ করেন ঠিক এমন এক সময়ে যখন কিনা ভূতত্ত্ব, ভ্রূণতত্ত্ব, উদ্ভিদ ও জীবের শারীরবৃত্ত এবং জৈব রসায়ন যথেষ্ট বিকশিত হয়েছে এবং যখন এই নতুন বিজ্ঞানগুলির ভিত্তিতে সর্বত্রই বিবর্তনের ভবিষ্যৎ তত্ত্বের উজ্জ্বল পূর্বাভাস দেখা দিচ্ছে (যথা গ্যেটে এবং লামার্ক)। কিন্তু এটা তাঁর দর্শনতন্ত্রের জন্য দরকার; অতএব সেই দর্শনতন্ত্রের খাতিরে তাঁর পদ্ধতির কপটতা প্রয়োজন।

ইতিহাসের ক্ষেত্রেও একই অনৈতিহাসিক ধারণা প্রচলিত ছিল। সেখানে মধ্য যুগের জেরের সঙ্গে সংগ্রামে দৃষ্টি আবিল হয়েছিল। মধ্য যুগকে ধরা হত যেন হাজার বছরের সর্বাত্মক বর্বরতা দিয়ে ইতিহাসের একটা ছেদ। মধ্য যুগে ঘটা বিরাট অগ্রগতি — ইউরোপীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্র বিস্তার, পাশাপাশি মহান প্রাণবান জাতিগুলির উদ্ভব এবং সর্বোপরি চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর বিরাট টেকনিকাল অগ্রগতি, এসব কিছুই লক্ষ্য করা হত না। এই ভাবে ইতিহাসের বিরাট অন্তর্সম্পর্ক প্রসঙ্গে একটা যুক্তিসিদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি অসম্ভব হয়েছিল এবং ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল বড়ো জোর যেন দার্শনিকদের কাজে লাগবার মত দৃষ্টান্ত ও উদাহরণের সংকলন।

পঞ্চাশের দশকের জার্মানিতে যে বিকৃতিকারকেরা বস্তুবাদ-ফেরিওয়ালাদের ভূমিকা নিতেন, তাঁরা তাঁদের গুরুদেবদের এই সংকীর্ণতা কোনমতেই উত্তীর্ণ হতে পারেননি। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের যা কিছু অগ্রগতি হয়েছিল তাঁদের কাছে সেগুলি তাঁদের কাজে লাগত কেবল জগৎস্রষ্টার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে নতুন প্রমাণ হিসাবে। বস্তুত, মতবাদটিকে উন্নততর করার কাজে তাঁদের কোনই আগ্রহ ছিল না। যদিও ভাববাদের ক্ষমতা শেষ

সীমায় পৌঁছেছিল এবং ১৮৪৮-এর বিপ্লব তার উপর মৃত্যুবাণ হানল, তবুও তার এটুকু সান্ত্বনা ছিল যে, বস্তুবাদের পতন ঘটেছে তখন আরো নিচে। এ জাতীয় বস্তুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করে ফয়েরবাখ নিঃসন্দেহেই ঠিক কাজ করেছিলেন; তবে এই ভ্রাম্যমাণ প্রচারকদের মতবাদকে সাধারণভাবে বস্তুবাদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা তাঁর পক্ষে উচিত হয়নি।

এখানে কিন্তু দুটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। প্রথমত, ফয়েরবাখের জীবদ্দশাতে প্রকৃতি-বিজ্ঞানে প্রচণ্ড আলোড়নের অবস্থা চলেছে, মাত্র গত পনেরো বছরেই তা একটা বোধবিধায়ক, আপেক্ষিক উপসংহারে উপনীত হয়েছে। তখন আগের তুলনায় অভাবনীয় পরিমাণ নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে; কিন্তু সেগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং তারই সাহায্যে একের পর এক ঘটে চলা আবিষ্কারগুলির বিশৃংখলায় শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা কেবলমাত্র সাম্প্রতিক কালেই সম্ভব হয়েছে। এ কথা সত্য যে, ফয়েরবাখের জীবদ্দশাতেই তিনটি চূড়ান্ত আবিষ্কার ঘটেছিল — জীবকোষ, শক্তির রূপান্তর এবং ডারউইনের নামাঙ্কিত বিবর্তনের তত্ত্ব আবিষ্কার। কিন্তু তখন পর্যন্ত স্বয়ং প্রকৃতিবিজ্ঞানীরাই যেসব আবিষ্কার নিয়ে হয় বিতর্ক করছেন, নয় তার পর্যাপ্ত ব্যবহার কী ভাবে হতে পারে তা বুঝতে পারছেন না, সেসব আবিষ্কারের পূর্ণমূল্য উপলব্ধি করতে হলে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি যে পরিমাণ অনুসরণ করতে হয় তা গ্রামাঞ্চলের নির্জনে নিঃসঙ্গ দার্শনিকটির পক্ষে কী ভাবে সম্ভব হতে পারে? জার্মানির দুরবস্থাই এর জন্য দায়ী; তারই ফলে একলেকটিক উর্ণাজাল বিস্তারকারীরাই দর্শন-অধ্যাপনার প্রধানপদগুলি দখল করে রেখেছিলেন, অথচ তাঁদের চেয়ে ঢের বড় হলেও ফয়েরবাখকে একটি ছোট্ট পল্লীতে বসে গ্রাম্য ও নীরস হয়ে উঠতে হয়েছিল। অতএব এখন প্রকৃতি বিষয়ে যে ঐতিহাসিক বোধ সম্ভব হয়েছে এবং যার সাহায্যে ফরাসী বস্তুবাদের সমস্ত একপেশেমি দূর করা যায়, তা যে ফয়েরবাখের পক্ষে অনধিগম্য ছিল সেটা তাঁর দোষ নয়।

দ্বিতীয়ত, ফয়েরবাখ সম্পূর্ণ সঠিকভাবেই বলেছেন যে, নিছক প্রকৃতিবিজ্ঞানমূলক বস্তুবাদই 'মানবিক জ্ঞানরূপী ইমারৎটি নয়, সে ইমারতের ভিত্তিমাত্র', কেননা, আমাদের জীবন চলে শুধুমাত্র প্রকৃতিতেই নয়, মানবসমাজেও এবং প্রকৃতির মতো তারও বিকাশের ইতিহাস আছে, বিজ্ঞান আছে। অতএব প্রশ্ন ছিল সমাজের বিজ্ঞানের সঙ্গে, অর্থাৎ তথাকথিত ঐতিহাসিক ও দার্শনিক বিজ্ঞানগুলির যোগফলের সঙ্গে বস্তুবাদী ভিত্তির সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করা এবং এই ভিত্তির উপর এই বিজ্ঞানের পুনর্গঠন করা। কিন্তু ফয়েরবাখের পক্ষে এই কাজ সম্পাদনের ভাগ্য হয়নি। এই 'ভিত্তিটি' সত্ত্বেও তিনি সাবেকী ভাববাদের বন্ধনে আবদ্ধ রইলেন, যে কথা তিনি এই বলে স্বীকার করেছেন যে, 'বস্তুবাদীদের সঙ্গে পেছনের দিকে আমি সম্পূর্ণ একমত, কিন্তু সামনের দিকে নয়!'

কিন্তু এক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে স্বয়ং ফয়েরবাখই 'সামনের দিকে' অগ্রসর হননি, ১৮৪০ বা ১৮৪৪-এ তাঁর যে মতবাদ ছিল তা ছাড়িয়ে এগোননি। এবং এরও কারণ আবার প্রধানতই তাঁর নিঃসঙ্গ জীবন, যার ফলে সামাজিক মেলামেশার ব্যাপারে দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে আগ্রহশীল হয়েও তিনি বাধ্য হয়েছিলেন অন্যান্য সমতুল্য ব্যক্তিদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ও প্রতিবাদী আদানপ্রদানের বদলে শুধুমাত্র নিজের নিঃসঙ্গ মাথা থেকেই চিন্তা উৎপাদন করতে। আমরা পরে বিশদে দেখব, এই ক্ষেত্রে তিনি কতখানি ভাববাদী হয়ে থেকেছেন।

এখানে শুধুমাত্র আরো এটুকু বলা দরকার যে, স্টার্কে ভুল জায়গায় ফয়েরবাখের ভাববাদ অনুসন্ধান করেছেন। 'ফয়েরবাখ ভাববাদী; তিনি মানব অগ্রগতিতে বিশ্বাসী' (পৃঃ ১৯)। 'সমগ্রের ভিত্তিটি, বনিয়াদটি তবুও ভাববাদী রয়ে গেছে। আমাদের কাছে বাস্তববাদ (realism) বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ মাত্র, আসলে আমরা আমাদের ভাববাদী ধারাই অনুসরণ করে যাই। করুণা, প্রেম, সত্যোৎসাহ এবং ন্যায়ানুসারণ কি ভাববাদী শক্তি নয়?' (পৃঃ VIII)।

প্রথমত, এখানে ভাববাদের অর্থ আদর্শ লক্ষ্যপ্রবণতা ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু সেগুলি বড় জোর ক্যাণ্টীয় ভাববাদ ও তার 'পরম নির্দেশের' (categorical imperative)* পক্ষে প্রাসঙ্গিক। কিন্তু স্বয়ং ক্যাণ্ট তাঁর দর্শনকে 'তুরীয় ভাববাদ' আখ্যা দিয়েছিলেন — তার কারণ মোটেই এই নয় যে, তিনি এ দর্শনে নৈতিক আদর্শেরও আলোচনা করেছেন। স্টার্কের নিশ্চয়ই মনে পড়বে, তার কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। নৈতিক অর্থাৎ সামাজিক আদর্শে বিশ্বাস হল দার্শনিক ভাববাদের সারমর্ম, এই কুসংস্কারের উৎস দর্শনের বাইরে, জার্মান কূপমণ্ডূকদের মধ্যে, যাঁরা কিনা তাঁদের প্রয়োজনীয় দার্শনিক জ্ঞান মুখস্থ করে রেখেছেন শিলারের পদ্য থেকে। ক্যাণ্টের অক্ষম 'পরম নির্দেশকে' (অক্ষম কেননা তার দাবিটা অসম্ভব এবং অসম্ভব বলেই তা কখনো এতটুকু বাস্তব হয় না) পরিপূর্ণ ভাববাদী হেগেলের চেয়ে বেশী কঠোর সমালোচনা আর কেউ করেননি, অবাস্তব আদর্শ নিয়ে কূপমণ্ডূকসুলভ ভাবালু যে উৎসাহ শিলার মারফত পরিবেশিত হয়েছে, তাকে অমন নিষ্ঠুরভাবে উপহাস আর কেউ করেননি (দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর *Phenomenology* দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয়ত, এ কথা অস্বীকার করবার কোনই উপায় নেই যে, মানুষকে যা কর্মে চালিত করে তা সবই আসে তার মস্তিষ্কের মাধ্যমেই, আহার ও পানের ক্ষেত্রেও, যেটা শুরু হয় মস্তিষ্কের মাধ্যমে সঞ্চারিত ক্ষুধাতৃষ্ণা বোধের ফল হিসাবে এবং শেষ হয় একইভাবে মস্তিষ্কের মাধ্যমে সঞ্চারিত তৃপ্তি বোধের ফল হিসাবে। মানুষের উপর

* 'পরম নির্দেশ' — ক্যাণ্টের ভাববাদী নীতিবিদ্যা অনুসারে নৈতিক কর্তব্যের একটা প্রত্যয়। 'পরম নির্দেশে' নৈতিক আচরণের সূত্র দেওয়া হয় ইতিহাস ও শ্রেণীর ঊর্ধ্বে, যা ঠিক নয়। — সম্পাঃ

বহির্জগতের প্রভাব অভিব্যক্ত হয় তার মস্তিষ্কেই, অনুভূতি, চিন্তা, প্রবৃত্তি, ইচ্ছা রূপে সেখানে প্রতিফলিত হয়, সংক্ষেপে, প্রতিফলিত হয় 'আদর্শ প্রবণতার' রূপে, এবং এই রূপেই তা 'আদর্শ শক্তিতে' পরিণত হয়। অতএব কেউ 'আদর্শ প্রবণতার' অনুগামী বলেই এবং 'আদর্শ শক্তি' তার উপর প্রভাবশীল, এ কথা স্বীকার করলেই যদি সে ভাববাদী বলে প্রতিপন্ন হয়, তাহলে যে-কোন স্বাভাবিক ব্যক্তিই তো জন্ম-ভাববাদী হবেন এবং সে ক্ষেত্রে আদৌ কোন বস্তুবাদী কি সম্ভব হতে পারে?

তৃতীয়ত, মানবতা — অন্তত বর্তমানে — মোটের উপর প্রগতির অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে, এই বিশ্বাসের সঙ্গে বস্তুবাদ-বনাম-ভাববাদের সংঘর্ষের কোন সম্পর্ক নেই। ডিইস্ট* ভলটেয়ার এবং রুসোর মতো ফরাসী বস্তুবাদীরাও সমানে এই বিশ্বাস পোষণ করতেন প্রায় একটা উগ্রান্ধ মাত্রায় এবং সে জন্য অনেক সময়েই ব্যক্তিগতভাবে মহান স্বার্থত্যাগও করেছেন। যেমন, যদি কেউ ভাল অর্থে 'সত্যোৎসাহ ও ন্যায়ানুসরণে' সমগ্র জীবন উৎসর্গ করে থাকেন তাহলে তিনি দিদরোই। অতএব স্তার্কে যদি এ সমস্তকেই ভাববাদ বলে ঘোষণা করেন তাহলে শুধু প্রমাণ হবে যে, 'বস্তুবাদ' শব্দটি এবং উভয় চিন্তাধারার মধ্যে সমস্ত বিরোধটির এখানে সমস্ত তাৎপর্য তাঁর কাছে লুপ্ত হয়ে গেছে।

আসল কথা হল বস্তুবাদ শব্দটির বিরুদ্ধে পুরোহিতদের সুদীর্ঘকালব্যাপী কটূক্তির ফলে এর বিরুদ্ধে যে সাবেকী ফিলিস্টাইন সংস্কার সৃষ্টি হয়েছে, স্তার্কে এখানে — যদিও হয়ত অচেতনভাবেই — সেই সংস্কারের প্রতি মার্জনাহীন আনুকূল্য প্রকাশ করেছেন। বস্তুবাদ শব্দ বলতে ফিলিস্টাইন বোঝে ভোজনবিলাস, মাতলামি, অহমিকা, দেহকাম, ঔদ্ধত্য, লোভ, কৃপণতা, লালসা, মুনাফা শিকার এবং ফাটকাবাজি জোচ্চুরি, সংক্ষেপে, সেই সমস্ত নোংরা কদভ্যাস যা সে নিজে আচরণ করে গোপনে। ভাববাদ বলতে সে বোঝে সদাচার, সমস্ত মানবসমাজের প্রতি প্রেম এবং সাধারণভাবে এক 'উন্নততর পৃথিবীতে' বিশ্বাস, যা নিয়ে সে অপরের কাছে বড়াই করে বটে, কিন্তু নিজে তাতে বিশ্বাস রাখে বড়জোর তখন, যখন অত্যধিক মদ্যপানের পর সকালে মাথা ধরেছে অথবা দেউলে হতে হয়েছে — এক কথায়, তার নিত্য 'বস্তুবাদী' আতিশয্যের ফল ভোগ হবার পর। সেই সময়েই সে তার প্রিয় গানটি ধরে: মানুষ কে? অর্ধ-পশু, অর্ধ-দেবশিশু।

---

* ডিইস্ট — এক ধরনের ধর্মীয়-দার্শনিক মতবাদের অনুগামী, এ'রা বিশ্বের নির্ব্যক্তিক, চিন্ময়, আদি প্রেরণা রূপে ইশ্বরকে মানেন, কিন্তু প্রকৃতি ও সমাজজীবনে সে ঈশ্বর কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করেন বলে তাঁরা মানেন না। সামন্ত-গির্জা বিশ্ববীক্ষার আধিপত্যের পরিস্থিতিতে ডিইজম প্রায়ই একটা যুক্তিসিদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অগ্রসর হত, মধ্যযুগীয় ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্বদৃষ্টিকে সমালোচনা করত, পুরোহিত সম্প্রদায়ের পরগাছাবৃত্তি ও ভণ্ডামি উদ্ঘাটিত করত। তাহলেও একই সময়ে ধর্মের সঙ্গে আপোস করত ডিইস্টরা, একটা যুক্তিসিদ্ধ রূপে জনগণের জন্য ধর্ম বাঁচিয়ে রাখার পক্ষ নিত। — সম্পাঃ

এটুকু ছাড়া আর যা আছে তাতে আজ জার্মানিতে যেসব প্রগল্‌ভ উপ-অধ্যাপকেরা দার্শনিক নামে খ্যাত তাঁদের আক্রমণ ও মতবাদের বিরুদ্ধে ফয়েরবাখকে সমর্থন করবার উদ্দেশ্যে স্তার্কে বিশেষ আয়াস করেছেন। চিরায়ত জার্মান দর্শনের গর্ভস্রাবে যাঁদের উৎসাহ আছে তাঁদের কাছে এসব অবশ্যই মূল্যবান; স্তার্কের কাছে হয়ত এসব প্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল। আমরা কিন্তু পাঠকদের এথেকে নিষ্কৃতি দেব।

৩

ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র বিষয়ে ফয়েরবাখের দর্শন দেখলেই তাঁর আসল ভাববাদটি স্পষ্ট ধরা পড়ে। তিনি কোনো মতেই ধর্মের উচ্ছেদ চান না; তিনি ধর্মকে উন্নত করতে চান। ধর্মের মধ্যে দর্শনকেই বিলীন হতে হবে। 'মানব-ইতিহাসের বিভিন্ন যুগকে শুধুমাত্র ধর্মের পরিবর্তন দিয়েই পৃথক করতে হবে। মূল যখন থাকে মানবহৃদয়ে, শুধুমাত্র তখনই কোনো ঐতিহাসিক আন্দোলন গভীর ভিত্তি পায়। হৃদয় ধর্মের একটা আধার নয়, যাতে ধর্ম হৃদয়ের মধ্যেও থাকবে; হৃদয়ই ধর্মের সারার্থ।' (পৃঃ ১৬৮-এ স্তার্কে উদ্ধৃত করেছেন।) ফয়েরবাখের মতে, মানুষে মানুষে প্রীতিমূলক সম্পর্কই, হৃদয়ভিত্তিক সম্পর্কই হল ধর্ম; এতদিন পর্যন্ত এ সম্পর্ক বাস্তবের এক কাল্পনিক প্রতিবিম্বের মধ্যেই, মানবগুণের কাল্পনিক প্রতিবিম্বস্বরূপ এক বা বহু দেবতার মাধ্যমে তার সত্য অন্বেষণ করেছে; কিন্তু এখন প্রত্যক্ষভাবে এবং অপর কিছুর মাধ্যম ছাড়াই 'আমি' এবং 'তুমি'র মধ্যে প্রেমেই সে সত্য খুঁজে পেয়েছে। অতএব, শেষ পর্যন্ত ফয়েরবাখের কাছে এই নতুন ধর্মের সর্বোচ্চ যদিই বা না হয় তাহলেও অন্তত একটি উচ্চতম রূপ হল যৌন-প্রেম।

যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে মানুষ আছে ততদিন পর্যন্ত মানুষে মানুষে প্রীতির, বিশেষত স্ত্রী-পুরুষে প্রীতির সম্পর্ক বর্তমান। বিশেষত যৌন-প্রেমের গত আটশ' বছরের মধ্যে যে বিকাশ ঘটেছে ও যে স্থানে সে পৌঁছেছে তার ফলে এই যুগটায় সে প্রেম সমস্ত কাব্যের অনিবার্য কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে প্রবর্তিত ধর্মাবলী (positive religions) রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত-যৌন-প্রেমের অর্থাৎ বিবাহ বিধির উপর একটা উচ্চতর পবিত্রতা অর্পণ করার কাজেই সীমাবদ্ধ; এবং প্রেম ও বন্ধুত্বের আচরণে এতটুকু বদল না ঘটিয়েই আগামীকালই এ সব বিলুপ্ত হতে পারে। যেমন, ১৭৯৩—১৭৯৮ সালে ফ্রান্সে খ্রীষ্টধর্ম কার্যত এমন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছিল যে, এমনকি নেপোলিয়নও বিনা বাধাবিঘ্নে তা পুনঃপ্রচলিত করতে পারেননি। অথচ তার জন্য এই মধ্যবর্তী সময়টুকুতে ফয়েরবাখের অর্থে কোন বদলির প্রয়োজন অনুভূত হয়নি।

এখানে ফয়েরবাখের ভাববাদটা হল এই যে, যৌন-প্রেম, বন্ধুত্ব, করুণা, আত্মত্যাগ

প্রভৃতি পারস্পরিক আকর্ষণের উপর নির্ভরশীল সম্পর্কগুলিকে মাত্র তাদের যথার্থ সত্তায়, অর্থাৎ এমনকি তাঁর মতে পর্যন্ত যা কিনা অতীতের ব্যাপার, সেই ধর্মের স্মৃতির সঙ্গে সম্বন্ধহীনভাবে গ্রহণ করতে পারছেন না। তিনি দাবি করেন যে, শুধুমাত্র 'ধর্মের' নামে পবিত্রকরণ করা হলেই এই সম্পর্কগুলির পূর্ণমূল্য প্রতিষ্ঠিত হবে। তাঁর কাছে প্রধান কথা এই নয় যে, এই একান্ত মানবীয় সম্পর্কাবলীর অস্তিত্ব আছে; তার বদলে বড় কথা হল এগুলিকে নতুন ও প্রকৃত ধর্ম বলে বিবেচনা করতে হবে। ধর্মের একটা ছাপ মারবার পরই তিনি এগুলির মূল্য স্বীকার করবেন। **রিলিজিয়ন** শব্দটি এসেছে religare* ক্রিয়া থেকে এবং তার আদি-অর্থ হল **বন্ধন**। অতএব দুটি মানুষের মধ্যে যে-কোন বন্ধনই হল ধর্ম। এ জাতীয় ব্যুৎপত্তিগত কায়দাই ভাববাদী দর্শনের শেষ সম্বল। কথাটার আসল প্রয়োগেব ঐতিহাসিক বিবর্তনের মাধ্যমে কী বোঝাচ্ছে সেটা নয়, ব্যুৎপত্তির দিক থেকে শব্দটির পক্ষে কী বোঝানো উচিত এটাই যেন আসল কথা। অতএব যৌন-প্রেম ও নরনারীর মিলনকেই ধর্মের স্তরে উন্নীত করা হোক যাতে ভাববাদী স্মৃতির পক্ষে অমন প্রিয় একটা শব্দ — ধর্ম — ভাষা থেকে মুছে না যায়। চল্লিশের দশকে প্যারিসের লুই ব্লাঁ ধারার সংস্কারকেরা ঠিক একইভাবে কথা বলতেন। ধর্ম ছাড়া মানুষ বলতে তাঁরাও নেহাতই দানব বুঝতেন এবং আমাদের বলতেন 'Donc l'athéisme c'est votre religion।'** ফয়েরবাখ যদি প্রকৃতির মূলতঃ বস্তুবাদী ধারণার উপর প্রকৃত ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে চান, তবে সেটা হবে আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানকে খাঁটি এ্যাল্‌কেমি বলে বিবেচনা করারই সমান। ঈশ্বর ছাড়াও যদি ধর্ম সম্ভব হয় তাহলে পরশপাথর বাদ দিয়েও এ্যালকেমি হতে পারে। প্রসঙ্গত, ধর্ম এবং এ্যালকেমির মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। পরশপাথরের নানা ঐশী শক্তি আছে এবং কপ্প ও বের্তেলো-র তথ্যে প্রমাণ হয়েছে, খ্রীষ্টীয় মতবাদ গড়ে তোলায় প্রথম দুই শতাব্দীর মিশরীয়-গ্রীক এ্যালকেমিস্টদের হাত ছিল।

'মানব-ইতিহাসের বিভিন্ন যুগকে শুধুমাত্র ধর্মের পরিবর্তন দিয়েই পৃথক করতে হবে,' ফয়েরবাখের এই দাবি একান্তই ভ্রান্ত। আজ পর্যন্ত যে তিনটি বিশ্ব ধর্ম বর্তমান আছে, বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম এবং ইসলামধর্ম, শুধুমাত্র সেই তিনটির বেলায় বলা যায়, ধর্মমূলক পরিবর্তন বিরাট ঐতিহাসিক পরিবর্তনের **সহচর** ছিল। প্রাচীন উপজাতীয় ও জাতীয় ধর্ম — যেগুলির স্বতঃস্ফূর্ত উদয় হয়েছিল — সেগুলির চরিত্র প্রচারমূলক ছিল না এবং সেই সব উপজাতি ও জনগণের স্বাধীনতা লোপ পাবার মাত্র সেগুলি প্রতিরোধের সমস্ত শক্তি হারাল। ক্ষয়িষ্ণু রোমক সাম্রাজ্য ও সেখানে সদ্য গৃহীত, তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ খ্রীষ্টীয় বিশ্ব

* religare — বাঁধা। — সম্পাঃ

** তার মানে, নাস্তিকতাই আপনাদের ধর্ম। — সম্পাঃ

ধর্মের সঙ্গে সহজ সংযোগই জার্মানদের পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল। কমবেশি কৃত্রিমভাবে উত্থিত শুধুমাত্র এই বিশ্ব ধর্মগুলির ক্ষেত্রেই, বিশেষত খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলামধর্মের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি, ব্যাপকতর ঐতিহাসিক আন্দোলনের-উপর ধর্মের ছাপ পড়েছে। এমনকি খ্রীষ্টধর্মের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, প্রকৃতই বিশ্ব তাৎপর্যের বিপ্লবের ক্ষেত্রে ধর্মের ছাপটুকু ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বুর্জোয়ার মুক্তি সংগ্রামের শুধুমাত্র প্রথমাবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ; এবং তার প্রকৃত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় পূর্বেকার সমগ্র মধ্যযুগীয় ইতিহাসের মধ্যে, যেখানে কিনা ধর্ম ও ধর্মতত্ত্ব ছাড়া আর কোনো ধরনের ভাবাদর্শ ছিল না, ফয়েরবাখ যে মনে করেছিলেন, এর কারণ মানুষের হৃদয় ও ধর্মমূলক প্রয়োজনের মধ্যে, তা নয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে বুর্জোয়াও যখন আপন শ্রেণীসঙ্গত ভাবাদর্শ গড়ে তোলার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী হল তখন সে নিজের মহান ও চূড়ান্ত বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব সম্পন্ন করল শুধুমাত্র আইনগত ও রাজনৈতিক ধারণার কাছেই আবেদন জানিয়ে, ধর্ম নিয়ে তখন তার শুধু ততটুকুই মাথাব্যথা যতটুকু কিনা এই ধর্ম তার পথে বাধা হয়েছে। কিন্তু একথা সে কখনো ভাবেনি যে, পুরানো ধর্মের স্থানে একটি নতুন ধর্মের প্রবর্তন করতে হবে। এ জাতীয় প্রচেষ্টায় রবেসপিয়ের কী ভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন তা সকলের জানা আছে।*

যে সমাজে আমাদের বাস করতে হচ্ছে, যে সমাজ শ্রেণী-সংঘর্ষ ও শ্রেণী-শাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেখানে অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ মানবীয় ভাবাবেগের সম্ভাবনা আজকাল বহুলাংশেই হ্রাস পেয়েছে। এই ভাবাবেগগুলিকে ধর্ম হিসেবে গৌরবান্বিত করে আরো হ্রস্ব করার কারণ নেই। একইভাবে, বিশেষত জার্মানিতে প্রচলিত ইতিহাসতত্ত্ব বিরাট ঐতিহাসিক শ্রেণী-সংগ্রামকে যথেষ্ট অস্পষ্ট করেছে; অতএব এইসব সংগ্রামের ইতিহাসকে গীর্জা-ইতিহাসের লেজুড়ে পরিণত করে ঐ ইতিহাসবোধকে একেবারে অসম্ভব করে তোলার প্রয়োজনও আমাদের নেই। এ থেকেই স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, আজ আমরা ফয়েরবাখকে ছাড়িয়ে কতখানি অগ্রসর হয়েছি। তাঁর প্রেমমূলক নবধর্মের গৌরব-কীর্তনে নিবেদিত 'সর্বশ্রেষ্ঠ' রচনাংশও আজ একেবারে অপাঠ্য।

একমাত্র যে ধর্মকে ফয়েরবাখ গুরুত্বসহকারে বিচার করেছেন তা হল খ্রীষ্টধর্ম, একেশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্ত্যের বিশ্বধর্ম। তিনি প্রমাণ করেছেন, খ্রীষ্টীয় ঈশ্বর হল মানুষের অতিকল্পিত প্রতিবিম্ব, মুকুর চিত্র। এখন, এই ঈশ্বর কিন্তু স্বয়ং হলেন এক ক্লান্তিকর অমূর্তায়ন পদ্ধতির পরিণাম, অসংখ্য পুরাতন উপজাতীয় ও জাতীয় দেবতাদের ঘনীভূত সারনির্যাস। অতএব, এই ঈশ্বর যে মানুষের প্রতিবিম্ব

* 'সর্বোচ্চ প্রাণীর' ধর্ম প্রতিষ্ঠায় রবেসপিয়েরের প্রচেষ্টার কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

সেই মানুষও বাস্তব মানুষ নয়, তাও একইভাবে অসংখ্য বাস্তব মানুষের সারনির্যাস, অমূর্ত অর্থে মানুষ, অতএব নিজেও সে এক ভাবমূর্তি মাত্র। যে ফয়েরবাখ প্রতি পৃষ্ঠায় ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, প্রত্যক্ষ বাস্তব জগতে বিভোরতার প্রচার করেন, তিনি নিজেই মানুষে মানুষে মাত্র যৌন-সম্পর্কটুকু ছাড়া বাকি যে-কোনো সপর্কের কথাই তুলুন না কেন, সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণই অমূর্তপন্থী হয়ে যান।

সমস্ত সম্পর্কের মাত্র একটি দিকই তাঁকে আকৃষ্ট করে, তা হল নৈতিক দিক। এবং এইদিক থেকেও হেগেলের তুলনায় আমরা ফয়েরবাখের আশ্চর্য দারিদ্র্য দেখে স্তম্ভিত হই। হেগেলের নীতিশাস্ত্র বা নৈতিক আচরণের মতবাদ হল ন্যায়-দর্শন (philosophy of right) এবং তার অন্তর্গত হল: ১) বিমূর্ত অধিকার, ২) নৈতিকতা, ৩) সুনীতি (Sittlichkeit); আবার এই শেষটির অন্তর্গত হল : পরিবার, নাগরিক সমাজ এবং রাষ্ট্র। এখানে আধারটি যেমন ভাববাদী, আধেয়টি তেমনিই বাস্তববাদী। নৈতিকতা ছাড়াও আইন, অর্থনীতি ও রাজনীতির সমগ্র ক্ষেত্র এর অন্তর্গত। ফয়েরবাখের বেলায় ঠিক এর বিপরীত। আধারের দিক থেকে তিনি বাস্তববাদী, শুরু করছেন মানুষ থেকে, কিন্তু এ মানুষের বাস কোন্ জগতে তার কোনো উল্লেখ নেই, সুতরাং এ মানুষ সর্বদাই সেই বিমূর্ত মানুষই থেকে যাচ্ছে, যে আধিপত্য করেছে ধর্মের দর্শনে। এ মানুষকে কোন নারী জন্ম দেয়নি; যেন গুটি ভেঙে এ মানুষ বেরিয়ে এসেছে একেশ্বরবাদী ধর্মের ঈশ্বর থেকে। তাই সে ঐতিহাসিকভাবে উৎপন্ন এবং ইতিহাস নির্ধারিত কোনো বাস্তব জগতের বাসিন্দা নয়। অবশ্য অন্য মানুষের সঙ্গে তার আদানপ্রদান আছে সত্য, কিন্তু তাদের প্রত্যেকও আবার তারই মতন অমূর্ত মানুষ। ফয়েরবাখের ধর্ম সংক্রান্ত দর্শনে আমরা তবু নর ও নারী পেয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর নীতিশাস্ত্র থেকে এই শেষ পার্থক্যটুকুও মুছে গিয়েছে। অবশ্যই ফয়েরবাখ সুদীর্ঘ ব্যবধানের পর পর এ জাতীয় কথাও বলেছেন যে, 'প্রাসাদে ও কুটীরে মানুষের চিন্তা বিভিন্ন' — 'ক্ষুধা ও ক্লেশের ফলে যদি তোমার দেহে খোরাক কিছু না থাকে, তাহলে তোমার মস্তিষ্ক, মানস ও হৃদয়েও নৈতিকতার জন্যও কোনো খোরাক থাকবে না।' 'রাজনীতিই আমাদের ধর্ম হওয়া উচিত', ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু এ জাতীয় বচনের সাহায্যে ফয়েরবাখ একেবারে কিছুই লাভ করতে পারেননি, এগুলি নেহাতই বাক্য হয়ে থেকে যায় এবং এমনকি স্টার্কেকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে, ফয়েরবাখের কাছে রাজনীতি ছিল অলংঘনীয় সীমান্ত এবং 'সমাজ সংক্রান্ত বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, তাঁর কাছে ছিল terra incognita*'।

হেগেলের তুলনায় সু-কু বিচারেও তিনি সমান অগভীর বলে প্রতীয়মান হন। হেগেল বলেছেন, 'লোকের বিশ্বাস, "মানুষ স্বভাবতই ভালো," একথা বললে বুঝি

* অজ্ঞেয় প্রদেশ। — সম্পাঃ

একটা মস্ত কিছু বলা হয়। কিন্তু লোকে ভুলে যায়, এর চেয়ে ঢের বড় কথা হল, "মানুষ স্বভাবতই মন্দ"।' হেগেলের মতে, ঐতিহাসিক বিকাশের চালিকা শক্তি যে রূপে দেখা দেয় সেটা মন্দ। একথার দুটি অর্থ আছে। একদিকে বুঝতে হবে, প্রতিটি নতুন অগ্রগতি প্রতিভাত হয় পবিত্রের অপবিত্রকরণ হিসেবেই, যে অবস্থা পুরানো এবং পচা হলেও লোক-ব্যবহার দ্বারা পবিত্রিত তার বিরুদ্ধে বিপ্লব হিসেবে। এবং অপরপক্ষে শ্রেণী-সংঘর্ষ শুরু হবার পর থেকে মানুষের কু-প্রবৃত্তিগুলিই — লোভ ও ক্ষমতা-লালসা ঐতিহাসিক বিকাশের হাতল হিসেবে কাজ করেছে। সামন্ততন্ত্র এবং বুর্জোয়ার ইতিহাস তার একক একটানা প্রমাণ। কিন্তু নৈতিক কু'য়ের ঐতিহাসিক ভূমিকা অনুসন্ধান করার কথা ফয়েরবাখের মাথায় আসেনি। তাঁর কাছে ইতিহাস একেবারে এক ভুতুড়ে রাজ্য, যেখানে তিনি অস্বস্তি ভোগ করেন। 'মানুষ যখন প্রকৃতিতে প্রথম উদ্ভূত হল তখন সে নেহাতই প্রকৃতির জীব, মানুষ নয়; মানুষ হল মানুষেরই সৃষ্টি, সংস্কৃতির সৃষ্টি, ইতিহাসের সৃষ্টি,' — এমনকি তাঁর নিজের এই বাণীও তাঁর কাছে রয়ে গেল সম্পূর্ণ বন্ধ্যা।

অতএব নীতির ব্যাপারে ফয়েরবাখ আমাদের যা কিছু বলেছেন তা নেহাতই অকিঞ্চিৎকর। সুখানুসন্ধান মানুষের মধ্যে সহজাত, অতএব সমস্ত নৈতিকতার তা ভিত্তি হতে বাধ্য। কিন্তু এই সুখানুসন্ধান দ্বিবিধ সংশোধনসাপেক্ষ। প্রথমত, আমাদের কাজের স্বাভাবিক পরিণাম দ্বারাই: পানাধিক্যের পর মাথা ধরে এবং ক্রমাগত বাড়াবাড়ির পর রোগ হয়। দ্বিতীয়ত, তার সামাজিক পরিণাম দ্বারা: আমরা যদি অপরের সমজাতীয় সুখাকাঙ্ক্ষাকে মর্যাদা না দিই তাহলে তারা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করবে, এবং অতএব আমাদের সুখাকাঙ্ক্ষার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। ফলে, আমাদের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে হলে আমাদের আচরণের পরিণাম ঠিকমতো বিচার করতে পারা চাই এবং অপরকেও সমানভাবেই সুখাকাঙ্ক্ষার অধিকার দিতে আমরা বাধ্য। নিজেদের সম্বন্ধে যুক্তিসিদ্ধ আত্মসংযম এবং অপরের প্রতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রেম — বারবার এই প্রেম! ফয়েরবাখের নৈতিকতার এই দুটিই হল মৌলিক নিয়ম; অন্যান্য সমস্ত নিয়মই এদুটির অনুসিদ্ধান্ত। এবং এ কয়েকটি কথার শূন্যতা ও স্থূলতা ফয়েরবাখের চতুরতম যুক্তি বা স্তার্কের সবচেয়ে জোরালো স্তুতিও ঢাকা দিতে পারে না।

শুধুমাত্র নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থেকে মানুষ তার সুখাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে পারে নেহাতই ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে, এবং তাতে লাভ না তার, না অপরের। বরং তার দরকার বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক, তার প্রয়োজন মেটাবার উপায়গুলি, অর্থাৎ খাদ্য, বিরুদ্ধ লিঙ্গের ব্যক্তি, বই, আলাপ, তর্কবিতর্ক, কাজকর্ম এবং ব্যবহার করা ও বানিয়ে তোলার মতো বস্তু। ফয়েরবাখের নৈতিকতায় হয় ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, চরিতার্থতার এই উপকরণ এবং বস্তুগুলি প্রত্যেকেরই নিঃসন্দেহেই আছে, আর না হয় এতে এক

অকেজো সদুপদেশই দেওয়া হচ্ছে মাত্র, অতএব যারা এই উপকরণগুলি থেকে বঞ্চিত তাদের কাছে এর কানাকড়িও মূল্য নেই। আর সেকথা ফয়েরবাখ নিজেই স্পষ্টভাবে বলেছেন: 'প্রাসাদে ও কুটীরে মানুষের চিন্তা বিভিন্ন। ক্ষুধা ও ক্লেশের ফলে যদি তোমার দেহে খোরাক কিছু না থাকে, তাহলে তোমার মস্তিষ্ক, মানস ও হৃদয়েও নৈতিকতার জন্য কোনো খোরাক থাকবে না।'

অপরের সুখাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার সমান অধিকার প্রসঙ্গেও কি ব্যাপারটা বেশি ভালো দাঁড়ায়? দাবিটিকে ফয়েরবাখ এক পরম দাবি হিসেবে পেশ করেছেন, যা সর্বকালে এবং সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য। কিন্তু কবে থেকে এ দাবি স্বীকৃত হয়েছে? প্রাচীনকালে দাস ও প্রভুর মধ্যে, কিংবা মধ্য যুগে ভূমিদাস ও ব্যারনের মধ্যে কোনকালেই কি সুখাকাঙ্ক্ষায় সমান অধিকারের কোন কথা ছিল? শাসক-শ্রেণীর সুখাকাঙ্ক্ষার কাছে নিপীড়িত শ্রেণীর এই আকাঙ্ক্ষা কি নির্মমভাবে এবং 'আইন বলে' বলি দেওয়া হয়নি? হ্যাঁ, সেটা অবশ্য দুর্নীতিই ছিল; কিন্তু আজকাল সমানাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। যখন থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে সংগ্রামে ও পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিকাশের খাতিরে সামাজিক বর্গের সমস্ত বিশেষ অধিকার অর্থাৎ ব্যক্তিগত বিশেষ অধিকার বিলোপ করতে এবং আইনের সামনে, প্রথমত ব্যক্তিগত আইন এবং তারপর ক্রমশ রাষ্ট্রীয় আইনের সামনে সকলের সাম্য প্রবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে, তখন থেকে নেহাতই কথার কথা হিসেবে ঐ সমানাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু এই ভাবাদর্শগত অধিকারকে অবলম্বন করে সুখাকাঙ্ক্ষা বাঁচতে পারে খুবই কম। বৈষয়িক উপকরণ অবলম্বন করলেই সে বাঁচে সবচেয়ে বেশি; এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিতে সযত্নে এই ব্যবস্থাই করা হয়, যাতে এই সমানাধিকারীদের মধ্যে বিপুল সংখ্যাগুরুর দল নিছক বাঁচবার পক্ষে যতটুকু অপরিহার্য শুধু ততটুকুই পায়। অতএব দাসপ্রথা বা ভূমিদাসপ্রথায় সংখ্যাগুরুর পক্ষে সুখাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার সমান অধিকার যেটুকু ছিল, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় তার চেয়ে আদৌ বেশি হলে নেহাৎ তা যৎসামান্য বেশি মাত্র। আর, মানসিক সুখের উপায়ের, অর্থাৎ শিক্ষার সুযোগের দিক থেকেই কি আমাদের অবস্থা বিশেষ ভাল? এমনকি 'সাদোভায়ার স্কুল মাস্টার'ও* কি একান্তই এক কল্পিত ব্যক্তি নয়?

আরো কথা আছে। ফয়েরবাখের নীতিশাস্ত্র অনুসারে নৈতিক চরিত্রের শ্রেষ্ঠ মন্দির হল ফাটকাবাজার, কেবল অবশ্য ঠিকমতো ফাটকাবাজি করা চাই। আমার সুখাকাঙ্ক্ষা যদি আমাকে ফাটকাবাজারের দিকে পরিচালিত করে এবং আমি যদি

* সাদোভায়ার (১৮৬৬ সালের অস্ট্রো-প্রুশীয় যুদ্ধে) লড়াইয়ে প্রুশীয়দের বিজয় লাভের পর জার্মান বুর্জোয়া প্রাবন্ধিকদের মধ্যে ও কথাটা খুব চালু হয় এই তাৎপর্যে, যেন প্রুশীয় বিজয়ের কারণ হল জনশিক্ষার প্রুশীয় ব্যবস্থার উৎকর্ষ। — সম্পাঃ

আমার কাজের পরিণামকে সঠিকভাবে বিচার করতে পারি যাতে শুধু প্রীতিকর ফলাফলই ঘটে, অপ্রীতিকর কিছু না হয়, অর্থাৎ আমি যদি শুধু জিতেই চলি, তাহলে সেটা ফয়েরবাখের উপদেশ পালনই হবে। তাছাড়া, এতে আমি অপর কারুর সুখাকাঙ্ক্ষা অনুসরণে হস্তক্ষেপ করছি না, কেননা আমি যেমন স্বেচ্ছায় ফাটকা-বাজারে গিয়েছিলাম তেমনি স্বেচ্ছায় সেও গিয়েছিল। আমার সঙ্গে ফাটকাবাজি করে সেও তার সুখাকাঙ্ক্ষারই অনুসরণ করেছে, যেমন কিনা আমিও করেছি। তার যদি টাকা খোয়া যায় তাহলে স্বতঃই প্রমাণ হবে যে, বেহিসেবের কারণে কাজটি তার নীতিগর্হিত হয়েছিল, এবং যেহেতু আমি তাকে তার উপযুক্ত শাস্তি দিলাম সেইহেতু আমি এমনকি এক আধুনিক রাদামানথস*-এর মতোই সগর্বে বুক চাপড়াতে পারি। প্রেম শব্দটি যদি নেহাতই ভাবালু শব্দালংকার না হয়, তাহলে বলতে হবে ফাটকাবাজারে প্রেমেরও রাজত্ব রয়েছে, কেননা সেখানে প্রত্যেকেই অপরের সাহায্যে সুখাকাঙ্ক্ষার সার্থকতা অনুসন্ধান করে। প্রেমের উদ্দেশ্যও ঠিক এই-ই এবং প্রেমের বাস্তব ক্রিয়া বলতেও তাই। সুতরাং আমার কাজের ফলাফল সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ দৃষ্টি নিয়ে আমি যদি সাফল্যের সঙ্গে জুয়া খেলতে পারি, তাহলে আমি ফয়েরবাখের নৈতিকতার কঠোরতম বিধি-নির্দেশই পালন করব, তাছাড়া বড়লোকও হয়ে যাব। অন্য কথায় ফয়েরবাখের নৈতিকতা ঠিক আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজেরই ছাঁচে ঢালা, ফয়েরবাখ স্বয়ং তা না চাইলেও বা কল্পনা না করলেও।

কিন্তু প্রেম! হ্যাঁ, ফয়েরবাখের কাছে সর্বত্রই এবং সর্বকালে প্রেমই হল সেই অলৌকিক দেবতা যে বাস্তব জীবনের সমস্ত বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ করে দেয়, আবার তাও কিনা এমন এক সমাজে যা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ স্বার্থমূলক শ্রেণীতে বিভক্ত! এইখানে তাঁর দর্শনের শেষ বৈপ্লবিক রেশটুকুও উপে যায়, বাকি থাকে শুধু সেই পুরানো কীর্তন: পরস্পরকে ভালবেসো, স্ত্রী পুরুষ এবং পদ নির্বিচারে পরস্পরকে আলিঙ্গন করো, — মিলমিশের এক সার্বজনীন মাতলামি!

সংক্ষেপে, ফয়েরবাখের নৈতিকতার দশা তাঁর পূর্ববর্তী সকলের মতোই। তার উদ্দেশ্য হল সব যুগের, সব মানুষের এবং সব অবস্থার পক্ষে উপযোগী হওয়া এবং ঠিক এই কারণেই তা কখনো কোথাও প্রযুক্ত হতে পারে না। বাস্তব জগতের ক্ষেত্রে তা ক্যাণ্টের পরম নির্দেশের মতোই অক্ষম। বাস্তবে প্রতিটি শ্রেণী, এমনকি প্রতিটি পেশার নিজস্ব নৈতিক আদর্শ আছে, এবং শাস্তির ভয় না থাকামাত্র তাও লংঘিত হয়। আর যে প্রেমে সকলকে মেলাবার কথা তার প্রকাশ ঘটে যুদ্ধ, কলহ, মামলা, গৃহবিবাদ, বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং এক কর্তৃক অপরকে সম্ভবপর সমস্ত শোষণে।

* রাদামানথস — গ্রীক পুরাকথা অনুসারে ন্যায়পরায়ণতার জন্য রাদামানথস নরকের বিচারক নিযুক্ত হন। — সম্পাঃ

কিন্তু ফয়েরবাখ যে প্রবল প্রেরণা সঞ্চার করে যান, সেটা কী করে অমনভাবে তাঁর নিজের পক্ষে নিষ্ফল হল? তার সোজা কারণ, যে অমূর্তায়ণের প্রতি তাঁর অমন ভয়ংকর ঘৃণা তারই এলাকা থেকে মুক্ত হয়ে তিনি কখনই প্রাণবান বাস্তবে পৌঁছবার পথ খুঁজে পাননি। তিনি প্রাণপণে প্রকৃতি আর মানুষকে আঁকড়ে থাকতে চান, কিন্তু তাঁর কাছে প্রকৃতি আর মানুষ শব্দমাত্রই। বাস্তব প্রকৃতি ও বাস্তব মানুষ সম্বন্ধে তিনি আমাদের সুনির্দিষ্ট কিছু বলতে পারেন না। ফয়েরবাখের অমূর্ত মানুষ থেকে বাস্তব জীবন্ত মানুষে পৌঁছোবার একমাত্র উপায় হল, তাকে ইতিহাসের অংশী হিসাবে দেখা। কিন্তু ফয়েরবাখের ঠিক এতেই আপত্তি। ফলে ১৮৪৮ সালটি, যার তাৎপর্য তিনি বুঝতে পারেননি, তাঁর কাছে শুধু বাস্তব জগতের সঙ্গে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ এবং নির্জনে অবসর গ্রহণ বলেই প্রতিপন্ন হল। এ ক্ষেত্রেও ফের দোষটা প্রধানত জার্মানির তখনকার অবস্থার যা তাঁকে অমন শোচনীয়ভাবে ক্ষয়ে যেতে বাধ্য করে।

কিন্তু ফয়েরবাখ না করলেও সে পদক্ষেপ গ্রহণ করতেই হল। ফয়েরবাখের নবধর্মের কেন্দ্র অমূর্ত মানবপূজার পরিবর্তে আনতে হল বাস্তব মানব ও তার ঐতিহাসিক বিকাশের বিজ্ঞান। ফয়েরবাখ ছাড়িয়ে ফয়েরবাখের দৃষ্টিকোণের এই পরবর্তী বিকাশের সূত্রপাত করেন মার্কস ১৮৪৫ সালে 'পবিত্র পরিবার' গ্রন্থে।

৪

স্ট্রাউস, বাউয়ের, স্তির্নার, ফয়েরবাখ এঁরা সকলেই যতক্ষণ না দর্শনের ক্ষেত্র ত্যাগ করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত হেগেলীয় দর্শনেরই শাখাপ্রশাখা। 'যীশুর জীবন' এবং 'আপ্তবাক্য' গ্রন্থের পর স্ট্রাউস শুধুই রেনাঁ-র কায়দায় দার্শনিক ও যাজক-ঐতিহাসিক সাহিত্য রচনায় নিজেকে নিযুক্ত করেছেন। বাউয়ের কেবল খ্রীষ্টধর্মের উৎস সংক্রান্ত ইতিহাসের ক্ষেত্রে কিছুটা সাফল্য লাভ করেছেন, যদিও এই ক্ষেত্রে তাঁর কীর্তিটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বাকুনিন স্তিরনারকে প্রুধোঁর সঙ্গে মিলিয়ে এই মিশ্রণটিকে 'নৈরাজ্যবাদ' আখ্যা দিলেও স্তিরনার একটা কৌতুকাবহ বস্তু হিসাবেই রয়ে গেলেন। দার্শনিক হিসেবে তাৎপর্য ছিল একমাত্র ফয়েরবাখের। কিন্তু যে দর্শন হতে চায় সমস্ত বিজ্ঞানের ঊর্ধ্বে এবং তাদের সকলের যোগসূত্র হিসাবে বিজ্ঞানের বিজ্ঞান, — সে দর্শন তাঁর কাছে একটা পবিত্র বস্তু হিসাবেই রয়ে গেল — তার সীমানা তিনি যে শুধু পার হতে পারেননি তা নয়, দার্শনিক হিসেবেও তিনি মাঝপথে থেমে গিয়েছিলেন, নিচের দিকটায় বস্তুবাদী, উপরের দিকটায় ভাববাদী। সমালোচনার মাধ্যমে হেগেলকে প্রত্যাখ্যান করার সামর্থ্য তাঁর ছিল না; তিনি শুধুই হেগেলকে নিষ্প্রয়োজন বলে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন, যদিও হেগেলীয় দর্শনতন্ত্রের বিশ্বকোষসুলভ ঐশ্বর্যের তুলনায় তিনি নিজে এক

গালভরা প্রেমধর্ম এবং এক ক্ষীণ নির্বীর্য নৈতিকতা ছাড়া সদর্থক বেশি কিছু পেশ করতে পারেননি।

কিন্তু হেগেলীয় সম্প্রদায়ের ভাঙন থেকে আরো একটি ধারার উদ্ভব হয় এবং একমাত্র সেইটিই প্রকৃত ফলপ্রসূ হয়েছে। এই ধারাটি মূলত মার্কসের নামের সঙ্গে জড়িত*।

এক্ষেত্রেও বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমেই হেগেলীয় দর্শনের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছে। তার মানে ভাববাদী উৎকেন্দ্রিকতার প্রাক-সংস্কারবাদ থেকে মুক্ত হয়ে দেখলে বাস্তব জগত — অর্থাৎ প্রকৃতি ও ইতিহাস — যেভাবে প্রতীত হয় তাকে সেইভাবেই জানবার জন্য এ ধারা কৃতসংকল্প। স্থির করা হল, কাল্পনিক অন্তঃসম্পর্কে নয় তাদের স্বকীয় অন্তঃসম্পর্কে দেখা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে যে ভাববাদী উদ্ভাবন খাপ খায় না, তাকে নির্মমভাবে পরিহার করতে হবে। বস্তুবাদ বলতে এ ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না। নতুন ধারায় বস্তুবাদী দর্শনকে এই প্রথম সত্যই গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা হয়েছে এবং অন্তত তার মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে সমস্ত প্রাসঙ্গিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে সুসঙ্গতভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

হেগেলকে নিছক পাশে ঠেলে দেওয়া হল না। বরং, ইতিপূর্বে তাঁর যে বৈপ্লবিক দিকটি বর্ণিত হয়েছে, তাঁর সেই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি থেকেই সুরু করা হল। কিন্তু হেগেলীয় রূপে সেটা ছিল অকেজো। হেগেলের মতে, দ্বন্দ্বতত্ত্ব হল ধারণার আত্মবিকাশ। পরম ধারণা শুধুই যে অনন্তকাল অজ্ঞাত কোথাও বর্তমান তাই নয়, অস্তিত্বশীল সমগ্র বিশ্বের প্রকৃত জীবন্ত আত্মাও হল তাই। যে সমস্ত প্রাথমিক পর্যায়ের মাধ্যমে তার আত্মবিকাশ, 'যুক্তিবিদ্যা' গ্রন্থে সেগুলি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে এবং সেগুলি সবই সে ধারণার মধ্যেই নিহিত। তারপর প্রকৃতি রূপে পরিবর্তিত হয়ে সেই ধারণা নিজেকে 'অন্যীভূত' করে; সেখানে আত্ম-চেতনাহীনভাবে, প্রাকৃতিক আবশ্যিকতার ছদ্মবেশে তার এক

* এখানে আমি একটি ব্যক্তিগত কথা ব্যাখ্যা করবার অনুমতি চাই। সম্প্রতি এই মতবাদে আমার অংশ বিষয়ে বারবার উল্লেখ হয়েছে, তাই বিষয়টির নিষ্পত্তি হিসেবে আমি কয়েকটি কথা না বলে পারি না। আমি অস্বীকার করতে পারি না যে, চল্লিশ বছর ধরে মার্কসের সঙ্গে আমার সহযোগিতাকালে এবং তার আগেও এই মতবাদের ভিত্তি স্থাপনে, বিশেষত তার পরিবিস্তারে আমার কিছুটা স্বাধীন অবদান ছিল। কিন্তু বিশেষত অর্থনীতি এবং ইতিহাসের ক্ষেত্রে তার প্রধান মৌলিক নীতিগুলির অধিকাংশই এবং সর্বোপরি এগুলির চূড়ান্ত সুতীক্ষ্ম সূত্রায়ণ — এটা মার্কসেরই কীর্তি। বড়জোর দু'একটি বিশেষ ক্ষেত্রে আমার রচনার কথা ছাড়া আমার যা অবদান তা আমাকে বাদ দিয়েই মার্কস অনায়াসে করতে পারতেন। কিন্তু মার্কস যা করে গিয়েছেন আমি তা কখনই করতে পারতাম না। মার্কস ছিলেন আমাদের বাকি সকলের ঊর্ধ্বে, তাঁর দৃষ্টি ছিল আমাদের চেয়ে দূরপ্রসারী এবং নিরীক্ষণ ছিল ব্যাপকতর ও দ্রুততর। মার্কস ছিলেন প্রতিভাবান, বাকি আমরা বড়জোর বুদ্ধিমান। তাঁকে ছাড়া এ তত্ত্ব আজ যাতে পরিণত হয়েছে তা কিছুতেই সম্ভব হত না। তাই সঠিকভাবেই এ তত্ত্ব তাঁর নামাঙ্কিত। (এঙ্গেলসের টীকা।)

নববিকাশ শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত মানুষের মধ্যে পুনরায় তা আত্ম-চেতনায় প্রত্যাবর্তন করে। তারপর ইতিহাসের ক্ষেত্রে সেই আত্ম-চেতনা আবার স্থূলরূপ থেকে নিজেকে বিকশিত করতে করতে শেষ পর্যন্ত হেগেলীয় দর্শনে সেই পরম ধারণা সম্পূর্ণভাবে নিজেতে প্রত্যাবর্তন করে। অতএব প্রকৃতি ও ইতিহাসে যে দ্বান্দ্বিক বিকাশ দেখা দেয় অর্থাৎ নিচুর থেকে উঁচুর দিকে যে অগ্রগতি সমস্ত আঁকাবাঁকা পথে ও সাময়িক পশ্চাদগতি সত্ত্বেও অব্যাহত থাকে, হেগেলের মতে সেই কার্যকারণ সম্পর্ক হল আসলে অনন্তকাল থেকে গতিশীল ধারণার শোচনীয় অনুমুদ্রণ মাত্র; কোথায় তা জানা নেই, কেবল এটুকু স্পষ্ট যে, তা কোনো চিন্তাশীল মানব মস্তিষ্ক থেকে স্বতন্ত্র। ভাবাদর্শগত এই বিকার পরিহারের প্রয়োজন ছিল। আমরা আবার বস্তুবাদীভাবে আমাদের মাথার মধ্যেকার ধারণাগুলিকে বুঝলাম, বাস্তব বস্তুকে পরম ধারণার বিকাশের কোনো পর্যায়ের প্রতিরূপ বলে না ধরে ধারণাগুলি বুঝলাম বাস্তব বস্তুর প্রতিরূপ হিসাবে। এইভাবে দ্বন্দ্বতত্ত্ব পরিণত হল বহির্জগৎ ও মানবচিন্তা উভয় ক্ষেত্রেই গতির সাধারণ নিয়ম সংক্রান্ত বিজ্ঞানে: দুই সারি এই নিয়মাবলীর সারবস্তু অভিন্ন, কিন্তু মানবমন যে পরিমাণে এগুলিকে সচেতনভাবে প্রয়োগ করতে পারে, সেই পরিমাণে তাদের প্রকাশে পার্থক্য ঘটে; প্রকৃতিতে এবং এ পর্যন্ত মানব ইতিহাসের অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই নিয়মাবলী অচেতনভাবে আপাত আকস্মিকতার এক অনন্ত পরম্পরার মধ্যে বাহ্য আবশ্যিকতা রূপে কার্যকরী থাকে। এইভাবে ধারণার দ্বান্দ্বিকতাটা নিজেই পরিণত হল বাস্তব জগতের দ্বান্দ্বিক গতির সচেতন প্রতিবিম্বে এবং ফলে হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্বকে উলটিয়ে দেওয়া হল, কিংবা বলা ভালো, তা যেভাবে মাথার ওপর দাঁড়িয়েছিল তা ঘুরিয়ে তাকে পায়ের উপর দাঁড় করানো হল। এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে-বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্ব বহু বছর ধরে আমাদের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার ও তীক্ষ্ণতম অস্ত্রর কাজ করেছে তাকে শুধু আমরাই আবিষ্কার করেছি তাই নয়; আমাদের, এমনকি হেগেলের অপেক্ষা না রেখেই স্বতন্ত্রভাবে তা আবিষ্কার করেছেন এক জার্মান শ্রমিক ইয়োসেফ দিৎস্‌গেন।*

যাই হোক এইভাবে আবার পুনঃস্থাপিত করা হল হেগেলীয় দর্শনের বৈপ্লবিক দিকটি এবং সেই সঙ্গেই তার যে সব ভাববাদী ভূষণের ফলে হেগেলের পক্ষে তার সুসঙ্গত প্রয়োগ ব্যাহত হয়েছিল তা বাদ দেওয়া হল। বিশ্বকে তৈরি **জিনিসের** যৌগিক সমাহার না ভেবে **প্রক্রিয়ার** যৌগিক সমাহার বলে বিবেচনা করতে হবে, যেখানে আপাত স্থির জিনিসগুলি তথা আমাদের মাথায় সেইগুলির মানস প্রতিবিম্ব অর্থাৎ ধারণাগুলি

* *Das Wesen der menschlichen Kopfarbeit, dargestellt von einem Handarbeiter* (জনৈক কায়িক শ্রমিক বর্ণিত মানব মস্তিষ্ককর্মের প্রকৃতি) Hamburg, Meissner সংস্করণ দ্রষ্টব্য। (এঙ্গেলসের টীকা।)

এক অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে, উদ্ভব ও বিলয়ের মধ্য দিয়ে চলেছে, যেখানে সমস্ত আপাত আপতন ও সাময়িক পশ্চাদগতি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত এক ক্রমাগ্রসর বিকাশই জয়ী হয় — এই মূল মহান চিন্তা বিশেষত হেগেলের সময় থেকে সাধারণের চেতনায় এমনভাবে পরিব্যাপ্ত হয়েছে যে, তার সাধারণ রূপটি আজ আর বড় একটা অস্বীকার করা হয় না। কিন্তু মুখে এই মূল চিন্তা স্বীকার করা এবং বাস্তবে অনুসন্ধানের প্রতি ক্ষেত্রে খুঁটিয়ে তার প্রয়োগ করা, এ দুটি আলাদা ব্যাপার। কিন্তু যদি এই দৃষ্টিকোণ থেকেই সর্বদা অন্বেষণ অগ্রসর হয় তাহলে চরম সমাধান এবং সনাতন সত্যের দাবি চিরকালের মতো শেষ হয়: সমস্ত অর্জিত জ্ঞানের অনিবার্য সীমাটা সম্বন্ধে সব সময়েই হুঁস থাকে, হুঁস থাকে যে, যে-পরিস্থিতিতে জ্ঞানটি অর্জিত হয়েছে তার দ্বারাই সে জ্ঞান নিয়ন্ত্রিত। অপরপক্ষে, এখনো প্রচলিত প্রাচীন অধিবিদ্যার কাছে সত্য ও মিথ্যা, ভালো ও মন্দ, অভিন্ন ও ভিন্ন, আবশ্যিক ও আপতিকের মধ্যে যে বিরোধ দুর্লংঘ্য বলে বিবেচিত হয় তার সামনে আর সশ্রদ্ধ হবার প্রয়োজন হয় না। বোঝা যায় যে, এই বিরোধগুলির নেহাতই আপেক্ষিক সত্যতা বর্তমান, এখন যা সত্য বলে স্বীকৃত তারই মধ্যে মিথ্যার দিক নিহিত আছে এবং তা ভবিষ্যতে প্রকাশ পাবে; ঠিক যেমন এখন যা মিথ্যা বলে বিবেচিত তার মধ্যেও সত্যের দিক নিহিত বলেই অতীতে তা সত্য বলে বিবেচিত হয়েছিল; যাকে আবশ্যিক বলা হয় তা নিছক আপতিকতা দ্বারাই গঠিত এবং তথাকথিত আপতিকতা হল একটা রূপ যার পিছনে লুকিয়ে আছে আবশ্যিকতা ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অনুসন্ধান ও চিন্তার যে সাবেকী পদ্ধতিকে হেগেল 'অধিবিদ্যামূলক' আখ্যা দিয়েছেন, যে পদ্ধতি প্রধানত **জিনিসগুলিকে** সমাপ্ত অনড় ও অপরিবর্তনীয় হিসেবে অনুসন্ধান করত এবং যে পদ্ধতির জের মানুষের মনকে এখনো তীব্রভাবে প্রভাবিত করে, সেই পদ্ধতিরও তখনকার কালে যথেষ্ট ঐতিহাসিক ন্যায্যতা ছিল। প্রক্রিয়াকে বিচার করবার আগে প্রথমে জিনিসগুলি পরীক্ষা করার প্রয়োজন ছিল। একটি নির্দিষ্ট জিনিস কী ভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তা দেখবার আগে জানা দরকার জিনিসটি ঠিক কী। এবং প্রকৃতিবিজ্ঞানের অবস্থা তখন এইরকমই। যে প্রকৃতিবিজ্ঞান তখন পরিসমাপ্ত বস্তু হিসেবে জীবন্ত ও জড়বস্তুর অনুসন্ধান করত, তা থেকেই দেখা দেয় সাবেকী অধিবিদ্যা যেখানে জিনিসগুলি পরিসমাপ্ত বস্তু বলেই বিবেচিত। কিন্তু এই অনুসন্ধান যখন এতদূর অগ্রসর হল যে, প্রকৃতিতেই এই জিনিসগুলির যে পরিবর্তন চলেছে সে সম্বন্ধে সুসংবদ্ধ অনুসন্ধানের পর্যায়ে উৎক্রমণের মতো চূড়ান্ত পদক্ষেপ সম্ভবপর হল, তখন দর্শনের ক্ষেত্রেও পুরোনো অধিবিদ্যার শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এল। এবং বস্তুত গত শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত প্রকৃতিবিজ্ঞান যে ক্ষেত্রে ছিল মূলতই **সংগ্রহের** বিজ্ঞান, পরিসমাপ্ত জিনিসের বিজ্ঞান, সে ক্ষেত্রে আমাদের শতাব্দীতে তা মূলতই **শৃংখলা সাধনের** বিজ্ঞান, পরিবর্তন

প্রক্রিয়ার বিজ্ঞান, এই জিনিসগুলির উৎস এবং বিকাশ তথা যে পারস্পরিক সম্পর্কের ফলে এই সমস্ত প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া এক বিরাট সমগ্রতার সৃষ্টি করে, তার বিজ্ঞান। উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের মধ্যে যে সব প্রক্রিয়া চলে তার অনুসন্ধান করে শারীরবৃত্ত; বীজ থেকে পরিণতাবস্থা পর্যন্ত ব্যক্তি-শরীরের বিকাশ নিয়ে আলোচনা করে ভ্রূণবিদ্যা; পৃথিবীর উপরিতল কী ভাবে ক্রমশ গঠিত হয়েছে তার আলোচনা করে ভূতত্ত্ব — এই সবকটি বিজ্ঞানই আমাদের শতাব্দীতে জন্মেছে।

কিন্তু সর্বোপরি তিনটি বিরাট আবিষ্কারের ফলে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলির অন্তঃসম্পর্ক সংক্রান্ত আমাদের জ্ঞান হু হু করে বেড়ে গিয়েছে:

প্রথমত, জীবকোষ আবিষ্কার, যে এককটির বহুলীভবন ও পৃথকীভবনের ফলে গোটা উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহটা গড়ে ওঠে। তাতে করে সমস্ত উন্নত জীবের দেহ একই সাধারণ নিয়ম অনুসারে গড়ে ওঠে শুধু এই স্বীকৃতিই নয়, তাছাড়াও জীবকোষের পরিবর্তন ক্ষমতার ফলে কী ভাবে দেহসত্তার প্রজাতি পরিবর্তন হয় এবং সেই হেতু ব্যক্তিগত বিকাশের অতিরিক্ত একটা বিকাশের মধ্যে দিয়ে তা যায়, এটা বোঝবারও পথনির্দেশ পাওয়া গেল।

দ্বিতীয়ত, তেজের রূপান্তর, এতে প্রমাণিত হল, যে-তথাকথিত শক্তিগুলি প্রথমত অজৈব প্রকৃতিতে ক্রিয়াশীল — যান্ত্রিক শক্তি ও তার পরিপূরক, তথাকথিত স্থৈতিক (potential) তেজ, তাপ, বিকিরণ (আলো বা বিকীর্ণ তাপ), বিদ্যুৎ, চুম্বক তেজ ও রাসায়নিক তেজ — এ সবই হল সার্বিক গতির অভিব্যক্তির বিভিন্ন রূপ এবং এগুলি নির্দিষ্ট এক একটা অনুপাতে পরস্পরে পরিণত হয়, যার ফলে নির্দিষ্ট পরিমাণের একটি তেজ অন্তর্হিত হলে তার জায়গায় নির্দিষ্ট পরিমাণের অপর একটি তেজ আবির্ভূত হয়; অতএব প্রকৃতির সমগ্র গতিই এক রূপ থেকে রূপান্তর গ্রহণের এক অবিরাম প্রক্রিয়ায় পর্যবসিত হয়।

শেষত, ডারউইনের সর্বপ্রথম দেওয়া এই সুসংবদ্ধ প্রমাণ যে, আজকের দিনে আমাদের চারপাশে মানুষ শুদ্ধ যে-জীবজগৎ রয়েছে তা আদিতে কয়েকটি এককোষী বীজ থেকে সুদীর্ঘ ক্রমবিকাশের পরিণাম এবং সেই আদি জীবকোষগুলিও আবার রাসায়নিক উপায়ে উদ্ভূত প্রোটোপ্লাস্‌ম্‌ বা আলবুমেন থেকে জাত।

এই তিনটি বিরাট আবিষ্কার এবং প্রকৃতিবিজ্ঞানে অন্যান্য বিপুল অগ্রগতির ফলে আমরা এমন জায়গায় পৌঁছেছি যেখানে আমরা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াব মধ্যে অন্তঃসম্পর্কটা দেখতে পারি এবং তা শুধু এক একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নয়, তাছাড়াও সমগ্রের সঙ্গে এইসব নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের অন্তঃসম্পর্কেও। অতএব প্রয়োগমূলক প্রকৃতিবিজ্ঞানই যে সমস্ত তথ্য দিয়েছে, তার সাহায্যে আমরা মোটামুটি সুসংবদ্ধভাবে প্রকৃতির অন্তঃসম্পর্কের একটা সামগ্রিক পরিচয় দিতে পারি। এই সামগ্রিক দৃষ্টিটা জোগাবার ভার ইতিপূর্বে ছিল

তথাকথিত প্রকৃতি-দর্শনের উপর। কিন্তু প্রকৃতি-দর্শন সে দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারত কেবল বাস্তব কিন্তু তখনো অজানা অন্তঃসম্পর্কের স্থানে ভাবময় ও কাল্পনিক অন্তঃসম্পর্ক স্থাপন করে, তথ্যের অভাব মনের খেয়াল দিয়ে পূরণ করে এবং বাস্তব ফাঁকগুলির উপর কল্পনার সেতু বন্ধন করে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে তা নানা চমৎকার ধারণায় উপনীত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালের নানা আবিষ্কারের পূর্বাভাস দিয়েছিল, কিন্তু তাছাড়াও উদ্ভাবন করেছিল বহু বাজে কথা, যা অবশ্য না হয়ে পারত না। আজকের দিনে আমাদের কালোপযোগী একটা 'প্রকৃতি ব্যবস্থায়' উপনীত হবার জন্য যখন প্রাকৃতিক গবেষণার ফলাফলগুলির উপর শুধু দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে অর্থাৎ তাদের নিজস্ব অন্তঃসম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে দৃষ্টিপাত করলেই যথেষ্ট, যখন এমনকি প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের অধিবিদ্যারঞ্জিত মনের উপর তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এই অন্তঃসম্পর্কের দ্বান্দ্বিক চরিত্র আত্মপ্রতিষ্ঠা করছে, তখন আজ প্রকৃতি-দর্শন চূড়ান্তভাবে খারিজ হয়ে যায়। তাকে পুনরুদ্ধার করবার প্রতিটি প্রচেষ্টা শুধু অবান্তরই নয় **পশ্চাদগতিই হবে।**

কিন্তু প্রকৃতি সম্বন্ধে যে কথা সত্য, যাকে এখন আমরা বিকাশের একটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বলে মানছি, সেই কথা সমাজ ইতিহাসের প্রতিটি শাখায় এবং মানবীয় (তথা স্বর্গীয়) বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত সমস্ত বিজ্ঞানের সমষ্টির ক্ষেত্রেও সমান সত্য। এখানেও - ইতিহাস, অধিকার এবং ধর্মের দর্শনের ক্ষেত্রেও — ঘটনার মধ্যে প্রমাণিত বাস্তব অন্তঃসম্পর্কের স্থান নিয়েছিল দার্শনিকের নিজস্ব মন গড়া এক অন্তঃসম্পর্ক; সামগ্রিকভাবে ইতিহাস ও তার বিভিন্ন অংশকে বোঝা হত ভাবসত্তার ক্রমিক রূপায়ণ বলে এবং স্বভাবতই সে ভাবসত্তাটি হল দার্শনিকেরই নিজস্ব প্রিয় ভাবসত্তা। এই মতে, ইতিহাসের ক্রিয়া অচেতন হলেও তা অবশ্যই আগে থেকে নির্ধারিত একটা আদর্শ লক্ষ্য সাধনের দিকে চলে, যেমন, হেগেলের কাছে, সে উদ্দেশ্য হল পরম ভাবসত্তার রূপায়ণ এবং ওই পরম ভাবসত্তার অভিমুখে অবিচল প্রবণতাই হল ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর আভ্যন্তরীণ অন্তঃসম্পর্ক। এইভাবে বাস্তব কিন্তু তখনো অজানা পারস্পরিক সম্পর্কের স্থানে এল এক নতুন, রহস্যময় অচেতন অথবা ক্রমচেতন ভবিতব্য। অতএব প্রকৃতির ক্ষেত্রে যেরকম, এখানেও সেইভাবেই কাল্পনিক ও কৃত্রিম অন্তঃসম্পর্ক দূর করে বাস্তব অন্তঃসম্পর্কের আবিষ্কার প্রয়োজন এবং এই কর্তব্যটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় মানব সমাজের ইতিহাসে গতির যেসব সাধারণ নিয়ম প্রাধান্য করে সেগুলির আবিষ্কার।

কিন্তু একদিক থেকে সমাজ এবং প্রকৃতির বিকাশের ইতিহাসের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রকৃতির উপর মানুষের প্রতিক্রিয়ার কথা বাদ দিলে প্রকৃতির ক্ষেত্রে কেবল অন্ধ অচেতন শক্তিগুলি পরস্পরের উপর সক্রিয় এবং সেগুলির পারস্পরিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া থেকে দেখা দেয় সাধারণ নিয়মাবলী। ভাসা ভাসা ভাবে দেখা অসংখ্য

আপাত-আপতনের ক্ষেত্রেই হোক, বা যে চরম ফলাফলের মধ্যে এই আপতনগুলির আভ্যন্তরীণ নিয়মানুবর্তিতা প্রমাণিত হচ্ছে সেখানেই হোক, কোনো ঘটনাই সচেতন বাঞ্ছিত লক্ষ্যানুসারী নয়। পক্ষান্তরে মানবসমাজে প্রতিটি কর্মকর্তা চেতনাবিশিষ্ট, তারা সংকল্প নিয়ে বা আবেগবশে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যর দিকে ক্রিয়াশীল; সচেতন উদ্দেশ্য ছাড়া, বাঞ্ছিত লক্ষ্য ছাড়া এখানে কোনো কিছুই ঘটে না। কিন্তু বিশেষ করে কোনো নির্দিষ্ট যুগ বা ঘটনা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও তাতে এই মূল সত্য বদলে যায় না যে, আভ্যন্তরীণ সাধারণ নিয়ম দ্বারাই ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত। কেননা এখানেও সমস্ত ব্যক্তিমানুষের সচেতন উদ্দেশ্য সত্ত্বেও উপরিভাগে বাহ্যত আপাতিকতারই রাজত্ব। যা চাওয়া যায় তা নেহাত কালেভদ্রেই ঘটে; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসংখ্য বাঞ্ছিত উদ্দেশ্যের মধ্যে পরস্পর প্রতিকূলতা ও সংঘাত দেখা যায়, কিংবা শুরু থেকেই এই উদ্দেশ্যগুলির চরিতার্থতা সম্ভব নয় বা সে চরিতার্থতার উপায় অপর্যাপ্ত। অতএব ইতিহাসের ক্ষেত্রে অসংখ্য ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও ব্যক্তিগত ক্রিয়ার মধ্যে সংঘাতের পরিণামে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তার সঙ্গে অচেতন প্রাকৃতিক পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায়। কর্মের পেছনে বাঞ্ছিত লক্ষ্য থাকলেও তার যে আসল ফলাফল দাঁড়ায় সেটা বাঞ্ছিত নয়; অথবা সে ফলাফল বাঞ্ছিত লক্ষ্যের অনুকূল বলেই মনে হলেও তার চরম পরিণামটা হয় বাঞ্ছিতের চেয়ে একেবারে অন্য রকম। অতএব ঐতিহাসিক ঘটনাও আপাতিকতার শাসনাধীন বলে মনে হয়, কিন্তু যেখানে ওপরে ওপরে আপাতিকতার ক্রিয়া মনে হয় সেখানে সর্বদাই প্রকৃতপক্ষে তা আভ্যন্তরীণ নিগূঢ় নিয়মাবলী দ্বারাই শাসিত এবং সমস্যা হল শুধু সেই নিয়মাবলীর আবিষ্কার।

শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের পরিণাম যাই হোক না কেন, মানুষই তার স্রষ্টা, যাতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সচেতন উদ্দেশ্য অনুসারে কাজ করে, এবং বিভিন্ন দিকে সক্রিয় তাদের এই বহু ইচ্ছা এবং বহির্বিশ্বের উপর বিবিধ প্রভাবের সারফলটাই হল ইতিহাস। অতএব প্রশ্নটা হল বহু ব্যক্তি কী ইচ্ছা করে। ইচ্ছা নির্ধারিত হয় রিপু অথবা বিচারের দ্বারা। কিন্তু যে কারিকা দ্বারা রিপু ও বিচার প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তা বহুবিধ। আংশিকভাবে তা বহির্বস্তু হতে পারে, হতে পারে আদর্শমূলক প্রেরণা: উচ্চাকাঙ্ক্ষা, 'সত্য ও ন্যায়ের উৎসাহ', ব্যক্তিগত ঘৃণা এবং এমনকি রকমারি বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত খামখেয়াল। কিন্তু অপরপক্ষে আমরা দেখেছি যে, ইতিহাসে ক্রিয়াশীল বহু ব্যক্তিগত ইচ্ছা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত ফলাফল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, অনেক সময় একেবারে বিপরীত ফলাফল সৃষ্টি করে; অতএব সামগ্রিক ফলের তুলনায় এই প্রেরণার গুরুত্ব নেহাতই গৌণ। অপরপক্ষে, আরো প্রশ্ন ওঠে, এই প্রেরণাও আবার কোন চালিকা শক্তি দ্বারা পরিচালিত, কী কী সেই ঐতিহাসিক কারণ যা কর্মরত মানুষদের মস্তিষ্কে গিয়ে এই সব প্রেরণার রূপ নেয়?

পুরানো বস্তুবাদ কখনো এ প্রশ্ন তোলেনি। ইতিহাস সংক্রান্ত তার যেটুকু বা ধারণা তা ছিল নেহাত প্রায়োগিক। এই ধারণা অনুসারে সমস্ত ক্রিয়াকেই তার পেছনকার উদ্দেশ্য দিয়ে বিচার করা হত, ইতিহাসে অংশগ্রহণকারী মানুষদের ভালো আর মন্দ দুভাগে ভাগ করা হত আর তারপর দেখা যেত, সাধারণতই যারা ভালো তারা ঠকছে, যারা মন্দ তারা হচ্ছে জয়ী। অতএব পুরানো বস্তুবাদের কাছে দাঁড়ায় এই যে, ইতিহাস অধ্যয়ন থেকে খুব কিছু শিক্ষা লাভের সম্ভাবনা নেই এবং আমাদের কাছে দাঁড়ায় এই যে, ইতিহাসের ক্ষেত্রে পুরানো বস্তুবাদ নিজের প্রতিই মিথ্যাচরণ করছে, কেননা সে বস্তুবাদ অনুসারে ইতিহাসের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল আদর্শমূলক চালিকা শক্তিগুলির মূল অন্বেষণ করার বদলে, এই শক্তিগুলির পিছনে রয়েছে কোন্ চালিকা শক্তি সে কথা আবিষ্কার করার পরিবর্তে, আদর্শমূলক চালিকা শক্তিগুলিকেই চরম কারণ বলে ধরা হয়। তার অসঙ্গতিটা এইখানে নয় যে, **আদর্শমূলক** প্রেরণা শক্তিকে স্বীকার করা হচ্ছে, বরং এইখানে যে, এই আদর্শমূলক প্রেরণার পিছনকার চালক হেতু পর্যন্ত অন্বেষণ চালানো হচ্ছে না। অপরপক্ষে, ইতিহাসের দর্শন অনুসারে, বিশেষত হেগেল যার প্রতিনিধি, এইটে মানা হয় যে, ইতিহাসে ক্রিয়াশীল মানুষদের বাহ্যিক এবং আসল উদ্দেশ্যাবলীও কোনো মতেই ঐতিহাসিক ঘটনার চরম কারণ নয়, এই উদ্দেশ্যের পিছনে অন্য কোনো চালিকা শক্তি বর্তমান এবং তারই আবিষ্কার প্রয়োজন। কিন্তু সে দর্শন ইতিহাসের মধ্যেই এই সব শক্তির সন্ধান করেনি, বাইরে থেকে, দার্শনিক মতাদর্শ থেকে ইতিহাসের ক্ষেত্রে সেগুলি আমদানি করে। যেমন হেগেল প্রাচীন গ্রীক ইতিহাসকে তার আভ্যন্তরীণ অন্তঃসম্পর্ক দিয়ে ব্যাখ্যা করার বদলে শুধুই বলেছেন যে, এ ইতিহাস 'সুন্দর ব্যক্তিত্বের রূপকে' পরিস্ফুট করা ছাড়া আর কিছুই নয়, তা এক নিছক 'শিল্পকর্মের' রূপায়ণ মাত্র। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন গ্রীকদের সম্বন্ধে তিনি এমন অনেক কথা বলেছেন যা চমৎকার ও গভীরতার পরিচায়ক; কিন্তু তাই বলে আজ আমাদের পক্ষে এই ধরনের ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করায় বাধা নেই, যা কথার প্যাঁচ ছাড়া আর কিছুই নয়।

অতএব, যখন চালক শক্তিগুলিকে অনুসন্ধান করবার প্রশ্ন ওঠে, যে শক্তি ইতিহাসে ক্রিয়াশীল মানুষদের প্রেরণার পিছনে সচেতন বা অচেতনভাবে এবং আসলে প্রায়ই অচেতনভাবে বর্তমান এবং যেগুলি হল ইতিহাসের প্রকৃত চরম চালিকা শক্তি, তখন প্রশ্নটা আসলে ব্যক্তি বিশেষদের উদ্দেশ্য নিয়ে ততটা নয়, তাঁরা যত বড়ই হোন না কেন, যতটা সেই সব প্রেরণা নিয়ে যা বিপুল জনগণকে, সমগ্র জাতিকে এবং জাতির অভ্যন্তরস্থ সমগ্র শ্রেণীকে সচল করে তোলে এবং তা খড়ের আগুন যেমন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে হঠাৎ নিভে যায় সেরকম ক্ষণিক নয়, বরং বিরাট ঐতিহাসিক রূপান্তর ঘটানর মতো একটা স্থায়ী কর্মের জন্য। কর্মরত জনগণ ও তাদের নেতা তথাকথিত

মহাপুরুষদের মনে যা স্পষ্ট বা অস্পষ্ট, প্রত্যক্ষ বা মতাদর্শগত ও এমনকি মহিমান্বিতরূপে সচেতন প্রেরণা হিসেবে প্রতিফলিত হয়, সেই চালক হেতুগুলিকে নিরূপণ করাই হল একমাত্র পথ এবং এই পথে অগ্রসর হয়ে আমরা সামগ্রিকভাবে ইতিহাসের ক্ষেত্রে এবং নির্দিষ্ট এক একটা যুগে ও নির্দিষ্ট এক একটা দেশের ক্ষেত্রে সক্রিয় নিয়মগুলির খোঁজ পাব। যা কিছু মানুষকে সচল করে তোলে সেটা তার মনের মধ্যে দিয়ে সক্রিয় হতে বাধ্য; কিন্তু তার মনে এর কী রূপ দাঁড়াবে তা বহুলাংশে নির্ভর করে পরিস্থিতির উপর। শ্রমিকেরা এখনো পুঁজিবাদী যন্ত্রশিল্পকে মোটেই মেনে নিতে পারেনি, যদিও তারা ১৮৪৮ সালেও রাইন অঞ্চলে যা করত সেভাবে এখন যন্ত্রগুলি স্রেফ চূর্ণ করতে শুরু করে না।

কিন্তু ইতিহাসের এই চালক হেতুগুলির সঙ্গে তার ফলাফলের অন্তঃসম্পর্ক জটিল ও প্রচ্ছন্ন বলে ইতিপূর্বের সমস্ত যুগে এগুলিকে আবিষ্কার করা প্রায় অসম্ভব ছিল, তবে আমাদের বর্তমান যুগ এই অন্তঃসম্পর্কগুলিকে এমন সরল করে দিয়েছে যে, এখন ধাঁধার সমাধান সম্ভব হয়েছে। বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পর প্রতিষ্ঠা থেকে, অর্থাৎ অন্তত ১৮১৫ সালের ইউরোপীয় শান্তি থেকে, ইংলণ্ডের কারুর কাছেই আর একথা গোপন নেই যে, সেখানের সমগ্র রাজনৈতিক সংগ্রাম চলেছে দুটি শ্রেণীর মধ্যে, ভূস্বামী অভিজাত শ্রেণী ও বুর্জোয়ার মধ্যে প্রাধান্যর দাবি নিয়ে। ফরাসী দেশে বুর্বোঁদের ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে একই ব্যাপার অনুভূত হয়েছে। তিয়েরি থেকে গিজো, মিনিয়ে ও তিয়ের পর্যন্ত পুনঃপ্রতিষ্ঠা পর্বের* ঐতিহাসিকেরা মধ্য যুগের পরবর্তী সমগ্র ফরাসী ইতিহাস প্রসঙ্গে সর্বত্রই মূলসূত্র হিসেবে তার উল্লেখ করেন। এবং ১৮৩০ সাল থেকে উভয় দেশেই শ্রমিক শ্রেণী, প্রলেতারিয়েত, ক্ষমতার তৃতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। পরিস্থিতি এতই সরল হয়েছে যে, অন্তত সবচেয়ে অগ্রগামী দুটি উপরোক্ত দেশের ক্ষেত্রে এই তিন মহান শ্রেণীর সংগ্রাম, তাদের স্বার্থসংঘাতের মধ্যে আধুনিক ইতিহাসের চালিকা শক্তি না দেখতে হলে ইচ্ছে করেই চোখ বুজে থাকা দরকার।

কিন্তু এই শ্রেণীগুলির আবির্ভাব হল কী করে? অন্তত প্রথম দৃষ্টিতে যদিই বা ইতিপূর্বের সামন্ততান্ত্রিক বৃহৎ জমিদারির উদ্ভবকে রাজনৈতিক কারণ দিয়ে জুলুমদারি অধিকার হিসেবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়, তবুও বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত সম্বন্ধে তা সম্ভব নয়। এই দুটি বিরাট শ্রেণীর উৎস ও বিকাশের কারণ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবেই বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক বলে দেখা গেল। এবং একথাও সমান স্পষ্ট হল যে,

---

* পুনঃপ্রতিষ্ঠা পর্ব — ফরাসী দেশের ইতিহাসে ১৮১৪ সাল থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত একটা পর্ব; ১৭৯২ সালের ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবে বিতাড়িত বুর্বোঁ রাজবংশের হাতে তখন ক্ষমতা ফিরে আসে। — সম্পাঃ

যেমন ভূমিমালিকানার বিরুদ্ধে বুর্জোয়ার, তেমনি বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামের ক্ষেত্রেও প্রথম ও প্রধানতম প্রশ্ন হল অর্থনৈতিক স্বার্থ, রাজনৈতিক ক্ষমতা শুধু তা হাসিল করার উপায়মাত্র। অর্থনৈতিক অবস্থার কিংবা আরো নিখুঁতভাবে বললে, উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তনের ফলেই বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের উভয়েরই আবির্ভাব। প্রথমে গিল্ড কায়িক শিল্প থেকে হস্তশিল্প-কারখানা এবং তারপর কারখানা থেকে বাষ্পশক্তি এবং যন্ত্রশক্তি সহ বৃহদায়তন শিল্পে উৎক্রমণের ফলেই ওই দুটি শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছে। বিকাশের এক পর্যায়ে বুর্জোয়া শ্রেণী যে নূতন উৎপাদন-শক্তিকে চালু করে — প্রথমত শ্রমবিভাগ ও সামগ্রিকভাবে একই সাধারণ কারখানা ব্যবস্থায় অংশোৎপাদক বহু মেহনতীর মিলন -- এবং এই উৎপাদন-শক্তির মাধ্যমে বিকশিত বিনিময়-ব্যবস্থার সর্ত ও প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে পাওয়া ও আইন মারফৎ পবিত্র করা উৎপাদন-পদ্ধতি, অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক সমাজের গিল্ডগত বিশেষাধিকার এবং অসংখ্য ব্যক্তিগত ও স্থানীয় বিশেষাধিকার (বিশেষাধিকারহীন সম্প্রদায়গুলির কাছে এগুলি তখন কতকগুলি নিগড় মাত্র) আর খাপ খায় না। বুর্জোয়া শ্রেণীর মারফৎ সূচিত উৎপাদন-শক্তি বিদ্রোহ করল সামন্ততান্ত্রিক জমিদার ও গিল্ড মালিকদের দ্বারা সূচিত উৎপাদন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। তার ফলাফল সকলেই জানেন: ইংলন্ডের ক্ষেত্রে ক্রমশ এবং ফ্রান্সে এক আঘাতে সামন্ততান্ত্রিক বাধাগুলি চুরমার হয়ে গেল। জার্মানিতে এ প্রক্রিয়া এখনো শেষ হয়নি। কিন্তু ঠিক যেমন বিকাশের একটি পর্যায়ে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে কারখানা-শিল্পের সংঘাত বাধে, ঠিক তেমনি তার স্থানে প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া উৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্গে আজ ইতিমধ্যেই বৃহদায়তন উৎপাদনের সংঘাত দেখা দিয়েছে। এই ব্যবস্থার মধ্যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ এই শিল্প একদিকে জনসাধারণের বৃহত্তম অংশকে ক্রমশই প্রলেতারীয়তে পরিণত করে এবং অপরদিকে উৎপন্ন করে ক্রমবর্ধমান অবিক্রেয় উৎপন্ন। পারস্পরিক হেতুস্বরূপ অতি-উৎপাদন ও ব্যাপক দুর্দশা এই বিদঘুটে স্ববিরোধই হল বৃহদায়তন শিল্পের পরিণাম এবং তারই ফলে উৎপাদন-শক্তিকে মুক্তি দেবার জন্য উৎপাদন-ব্যবস্থায় এক পরিবর্তনের প্রয়োজন অনিবার্যভাবেই দেখা দেয়।

অতএব অন্তত আধুনিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রমাণ হয় যে, সমস্ত রাজনৈতিক সংগ্রামই হল শ্রেণী-সংগ্রাম এবং মুক্তিকামী সমস্ত শ্রেণী-সংগ্রামের রাজনৈতিক রূপ অনিবার্য হলেও — কেননা সমস্ত শ্রেণী-সংগ্রামই রাজনৈতিক সংগ্রাম -- তা শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নেই আবর্তিত। অতএব অন্তত এই ইতিহাসের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র, রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল গৌণ, এবং পৌর সমাজ (civil society), অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রটাই হল নির্ধারক। হেগেলও যে চিরাচরিত ধারণাকে শ্রদ্ধা করেছেন, সেই ধারণা অনুসারে রাষ্ট্রই হল নির্ধারক বস্তু এবং পৌর সমাজ হল তার দ্বারা

নির্ধারিত। বাহ্যরূপটা সেইরকমই। যেমন, ব্যক্তি বিশেষের কর্মের সমস্ত চালিকা শক্তি তার মস্তিষ্কের মাধ্যমে অবশ্য চালিত এবং তাকে সক্রিয় করার জন্য তার ইচ্ছা প্রেরণা রূপে পরিণত হতে বাধ্য, তেমনই পৌর সমাজের সমস্ত প্রয়োজন — যে শ্রেণীই সেখানে শাসক-শ্রেণী হোক না কেন — আইন হিসেবে সাধারণ বৈধতা লাভের জন্য রাষ্ট্রের ইচ্ছার মাধ্যমে অগ্রসর হতে বাধ্য। এটা হল অবস্থাটির আনুষ্ঠানিক দিক এবং সেই দিকটিই স্বতঃসিদ্ধ। তবুও প্রশ্ন ওঠে, এই নিছক অনুষ্ঠানমূলক ইচ্ছার — তা ব্যক্তিরই হোক আর রাষ্ট্রেরই হোক — সারবস্তু কী, এবং সেই সারবস্তু এল কোথা থেকে, আর কিছু না হয়ে ঠিক এই ইচ্ছাটাই বা কেন? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই যে. আধুনিক ইতিহাসে রাষ্ট্রের ইচ্ছা মোটের উপর নিয়ন্ত্রিত হয়েছে পৌর সমাজের পরিবর্তনশীল চাহিদার দ্বারা, এই শ্রেণী বা ওই শ্রেণীর কর্তৃত্ব দ্বারা, শেষ বিচারে উৎপাদন-শক্তির ও বিনিময়-সম্পর্কের বিকাশ দ্বারা।

কিন্তু যদি বিশাল উৎপাদন-উপায় ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ আমাদের এই আধুনিক কালেও রাষ্ট্রটা স্বাধীন বিকাশের এক স্বাধীন ক্ষেত্র না হয়, যদি শেষ পর্যন্ত সমাজ-জীবনের অর্থনৈতিক সর্ত দ্বারাই তার সত্তা ও বিকাশের ব্যাখ্যা করতে হয়, তাহলে পূর্ববর্তী সমস্ত যুগেই একথা আরো বেশি সত্য হতে বাধ্য যখন মানুষের বৈষয়িক জীবনোৎপাদনের এত প্রচুর উপায় ছিল না, এবং অতএব, যখন এই জাতীয় উৎপাদনের আবশ্যিকতা মানুষের উপর অনেক বেশি প্রভুত্ব বিস্তার করে থেকেছে। যদি আজকের দিনেও, বৃহদায়তন শিল্প ও রেলপথের যুগেও, রাষ্ট্র মোটের উপর উৎপাদন নিয়ন্ত্রণকারী শ্রেণীরই অর্থনৈতিক প্রয়োজনের ঘনীভূত প্রকাশমাত্র হয়, তাহলে যে যুগে প্রত্যেক পুরুষই তাদের সামগ্রিক আয়ুষ্কালের অনেক বেশি অংশ বৈষয়িক প্রয়োজন মেটাবার তাগিদে ব্যয় করতে বাধ্য ছিল এবং অতএব আজ আমাদের তুলনায় তার উপর ঢের বেশি নির্ভরশীল হতে বাধ্য ছিল, সে যুগে একথা নিশ্চয়ই অনেক বেশি সত্য হতে বাধ্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ববর্তী যুগের ইতিহাসকে গুরুত্ব সহকারে বিচার করলেই কথাটা সম্পূর্ণ পর্যাপ্তভাবে প্রমাণিত হয়। কিন্তু অবশ্যই এখানে সে বিচারের অবতারণা সম্ভব নয়।

রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় আইন যদি অর্থনৈতিক সম্পর্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে অবশ্যই নাগরিক আইনের বেলাতেও একই কথা, — প্রকৃতপক্ষে সেগুলি মূলতই কোনো এক নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে যা স্বাভাবিক, ব্যক্তি বিশেষদের মধ্যে সেই ধরনের প্রচলিত অর্থনৈতিক সম্পর্কের অনুমোদন মাত্র। কিন্তু যেভাবে এই অনুমোদন দেওয়া হয় তার রূপ অবশ্য নানারকম হতে পারে। সমগ্র জাতীয় বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, ইংলণ্ডে যেমন ঘটেছে, তেমনি ভাবে পুরানো সামন্ততান্ত্রিক আইনের রূপগুলিকে মোটের উপর অক্ষুণ্ণ রেখে তার মধ্যে বুর্জোয়া বিষয়বস্তু পুরে দেওয়া, বস্তুত

সামন্ততান্ত্রিক নামটার মধ্যে সরাসরি বুর্জোয়া অর্থ ধরে নেওয়া সম্ভব। কিংবা পশ্চিম মহাদেশীয় ইউরোপে যেমন ঘটেছে তাও হতে পারে, অর্থাৎ রোমক আইন, যা কিনা পৃথিবীতে পণ্য-উৎপাদকদের প্রথম বিশ্ব আইন এবং যে আইনে সরল পণ্যের মালিকদের মূল আইনগত সম্পর্কের অপরূপ সূক্ষ্ম পরিব্যাখ্যান বর্তমান (ক্রেতা-বিক্রেতা, উত্তমর্ণ-অধমর্ণ, চুক্তি, বাধ্যবাধকতা প্রভৃতি), তাকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ছোট বুর্জোয়ার ও তখনো আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজের উপকারার্থে, শুধুমাত্র আইনগত ব্যবহারের মাধ্যমে (সারা জার্মান আইন) এই আইনকে সেই সমাজের স্তরে নিয়ে আসা সম্ভব; কিংবা তথাকথিত আলোকপ্রাপ্ত ও নীতিবাগীশ ব্যবহারজীবীদের সহায়তায় এই আইনকে এ জাতীয় সমাজ স্তরের উপযোগী করে ঢেলে সেজে একটা বিশেষ আইনসংহিতায় পরিণত করা যায় — সে পরিস্থিতিতে এ সংকলন অবশ্য আইনের দৃষ্টিকোণ থেকেও হবে খারাপ (যথা, প্রাশিয়ার Landrecht)। আবার সেক্ষেত্রে বিরাট বুর্জোয়া বিপ্লবের পর এই একই রোমান আইনের ভিত্তিতে ফরাসী কোড সিভিল'এর মতো বুর্জোয়া সমাজের চিরায়ত আইনসংহিতাও রচনা করা সম্ভব। অতএব নাগরিক আইন যদি আইনগত রূপে সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের অভিব্যক্তি মাত্র হয়, তাহলে অবস্থার তারতম্য অনুসারে সে অভিব্যক্তি ভালোভাবেও হতে পারে, খারাপভাবেও হতে পারে।

রাষ্ট্রকে আমরা দেখি মানুষের উপর একটা প্রথম মতাদর্শগত শক্তি হিসেবে। আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য আক্রমণের বিরুদ্ধে সমাজের সাধারণ স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য সমাজ একটি সংস্থা গড়ে নেয়। সেই সংস্থা হল রাষ্ট্রশক্তি। গড়ে উঠতে না উঠতেই এ সংস্থা সমাজের প্রসঙ্গে নিজেকে স্বতন্ত্র করে নেয় এবং অবশ্য যতই তা একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর সংস্থায় পরিণত হয়, যতই প্রত্যক্ষভাবে সেই শ্রেণীর প্রাধান্য কায়েম করে, ততই বেশি করে রাষ্ট্রের এই স্বাতন্ত্র্য দেখা দেয়। শাসক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে নিপীড়িত শ্রেণীর সংগ্রাম অনিবার্যভাবেই রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হয়, এ সংগ্রাম সর্বাগ্রে শাসক-শ্রেণীর রাজনৈতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এই রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে তার অর্থনৈতিক ভিত্তির অন্তঃসম্পর্কের চেতনা ম্লান হয়ে যায় এবং এমনকি তা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হতে পারে। সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের বেলায় সম্পূর্ণভাবে তা না হলেও সে সংগ্রামের ঐতিহাসিকদের বেলায় প্রায় সর্বত্রই তা ঘটে: রোমক প্রজাতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম সংক্রান্ত প্রাচীন গ্রন্থকারদের মধ্যে একমাত্র আপিয়নই সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার করে আমাদের জানিয়েছেন, শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা কী ছিল, অর্থাৎ ভূসম্পত্তিই।

কিন্তু সমাজের সম্পর্কে রাষ্ট্র একবার স্বাধীন শক্তিতে পরিণত হবার পরই তা আরো একটি মতাদর্শের সৃষ্টি করে। বস্তুত পেশাদার রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় আইনের

(Public Law) তত্ত্বকার এবং নাগরিক আইনের (Private Law) আইনবিদদের কাছেই অর্থনৈতিক তথ্যের সঙ্গে সম্পর্কটা একেবারে হারিয়ে যায়। যেহেতু প্রতিটি ক্ষেত্রেই আইনের সমর্থন লাভের জন্য অর্থনৈতিক ঘটনার পক্ষে আইনগত প্রেরণার রূপ পরিগ্রহ প্রয়োজন, এবং তাতে করে যেহেতু প্রচলিত সামগ্রিক আইন ব্যবস্থার কথা মনে রাখা অবশ্যই প্রয়োজন, তাই আইনগত রূপটিই হয়ে ওঠে সর্বেসর্বা এবং অর্থনৈতিক বিষয়বস্তুটি শূন্য হয়ে যায়। রাষ্ট্রীয় আইন ও নাগরিক আইন স্বতন্ত্র দুটি ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়, যাদের উভয়েরই যেন নিজস্ব ও স্বাধীন ঐতিহাসিক বিকাশ আছে, সমস্ত আভ্যন্তরীণ বিরোধের সুসঙ্গত সমাধান ঘটিয়ে উভয়েরই যেন একটা ধারাবাহিক উপস্থাপন সম্ভব ও প্রয়োজন।

আরো উন্নত অর্থাৎ কিনা বৈষয়িক অর্থনৈতিক ভিত্তি থেকে আরো দূরে সরে যাওয়া মতাদর্শ গ্রহণ করে দর্শন ও ধর্মের রূপ। এক্ষেত্রে ধ্যানধারণার সঙ্গে তাদের বৈষয়িক অস্তিত্বের অন্তঃসম্পর্ক জটিল থেকে জটিলতর হয়ে দাঁড়ায় এবং মধ্যবর্তী যোগসূত্রগুলির দরুন হয়ে ওঠে অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর। অথচ এ পারস্পরিক সম্পর্ক বর্তমান। যেমন, পঞ্চদশ শতকের মধ্য থেকে সমগ্র রেনেসাঁস যুগ মূলতই নগরের অতএব বার্গারদের (নাগরিকদের) অবদান, তেমনি পরবর্তী নব জাগ্রত দর্শনের বেলাতেও একই কথা। তার বিষয়বস্তু মূলতই হল ছোট ও মাঝারি বার্গারদের পক্ষে বড়ো বুর্জোয়ায় বিকশিত হবার পর্যায়োপযোগী চিন্তার দার্শনিক অভিব্যক্তি মাত্র। গত শতাব্দীর ইংরেজ ও ফরাসী দার্শনিকদের বেলায়, যাঁরা বহু ক্ষেত্রে ছিলেন একাধারে দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ হিসেবে সমান, একথা সুস্পষ্ট; এবং ইতিপূর্বে হেগেলীয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমরা একথা প্রমাণ করেছি।

এখন আমরা সংক্ষেপে ধর্মের কথা আলোচনা করব, কেননা তা বৈষয়িক জীবন থেকে সবচেয়ে দূরে এবং আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় বাস্তব জীবনের সঙ্গে সবচেয়ে সম্পর্কহীন। অত্যন্ত আদিম যুগে মানুষের নিজের প্রকৃতি ও তার পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি বিষয়ে ভ্রান্ত ও আদিম ধারণা থেকে ধর্মের উৎপত্তি। কিন্তু প্রতিটি ভাবাদর্শের একবার উদ্ভব হবার পর তা চলতি ধারণা-সামগ্রীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিকশিত হয় এবং সেগুলিকে আরো বিকশিত করে। না হলে তা ভাবাদর্শই হত না, অর্থাৎ চিন্তার তেমন একটা কারবার হত না, যেখানে চিন্তাকে স্বাধীনভাবে বিকাশমান, নিজস্ব নিয়মাধীন একটা স্বাধীন সত্তা হিসাবে দেখা হচ্ছে। যাঁদের মাথার মধ্যে এই চিন্তাপদ্ধতি ক্রিয়াশীল সেই মানুষদের বৈষয়িক জীবনের অবস্থাই যে শেষ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়ার গতি নিয়ন্ত্রণ করে, সেকথা অনিবার্যভাবেই এই ব্যক্তিদের কাছে অজ্ঞাত থাকে, কেননা তা না হলে সমস্ত ভাবাদর্শটাই শেষ হয়ে যায়। ধর্মের এই আদি ধারণাগুলি প্রতিটি জ্ঞাতি-সম্পর্কমূলক জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই মোটের ওপর সাধারণ, কিন্তু গোষ্ঠীগুলি

বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে প্রতিটি বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর ভাগ্যে জীবনধারণের যে অবস্থা ঘটে সেই অবস্থা অনুসারে বিশেষ এক একটা গোষ্ঠীগত ধরনে তা বিকশিত হতে থাকে। কয়েকটি জাতিগোষ্ঠী প্রসঙ্গে, বিশেষত আর্য (তথাকথিত ইন্দো-ইউরোপীয়) গোষ্ঠীর প্রসঙ্গে এই বিকাশ পদ্ধতি খুঁটিয়ে বিচার করা হয়েছে তুলনামূলক পুরাণতত্ত্বে। প্রতিটি জাতির মধ্যে এই যে দেবতাদের বানানো হল তাঁরা জাতীয় দেবতা; যে জাতীয় সীমানা রক্ষা করা তাদের দায়িত্ব তার বাইরে তাঁদের প্রভাব যায়নি। এ সীমানার অন্যদিকে অন্য দেবতাদের অক্ষুণ্ণ প্রতিপত্তি। যতদিন পর্যন্ত একটি জাতির সত্তা বর্তমান শুধুমাত্র ততদিন পর্যন্তই লোকেদের কল্পনায় এই দেবতাদেরও অস্তিত্ব চলতে পারত; জাতির পতনের সঙ্গে দেবতাদেরও পতন হত। রোমক বিশ্ব সাম্রাজ্যের আঘাতে পুরানো জাতিসত্তাগুলির পতন ঘটেছিল, — এখানে এই সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই। ম্লান হয়ে গেল পুরানো জাতীয় দেবতাগুলি, এমনকি রোম নগরের সংকীর্ণ পরিধির পক্ষে উপযোগী রোমান দেবতারাও ক্ষয় পেল। বিশ্ব সাম্রাজ্যের পরিপূরক হিসেবে যে বিশ্ব ধর্মেরও প্রয়োজন, সেকথা স্পষ্ট প্রকাশ পেল রোমে স্থানীয় দেবতাদের সঙ্গে যে সব বিদেশী দেবতাদের সামান্যমাত্র সম্মান ছিল তাদের জন্য স্বীকৃতি এবং বেদী জোগানোর প্রচেষ্টায়। কিন্তু এইভাবে সম্রাটের আজ্ঞায় কোন বিশ্ব ধর্ম সৃষ্ট হয় না। ইতিমধ্যেই নিঃশব্দে সাধারণীকৃত প্রাচ্য এবং বিশেষত ইহুদী ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে স্থূল গ্রীক, বিশেষত স্টোইক দর্শনের মিশ্রণ থেকে নতুন বিশ্ব ধর্মের অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্মের আবির্ভাব হয়ে গেছে। আজ পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা করেই খ্রীষ্টধর্মের আদিরূপ আবিষ্কার করা সম্ভব, কেননা ধর্মটি আমাদের কাছে যে সরকারী চেহারায় এসে পৌঁছেছে সেটা হল তার সেই রাষ্ট্রধর্ম চেহারা, যাতে তাকে নিকাই সম্মেলন* ঢেলে সাজে। কিন্তু ২৫০ বছর পরে ধর্মটি যে রাষ্ট্রধর্মে পরিণত হল তা থেকেই প্রমাণ হয় ধর্মটি ছিল তখনকার অবস্থার কত অনুরূপ। মধ্য যুগে যে পরিমাণে সামন্ততন্ত্রের বিকাশ ঘটে চলল, সেই পরিমাণেই তার ধর্মগত পরিপূরক হিসেবে, সামন্ততান্ত্রিক সোপান ব্যবস্থা সহ, খ্রীষ্টধর্মও বিকশিত হতে লাগল। এবং বার্গাররা সতেজ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক ক্যাথলিকবাদের বিরুদ্ধে প্রটেস্টান্ট ধর্মদ্রোহ বেড়ে ওঠে যা প্রথম দেখা দেয় ফ্রান্সের দক্ষিণাংশে

* নিকাই সম্মেলন — ৩২৫ সালে এশিয়া মাইনরের নিকাই নগরে রোমের সম্রাট প্রথম কনস্টানটিনের আদেশে আহূত রোম সাম্রাজ্যের খ্রীষ্টীয় গির্জাগুলির বিশপদের তথাকথিত প্রথম বিশ্বসভা। এ সভা সমস্ত খ্রীষ্টানের পক্ষে বিশ্বাসের বাধ্যতামূলক কতকগুলি প্রতীক রচনা করে (অর্থডক্স খ্রীষ্টীয় চার্চের ধর্মবিশ্বাসের মূলনীতি) যা না মানলে রাষ্ট্রীয় অপরাধ বলে গণ্য হত। — সম্পাঃ

আলবিগেন্সদের* মধ্যে, যখন সেখানকার নগরগুলির চূড়ান্ত সমৃদ্ধি চলছে। দর্শন, রাজনীতি, আইন — ভাবাদর্শের বাকি সবকিছুকে মধ্য যুগ ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে সংযুক্ত করে এবং সেগুলিকে ধর্মতত্ত্বেরই অঙ্গ করে দেয়। তাই সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনই ধর্মতত্ত্বমূলক রূপ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। জনগণের অনুভূতির পুষ্টি হত শুধুমাত্র ধর্মের পথ্য দিয়ে। অতএব উদ্দাম কোন আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন ছিল তাদের নিজেদের স্বার্থকে ধর্মের সাজে সাজিয়ে পরিবেশন করা। এবং ঠিক যেমন ভাবে বার্গাররা শুরু থেকেই বিত্তহীন নাগরিক প্লেব, দিনমজুর ও নানাবিধ চাকরবাকরদের এক লেজুড় সৃষ্টি করেছিল, যারা কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক স্তরের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং যারা উত্তরকালের প্রলেতারিয়েতের অগ্রদূত, তেমনি অচিরে ধর্মদ্রোহও নরমপন্থী বার্গার ধর্মদ্রোহ এবং প্লেবীয় বৈপ্লবিক ধর্মদ্রোহ এই দুই ভাগে বিভক্ত হল, দ্বিতীয়টি এমনকি বার্গার ধর্মদ্রোহীদের কাছেও ঘৃণ্যই।

প্রটেস্টাণ্ট ধর্মদ্রোহের দুর্মরতা ছিল উঠতি বার্গারদের দুর্জয়তারই সহগ। বার্গাররা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠার পর সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতদের বিরুদ্ধে তাদের যে সংগ্রাম এ পর্যন্ত ছিল প্রধানতই স্থানীয়, তা জাতীয় আয়তন গ্রহণ করতে লাগল। প্রথম বড়ো সংগ্রাম ঘটল জার্মানিতে অর্থাৎ তথাকথিত রিফর্মেশন। বার্গাররা তখনো নিজেদের পতাকাতলে অবশিষ্ট বিপ্লবী সামাজিক বর্গকে — সহরের প্লেবীয়দের এবং গ্রামাঞ্চলের নিম্ন স্তরের অভিজাত শ্রেণী এবং কৃষকদের — মেলাবার মতো শক্তিশালী বা বিকশিত হয়নি। অভিজাত শ্রেণী প্রথমটায় পরাজিত হয়; বিদ্রোহী হয়ে ওঠে কৃষকেরা এবং সমগ্র বৈপ্লবিক সংগ্রামের সেইটিই হল সর্বোচ্চ বিন্দু। কিন্তু নগরগুলি তাদের অসহায়ভাবে পরিত্যাগ করে এবং এইভাবে ভূস্বামী রাজাদের সেনাবাহিনীর সামনে পরাজিত হয় বিপ্লব। এই রাজারাই আহরণ করে সবটুকু লাভ। তারপর তিন শতাব্দী ধরে ইতিহাসে স্বাধীন ও সক্রিয় অংশগ্রহণকারী জাতিগুলির মধ্য থেকে জার্মানি অদৃশ্য হয়। কিন্তু জার্মান লুথারের পাশে আবির্ভূত হন ফরাসী কালভাঁ। খাঁটি ফরাসীসুলভ তীক্ষ্ণতায় তিনি রিফর্মেশনের বুর্জোয়া চরিত্রটি পুরোভাগে আনেন, গির্জাগুলিকে প্রজাতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রূপ দেন। জার্মানিতে

---

* আলবিগেন্সরা — দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে দক্ষিণ ফ্রান্স ও উত্তর ইতালির শহরগুলিতে বহু প্রচলিত একটি ধর্মসম্প্রদায়। তার প্রধান কেন্দ্র ছিল দক্ষিণ ফ্রান্সের আলবি শহর। আলবিগেন্সরা ক্যাথলিকদের সাড়ম্বর উপাসনা পদ্ধতি ও গির্জার সোপানতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আসলে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে নগরের ব্যবসায়ী-কারুজীবীদের প্রতিবাদকেই ধর্মগত রূপ দেয়। গির্জার ভূসম্পত্তি লোকায়তকরণের প্রচেষ্টায় দক্ষিণ ফ্রান্সের অভিজাতদের একাংশও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। পোপ তৃতীয় ইনোকেন্তি ১২০৯ সালে আলবিগেন্সদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড অভিযান সংগঠিত করে। বিশ বছরের যুদ্ধ ও নির্মম পীড়নের ফলে এদের আন্দোলন দমিত হয়। — সম্পাঃ

ল্যুথারের রিফর্মেশন যখন অধঃপতিত হয়েছে এবং দেশকে ছারখার করেছে, তখন জেনেভা, হল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডে প্রজাতন্ত্রবাদীদের ধ্বজা হয়ে দাঁড়িয়েছে কালভাঁ-র রিফর্মেশন, হল্যান্ডকে তা মুক্তি দিয়েছে স্পেন ও জার্মান সাম্রাজ্যের আধিপত্য থেকে এবং ইংলন্ডে তখন বুর্জোয়া বিপ্লবের যে দ্বিতীয় অঙ্ক অভিনীত হচ্ছে তার জন্যে জুগিয়েছে মতাদর্শগত সাজপোষাক। সেইখানেই কালভাঁবাদ তখনকার বুর্জোয়া স্বার্থের সত্যকার ধর্মমূলক ছদ্মবেশ হিসেবে দেখা দেয় এবং এই কারণেই অভিজাত শ্রেণীর একাংশের সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণীর আপোসে যখন ১৬৮৯ সালের বিপ্লবের* পরিসমাপ্তি ঘটল তখন তা পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি। ইংরেজদের রাষ্ট্রীয় গির্জা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল, কিন্তু তা আর আগেকার ক্যাথলিকবাদের রূপে নয়, যেখানে রাজা পোপের ভূমিকা পালন করে, — প্রতিষ্ঠিত হল কালভাঁবাদ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত রূপে। পুরোনো রাষ্ট্রীয় গির্জায় ক্যাথলিক রবিবারে ফূর্তির উৎসব পালন করা হত এবং তা নিরানন্দ কালভাঁর রবিবারের বিরোধী ছিল। নতুন বুর্জোয়াভাবাপন্ন গির্জা দ্বিতীয় প্রথাটি প্রবর্তিত করল, আজো তা ইংলন্ডের শোভা হয়ে আছে।

ফ্রান্সে ১৬৮৫ সালে সংখ্যালঘিষ্ঠ কালভাঁপন্থীদের দমন করা হল এবং হয় তাদের ক্যাথলিকপন্থী করা হল আর না হয় বিতাড়ন করা হল দেশ থেকে। কিন্তু তাতে কীই বা লাভ হল? ইতিমধ্যেই স্বাধীন চিন্তাশীল পিয়ের বেল তাঁর কর্মজীবনের শীর্ষস্থানে পৌঁছেছেন এবং ১৬৯৪ সালে জন্ম হল ভল্টেয়ারের। চতুর্দশ লুই-এর জবরদস্ত ব্যবস্থার ফলে ফরাসী বুর্জোয়ার পক্ষে অধার্মিক এবং সম্পূর্ণ রাজনৈতিক রূপে তাদের বিপ্লব সংঘটন আরো সহজই হয়ে দাঁড়াল, বিকশিত বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে একমাত্র এই রূপটিই উপযোগী। জাতীয় পরিষদের আসনগুলি অধিকার করলেন প্রটেস্টান্টদের পরিবর্তে স্বাধীন চিন্তাশীলেরা। এইভাবে খ্রীষ্টধর্ম উপনীত হল তার চরম অবস্থায়। ভবিষ্যতে কোনো প্রগতিশীল শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষার মতাদর্শগত ভূষণ যোগাবার যোগ্যতা আর তার রইল না। ক্রমশই তা শুধুমাত্র শাসক-শ্রেণীগুলির একমাত্র সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াল এবং এটা তারা নেহাতই শাসনের উপায় হিসেবে, নিম্নতর শ্রেণীদের বন্ধনে রাখবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। তাছাড়া বিভিন্ন শাসক শ্রেণী তাদের নিজের নিজের উপযোগী ধর্ম ব্যবহার করে: ভূস্বামী অভিজাত শ্রেণী ব্যবহার করে ক্যাথলিক জেসুইটবাদ বা প্রটেস্টান্ট গোঁড়ামি; উদারপন্থী ও র‍্যাডিকেল বুর্জোয়া শ্রেণী ব্যবহার করে যুক্তিবাদ (rationalism)। এবং এইসব ভদ্রলোকেরা নিজেরা

* ১৬৮৮ সালে ইংলন্ডের কুদেতার কথা বলা হচ্ছে যাতে স্টুয়ার্ট বংশীয় দ্বিতীয় জেকব বিতাড়িত হন ও ১৬৮৯ সালে হল্যান্ড প্রজাতন্ত্রের অরেঞ্জের তৃতীয় ভিলহেল্‌ম রাজা হিসাবে সিংহাসনে বসেন। ১৬৮৯ সাল থেকে ইংলন্ডে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়, যার পেছনে ছিল ভূস্বামী অভিজাতদের সঙ্গে বৃহৎ বুর্জোয়াদের আপোস। — সম্পাঃ

নিজেদের নির্দিষ্ট ধর্মগুলিতে বিশ্বাস করেন কি না করেন, তাতে কিছুই এসে যায় না।

অতএব আমরা দেখছি: ধর্ম একবার গড়ে ওঠার পর তার মধ্যে ঐতিহ্যগত উপাদান বর্তমান থাকে, কারণ মতাদর্শের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঐতিহ্য হল একটি মস্ত রক্ষণশীল শক্তি। কিন্তু এই উপাদানের যে রূপান্তর ঘটে তা আসে শ্রেণী-সম্পর্ক থেকে, অর্থাৎ যে মানুষেরা এই রূপান্তর ঘটায় তাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক থেকে। এবং বর্তমানে এইটুকু কথাই যথেষ্ট।

উপরে ইতিহাস সংক্রান্ত মার্কসীয় ধারণার শুধুমাত্র একটি সাধারণ খসড়া দেওয়াই সম্ভব, বড় জোর তার সঙ্গে মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্তও। তার প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে ইতিহাস থেকেই, এবং এই প্রসঙ্গে আমি বলতে পারি যে, অন্যান্য রচনায় তা পর্যাপ্তভাবেই পাওয়া যাবে। কিন্তু এই ধারণা থেকে ইতিহাসের ক্ষেত্রে দর্শনের পরিসমাপ্তি ঘটে, ঠিক যেমন প্রকৃতি সংক্রান্ত দ্বান্দ্বিক ধারণার ফলে সমস্ত প্রাকৃতিক দর্শন অপ্রয়োজনীয় এবং অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এখন আর কোথাওই আর আমাদের মস্তিষ্ক থেকে অন্তঃসম্পর্ক আবিষ্কারের প্রশ্ন থাকে না, তার পরিবর্তে এগুলিকে আবিষ্কার করতে হয় বাস্তব ঘটনা থেকেই। প্রকৃতি এবং ইতিহাসের ক্ষেত্র থেকে বহিষ্কৃত হয়ে দর্শনের জন্য যেটুকু ক্ষেত্র বাকি থাকে, -- সেটুকু যদি আদৌ থাকে — সেটা হল বিশুদ্ধ চিন্তার ক্ষেত্র: চিন্তাপদ্ধতির নিয়মের তত্ত্ব, যুক্তিবিদ্যা ও দ্বন্দ্বতত্ত্ব।

* * *

১৮৪৮-এর বিপ্লবের পর থেকে 'শিক্ষিত' জার্মানি তত্ত্বকে বিদায় জানিয়ে প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। কায়িক শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র উৎপাদন এবং হস্তশিল্প কারখানার স্থানে এল খাঁটি বৃহদায়তন শিল্প। আবার বিশ্ববাজারে আবির্ভূত হল জার্মানি। ছোট ছোট রাষ্ট্র, সামন্ততন্ত্রের জের এবং আমলাতান্ত্রিক পরিচালন ব্যবস্থার ফলে এই বিকাশের বিরুদ্ধে প্রধানতম যে সব প্রতিবন্ধক ছিল, অন্তত সেগুলিকে নতুন ক্ষুদ্র জার্মান সাম্রাজ্য* দূর করেছে। কিন্তু স্পেকুলেশন যতই দার্শনিকের পাঠাগার ছেড়ে ফাটকাবাজারে গিয়ে মন্দির স্থাপন করতে লাগল ততই শিক্ষিত জার্মানি হারাল তার তত্ত্বের মহান আগ্রহ -- লব্ধ ফলাফল ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য হবে কিনা, তা পুলিস কর্তৃপক্ষের কাছে অপ্রিয় হবে কিনা, এসব চিন্তার অপেক্ষা না করে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক অন্বেষণের প্রবণতা, অথচ গভীরতম রাজনৈতিক অবমাননার দিনেও এই

* প্রুশীয় নেতৃত্বে ১৮৭১ সালে (অস্ট্রিয়া বাদে) যে জার্মান সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল এই নামের দ্বারা তাই বোঝানো হয়েছে। — সম্পাঃ

শক্তিই ছিল জার্মানির গৌরব। একথা ঠিক যে, বিশেষত খুঁটিনাটি গবেষণার ক্ষেত্রে জার্মানির সরকারী প্রকৃতিবিজ্ঞান তখনো প্রথম শ্রেণীতেই তার স্থান অধিকার করে রইল। কিন্তু মার্কিন পত্রিকা *Science* ন্যায্যতই মন্তব্য করেছে যে, বিচ্ছিন্ন সব তথ্যের মধ্যে ব্যাপক সম্পর্কসূত্র স্থাপন এবং সেগুলি থেকে সাধারণ নিয়ম টানার ক্ষেত্রে আগে যেমন জার্মানিতে প্রধান কাজ হত, তার বদলে এখন ইংলণ্ডে প্রধান কাজ হচ্ছে। এবং ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের তথা দর্শনেরও ক্ষেত্রে চিরায়ত দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে আগেকার সেই নির্ভিক তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের উৎসাহ। তার স্থান অধিকার করেছে শূণ্যেগর্ভ পল্লবগ্রাহিতা এবং পদ ও রোজগার নিয়ে সশঙ্ক ভাবনা, এমনকি ইতরতম চাকুরি মনোবৃত্তি পর্যন্ত। এই বিজ্ঞানগুলির সরকারি প্রতিনিধিরা হয়ে দাঁড়িয়েছেন বুর্জোয়া শ্রেণীর এবং বর্তমান রাষ্ট্রের অনাবৃত মতাদর্শগত প্রতিনিধি, কিন্তু তা এমন একটা যুগে যখন উভয়ই হল শ্রমিক শ্রেণীর প্রকাশ্য বিরোধী।

একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে তত্ত্বের প্রতি জার্মান আগ্রহ অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এখান থেকে তাকে উচ্ছেদ করা যায় না। এখানে উচ্চ পদের জন্য, মুনাফার জন্য বা উপর মহল থেকে সদয় দাক্ষিণ্যলাভের জন্য কোনো মাথাব্যথা নেই। অপরপক্ষে, বিজ্ঞান যতই নির্ভয় ও নিরাসক্তভাবে অগ্রসর হয়, ততই দেখা দেয় শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তার সঙ্গতি। যে নব ধারা অনুসারে সমগ্র সমাজ ইতিহাস ব্যাখ্যার মূল সূত্র পাওয়া যাবে শ্রমবিকাশের ইতিহাসের মধ্যেই, তা শুরু থেকেই প্রধানত শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিই আবেদন করেছে এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেই যে সাড়া পেয়েছে, সরকারী বিজ্ঞানের কাছ থেকে তা এই সাড়া চায়ওনি, প্রত্যাশাও করেনি। জার্মান শ্রমিক আন্দোলনই জার্মান চিরায়ত দর্শনের উত্তরাধিকারী।

১৮৮৬ সালে এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত *Neue Zeit* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ সালে এবং স্বতন্ত্র পুস্তক হিসাবে প্রকাশিত হয় স্তুৎগার্তে, ১৮৮৮ সালে

১৮৮৮ সালের সংস্করণ অনুসারে মুদ্রিত জার্মান থেকে ইংরাজী অনুবাদের ভাষান্তর

কার্ল মার্কস

ফয়েরবাখ সম্বন্ধে থিসিসসমূহ

১

পূর্ববর্তী সমস্ত বস্তুবাদের — এবং ফয়েরবাখের বস্তুবাদও তার অন্তর্ভুক্ত — প্রধান দোষ এই যে, তাতে বস্তু (gegenstand), বাস্তবতা বা সংবেদ্যতাকে কেবল **বিষয়** (object) রূপে বা **ধ্যান** রূপে ধরা হয়েছে, **মানবিক সংবেদনগত ক্রিয়া** হিসাবে, **ব্যবহারিক কর্ম** হিসাবে দেখা হয়নি, কর্তার দিক থেকে (subjectively) দেখা হয়নি। ফলে বস্তুবাদের বিপরীতে **সক্রিয়** দিকটি বিকশিত করেছে ভাববাদ, কিন্তু তা কেবল অমূর্তভাবে, কেননা অবশ্যই ভাববাদ বাস্তব সংবেদনগত ক্রিয়া ঠিক যা সেই ভাবে তাকে জানে না। ফয়েরবাখ চান সংবেদনগত বিষয়কে চিন্তাগত বিষয় থেকে সত্যই পৃথক করতে, কিন্তু খোদ মানবিক ক্রিয়াটাকে তিনি **বস্তুগত** (gegenständliche) ক্রিয়া হিসাবে ধরেন না। অতএব 'খ্রীষ্টধর্মের মর্মবস্তু' গ্রন্থে তিনি একমাত্র তাত্ত্বিক ক্রিয়াকেই খাঁটি মানবিক ক্রিয়া বলে গ্রহণ করেন; অপরপক্ষে ব্যবহারিক কর্মকে তিনি তার নোংরা দোকানদারী চেহারায় কল্পনা করেন ও সেইভাবেই তাকে স্থিরবদ্ধ করে রাখেন। তাই 'বৈপ্লবিক' 'ব্যবহারিক-সমালোচনামূলক' ক্রিয়ার তাৎপর্য তিনি বুঝতে পারেন না।

২

মানবিক চিন্তার বস্তুগত সত্য আছে কিনা এ প্রশ্ন তত্ত্বগত নয়, **ব্যবহারিক**। ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানুষকে তার চিন্তার সত্যতাকে অর্থাৎ বাস্তবতা ও শক্তিকে, ইহমুখিতাকে প্রমাণ করতে হবে। ব্যবহার থেকে বিচ্ছিন্ন, চিন্তার বাস্তবতা ও অবাস্তবতা সংক্রান্ত প্রশ্ন নেহাৎই **পাণ্ডিতী** কুতর্ক।

৩

মানুষ পরিবেশ ও পরিপালনের ফল, অতএব পরিবর্তিত মানুষ হল পরিবর্তিত পরিবেশ ও পরিপালনেরই ফল, এই বস্তুবাদী মতবাদ ভুলে যায় যে, মানুষই পরিবেশকে পরিবর্তিত করে এবং স্বয়ং পরিপালককেই পরিপালিত করা প্রয়োজন। অতএব এই মতবাদ অনিবার্যভাবেই সমাজকে দুই অংশে ভাগ করে, তার মধ্যে একাংশ সমাজের ঊর্ধ্বে (যথা, রবার্ট ওয়েনের ক্ষেত্রে)।

পরিবেশের পরিবর্তন এবং মানবিক ক্রিয়ার পরিবর্তনের মধ্যে মিলটাকে ধারণা করা ও যুক্তিসঙ্গতভাবে বোঝা সম্ভব একমাত্র **বিপ্লবী ব্যবহারিক কর্ম** হিসাবে।

৪

ফয়েরবাখ শুরু করেন ধর্মমূলক আত্ম-অন্যীভবন — জগৎকে একটা ধর্মীয় কল্পিত জগৎ ও বাস্তব জগৎ রূপে দ্বিগুণিত করার ঘটনাটা থেকে। ধর্মীয় জগৎকে তার ইহলৌকিক ভিত্তিতে পর্যবসিত করাই হল তাঁর কাজ। তিনি এইটে উপেক্ষা করেন যে, উক্ত কার্য সমাধার পর প্রধানতম কাজটিই বাকি থেকে যায়; কেননা, ইহলৌকিক ভিত্তিটি যে নিজের কাছ থেকে নিজে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক স্বাধীন এলাকা হিসাবে মেঘলোকে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে, এই ঘটনার একমাত্র প্রকৃত ব্যাখ্যা হল এই ইহলৌকিক ভিত্তিটিরই স্ববিভাগ এবং স্ববিরোধিতা। অতএব শেষোক্তটাকে প্রথমে তার স্ববিরোধের দিক থেকে বুঝতে হবে, তারপর এই বিরোধ দূর করে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার বৈপ্লবিক পরিবর্তন করতে হবে। ফলে, যেমন ধরা যাক, পবিত্র পরিবারের রহস্য পার্থিব পরিবারে আবিষ্কৃত হবার পর, পার্থিব পরিবারটিকেই তত্ত্বগতভাবে সমালোচনা করা এবং ব্যবহারিক বৈপ্লবিকভাবে পরিবর্তিত করা প্রয়োজন।

৫

অমূর্ত চিন্তায় অতৃপ্ত হয়ে ফয়েরবাখ **সংবেদনগত ধ্যানের** দ্বারস্থ হন, কিন্তু সংবেদ্যতাকে তিনি **ব্যবহারিক,** মানবিক সংবেদনগত ক্রিয়া রূপে দেখেন না।

৬

ধর্মীয় সারার্থকে ফয়েরবাখ **মানবীয়** সারার্থে পর্যবসিত করেন। কিন্তু মানবীয় সারার্থ এমন একটা অমূর্ত কিছু নয় যা প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের মধ্যে নিহিত। বাস্তবপক্ষে তা হল সামাজিক সম্পর্কসমূহের যোগফল।

এই আসল সারার্থের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হননি বলেই ফয়েরবাখ বাধ্য হন:

১) ঐতিহাসিক বিকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে ও ধর্মীয় অনুভূতিকে (Germüt) আলাদা কিছু একটা জিনিস হিসাবে স্থিরবদ্ধ করে তুলতে এবং একটা অমূর্ত — **বিচ্ছিন্ন** — ব্যক্তি মানবকে ধরে নিতে।

২) তাই মানবিক সারার্থকে তাঁর পক্ষে কেবল 'বংশসত্তা' (genus) হিসাবে, একটি আভ্যন্তরিক মূক সাধারণ গুণ হিসাবে গ্রহণ করাই সম্ভব যা দিয়ে বহু ব্যক্তি মানুষকে মেলানো যায় কেবল **প্রাকৃতিক** বন্ধনে।

৭

তাই ফয়েরবাখ দেখতে পান না যে, 'ধর্মীয় অনুভূতি' নিজেই হল একটা **সামাজিক সৃষ্টি** এবং যে অমূর্ত ব্যক্তিটির বিশ্লেষণ তিনি করেন সেও প্রকৃতপক্ষে কোনো একটা নির্দিষ্ট সমাজরূপে অন্তর্ভুক্ত।

৮

সামাজিক জীবন মূলতই **ব্যবহারিক**। যে সব রহস্য তত্ত্বকে অতীন্দ্রিয়বাদের পথে বিভ্রান্ত করে সেই সব রহস্যেরই যুক্তিসিদ্ধ সমাধান পাওয়া যায় মানবিক ব্যবহারিক কর্মের মধ্যে এবং তা প্রণিধানের মধ্যে।

৯

মননসর্বস্ব বস্তুবাদের অর্থাৎ যে বস্তুবাদ সংবেদ্যতাকে ব্যবহারিক কর্ম হিসাবে বোঝে না, তার অর্জিত চরম বিন্দুটি হল 'নাগরিক সমাজের' অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি বিশেষকে নিয়ে ধ্যান।

১০

পুরনো বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ হল **'নাগরিক'** সমাজ; নূতন বস্তুবাদেব দৃষ্টিকোণ হল **মানবিক সমাজ** বা সমাজীকৃত মানবজাতি।

১১

দার্শনিকেরা কেবল নানাভাবে জগৎকে **ব্যাখ্যা** করেছেন, কিন্তু আসল কথা হল তাকে **পরিবর্তন** করা।

১৮৪৫ সালের বসন্তকালে মার্কস কর্তৃক লিখিত
১৮৮৮ সালে এঙ্গেলস কর্তৃক তাঁর 'লুদভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান' গ্রন্থেব স্বতন্ত্র সংস্করণে পরিশিষ্ট হিসাবে প্রথম প্রকাশিত

মার্কসের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা ১৮৮৮ সালের সংস্করণের পাঠ অনুসারে মুদ্রিত
জার্মান থেকে ইংরেজী অনুবাদের ভাষান্তর

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

'ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' বইয়ের ভূমিকা

যে বইটির ইংরেজী অনুবাদ বর্তমানে পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছে, জার্মানিতে তা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৪৫ সালে। লেখক সে সময় ছিলেন তরুণ, ২৪ বৎসর বয়স, এবং সেই তারুণ্যের ছাপ ভালো এবং মন্দ দিক মিলিয়ে তাঁর লেখায় পরিস্ফুট। এর ভালো বা মন্দ কোন দিকের জন্যই লেখক লজ্জিত নন। ১৮৮৫ সালে জনৈকা আমেরিকান মহিলা, শ্রীমতী ফ্লরেন্স কেলি-ভিশ্‌নেভেৎস্কি কর্তৃক বইটি ইংরেজিতে অনূদিত এবং পর বৎসর নিউ ইয়র্কে প্রকাশিত হয়। আমেরিকান সংস্করণটি অতলান্তিকের এপারে খুব ব্যাপকভাবে প্রচারিতও হয়নি, আর তাছাড়া বর্তমানে সেটি নিঃশেষ হয়ে গেছে বললেই হয়, তাই সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষের পূর্ণসম্মতিক্রমে বর্তমান সর্বস্বত্বসংরক্ষিত ইংরেজী সংস্করণটি প্রকাশ করা হচ্ছে।

আমেরিকান সংস্করণটির জন্য লেখক ইংরেজি ভাষায় একটি নতুন ভূমিকা এবং পরে একটি পরিশিষ্ট লিখে দেন। প্রথমটির সঙ্গে বইয়ের বিষয়বস্তুর বিশেষ কোনো সম্পর্ক ছিল না; তাতে তদানীন্তন আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনের বিষয় আলোচনা করা হয়েছিল। তাই বর্তমান সংস্করণে অপ্রাসঙ্গিক বোধে সেটি বাদ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় — মূল ভূমিকাটি — অনেকখানি ব্যবহার করা হয়েছে বর্তমান মুখবন্ধে।

ইংলণ্ডের কথা বিচার করলে, এই বইয়ে বর্ণিত অবস্থা বর্তমানে বহুদিক থেকে অতীতে পর্যবসিত হয়েছে। আমাদের কোনো প্রচলিত পুঁথিতে স্পষ্টভাবে স্বীকার না করলেও আধুনিক অর্থশাস্ত্রে আজ এ নিয়ম বলবৎ যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন যত বৃহদায়তনে চলে, ততই ছোটখাট চুরি জোচ্চুরির নানা কৌশল — যা তার প্রাথমিক স্তরের বৈশিষ্ট্য, — সেগুলিকে সমর্থন করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। ইউরোপে ব্যবসার সর্বনিম্ন স্তরের প্রতিনিধি পোলীয় ইহুদির যেসব ছ্যাঁচড়া ব্যবসা-কৌশল নিজের দেশে বেশ কার্যকরী এবং সাধারণভাবে প্রচলিত, বার্লিন বা হামবুর্গে এসে সে দেখে সেগুলিই আবার নিতান্ত সেকেলে এবং অকেজো হয়ে পড়েছে। এবং ঠিক তেমনিই আবার, হামবুর্গ বা বার্লিন থেকে আগত ইহুদি বা খ্রীষ্টান দালালদেরও ম্যাঞ্চেস্টারের শেয়ার বাজারে কয়েকমাস ঘুরে এ চৈতন্য হয় যে, কাপাসের সুতো বা

কাপড় সস্তায় কিনতে হলে তাদেরও ঐসব সামান্য পালিশ করা কিন্তু আসলে হীন ফন্দী-ফিকির ও অপকৌশলগুলি পরিত্যাগ করাই শ্রেয়, যদিও তাদের নিজেদের দেশে এগুলিই বুদ্ধিমত্তার পরাকাষ্ঠা বলে বিবেচিত হয়। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই যে, কোনো বড়রকমের বাজারে, যেখানে সময়ই টাকা, যেখানে কেবলমাত্র সময় এবং হাঙ্গামা বাঁচাবার জন্যই ব্যবসাগত নীতির একটা মান অনিবার্যভাবেই গড়ে ওঠে, সেখানে ঐসব কৌশল আর কাজ দেয় না। কারখানা মালিক আর তার মজুরদের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

১৮৪৭ সালের সংকটের পর, ব্যবসা-বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন থেকে এক নতুন শিল্পযুগের উন্মেষ হয়। ইংলণ্ডের শিল্প ও বাণিজ্য যে খোলা জমি চেয়েছিল, শস্য আইন (Corn Laws)* বাতিল ও তার পরবর্তী বিভিন্ন আর্থিক সংস্কারের ফলে তা পেয়ে গেল। তারপরই একের পর এক দ্রুতগতিতে এল কালিফোর্নিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় স্বর্ণখনি আবিষ্কার। বিভিন্ন ঔপনিবেশিক বাজারে ইংলণ্ডের শিল্পজাত পণ্য গ্রহণের ক্ষমতা দ্রুতহারে বেড়ে চলল। ভারতে লক্ষ লক্ষ তন্তুবায় অবশেষে ল্যাংকাশায়ারের যন্ত্রচালিত তাঁতের দ্বারা ধ্বংস হয়ে গেল। ক্রমেই বেশি করে উন্মুক্ত হতে থাকল চীন। সর্বোপরি, যে যুক্তরাষ্ট্র তখনও ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে ঔপনিবেশিক বাজার মাত্র, কিন্তু সবচেয়ে বড় বাজার, সেখানে এই দ্রুতবিকাশশীল দেশের পক্ষেও বিস্ময়কর এক অর্থনৈতিক উন্নতি দেখা দিল। এবং অবশেষে, পূর্ববর্তী যুগে প্রবর্তিত নতুন যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলি — রেলপথ ও বাষ্পীয়পোত — এখন আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে সংগঠিত হল; তারই ফলে, এতদিন যে বিশ্ববাজারের সুপ্ত সম্ভাবনামাত্র ছিল তা বাস্তবিক রূপ নিল। গোড়াতে এই বিশ্ববাজার ছিল একটি শিল্পকেন্দ্র ইংলণ্ডকে ঘিরে কয়েকটি প্রধানত বা সম্পূর্ণত কৃষিপ্রধান দেশ নিয়ে গঠিত। ইংলণ্ডই এদের উৎপন্ন কাঁচামালের উদ্বৃত্তের বেশীর ভাগটা নিত এবং পরিবর্তে এদের শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদার অধিকাংশও সরবরাহ করত। তাই শিল্পক্ষেত্রে ইংলণ্ডের যে এমন বিপুল ও অতুলনীয় অগ্রগতি হল, যার তুলনায় ১৮৪৪-এর অবস্থাও আজ আমাদের কাছে আদিম ও তুচ্ছ মনে হচ্ছে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এবং যে-অনুপাতে এই অগ্রগতি হল, বৃহদায়তন শিল্পও ততই নীতিনিষ্ঠ হয়ে উঠল বলে মনে হল। মজুরদের কাছ থেকে ছ্যাঁচড়া চুরি করে মালিকে মালিকে প্রতিযোগিতায় আর কোন লাভ রইল না। টাকা করার এই হীন পথকে ব্যবসা ইতিমধ্যে অতিক্রম করে

* শস্য আইন রদের বিল গৃহীত হয় ১৮৪৬ সালের জুন মাসে। বিদেশ থেকে শস্য আমদানি সংকুচিত বা নিষিদ্ধ করার এই শস্য আইন ইংলণ্ডে চালু হয়েছিল বৃহৎ ভূমিমালিক জমিদারদের স্বার্থে। বাণিজ্যের স্বাধীনতা ধ্বনি নিয়ে এ আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায় শিল্প বুর্জোয়ারা, শস্য আইন রদের বিল গৃহীত হওয়ায় তাদের জয় সূচিত হয়। — সম্পাঃ

এসেছে; লক্ষপতি মালিকের আর এসব কাজ পোষায় না, যে-কোন রকমে এক আধ পয়সা করে নিতে পারলেই যেসব ছোট ব্যবসায়ীরা সন্তুষ্ট, তাদেরই মধ্যে প্রতিযোগিতা জীইয়ে রাখা ছাড়া এসবের আর কোন উপযোগিতা রইল না। এইভাবে ট্রাকসিসটেম* (trucksystem) দমন করা হল, দশঘণ্টা কাজের আইন পাশ হল, আরও একাধিক ছোটখাট সংস্কার প্রবর্তিত হল। এ ব্যবস্থাগুলি অবাধ বাণিজ্য ও বল্গাহীন প্রতিযোগিতার একান্ত বিরোধী, কিন্তু ঠিক সেই পরিমাণেই কম সৌভাগ্যশালী ভাইদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অতিকায় পুঁজিপতির অনুকূল। উপরন্তু প্রতিষ্ঠান যত বড়, এবং তার সঙ্গে কর্মরত লোকের সংখ্যা যত বেশী, মালিক ও মজুরের মধ্যে প্রতিটি বিরোধে ক্ষতি ও অসুবিধার পরিমাণও ততই বেশী। আর এইভাবেই মালিকদের মধ্যে, বিশেষত বড় মালিকদের মধ্যে এক নতুন মনোভাব দেখা দিল, তারা অপ্রয়োজনীয় বিবাদ বিসম্বাদ এড়াতে, ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্ব ও ক্ষমতা মেনে নিতে এবং শেষ পর্যন্ত, সুবিধামত সময়ে হলে এমনকি ধর্মঘটের মধ্যেও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির শক্তিশালী উপায় আবিষ্কার করতে শিখল। গোড়ার দিকে যে বৃহত্তম শিল্পপতিরাই ছিল শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের নায়ক তারাই এবার শান্তি ও সামঞ্জস্য প্রচারে অগ্রণী হয়ে উঠল। তার কারণও ছিল। ন্যায় ও হিতৈষার বেদীমূলে এতসব ত্যাগ প্রকৃতপক্ষে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে পুঁজির কেন্দ্রীকরণ এবং তাদের যেসব ছোট ছোট প্রতিযোগীরা এই ধরনের উপরি পাওনা ছাড়া আয়ব্যয়ের সমতারক্ষা করতে পারে না, তাদের আরও সহজে এবং নিরাপদে চূর্ণ করার উপায় ছাড়া আর কিছু নয়। এদের কাছে আগেকার মতো যৎসামান্য অতিরিক্ত জবরদস্তি আদায়ের কোন গুরুত্ব আর রইল না, বরং সেগুলো বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এইভাবে, প্রথমদিকে যেসব ছোটখাট অভাব অভিযোগ শ্রমিকদের অবস্থাকে আরও বিষময় করে তুলত, সেগুলি দূর করার পক্ষে পুঁজিবাদী ভিত্তিতে উৎপাদন বিকাশটাই যথেষ্ট বলে দেখা গেল, অন্তত প্রধান প্রধান শিল্পের ক্ষেত্রে, কেননা অপেক্ষাকৃত কমগুরুত্বপূর্ণ শাখায় অবস্থাটা মোটেই অনুরূপ নয়। এবং শ্রমিক শ্রেণীর দুর্দশার কারণ যে এই ছোটখাট অভাব অভিযোগের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না, যাবে **পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই মধ্যে**, এই মহৎ কেন্দ্রীয় সত্যটা এইভাবেই ক্রমে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মজুরি-শ্রমিক দৈনিক একটা নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে মালিকের কাছে তার শ্রমশক্তি বিক্রয় করে। কয়েকঘণ্টা কাজের পরই সে সেই অর্থের মূল্য পুনরুৎপাদন করে ফেলে; কিন্তু শ্রমদিন পূরণ করার জন্য তাকে পরপর আরও কয়েকঘণ্টা কাজ করতে হবে, এই হচ্ছে তার চুক্তির সারকথা, এবং এই অতিরিক্ত শ্রমের

* ট্রাকসিসটেম — কারখানা মালিকের নিজস্ব দোকান থেকে মাল দিয়ে মজুরদের মজুরি পরিশোধের প্রথা। মজুরদের নগদ টাকা দেবার বদলে এই সব দোকান থেকে উচ্চ মূল্যের ও নিকৃষ্ট ধরনের মাল নিতে বাধ্য করত মালিকেরা। — সম্পাঃ

ঘণ্টাগুলিতে সে যে মূল্য উৎপাদন করে সেটাই হচ্ছে উদ্বৃত্ত মূল্য. এর জন্য মালিককে কোনো দাম দিতে হয় না, অথচ এটা মালিকেরই পকেটে যায়। যে ব্যবস্থা সভ্য সমাজকে একদিকে সমস্ত উৎপাদন ও জীবনধারণের সমস্ত উপায়ের মালিক মুষ্টিমেয় কয়েকজন রথ্‌সচাইল্ড ও ভ্যান্ডারবিল্ট এবং অন্যদিকে নিজেদের শ্রমশক্তি ছাড়া আর কিছুরই মালিক নয় এমন অগণিত মজুরি-শ্রমিকের মধ্যে বিভক্ত করে দিচ্ছে, এই হচ্ছে সেই ব্যবস্থার ভিত্তি। ১৮৪৭ সাল থেকে ইংলণ্ডে পুঁজিবাদের বিকাশ এই সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে যে, এ কোনো ছোটখাট অভাব অভিযোগের ফল নয়, এ হল ব্যবস্থারই ফল।

আবার কলেরা, টাইফাস, বসন্ত প্রভৃতি মহামারির বারবার প্রাদুর্ভাব ব্রিটিশ বুর্জোয়াকে শিখিয়েছে যে, নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে এইসব রোগের কবল থেকে বাঁচাতে হলে তার ছোটবড় শহরগুলির জন্য স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থার জরুরী প্রয়োজন। তাই এই বইয়ে বর্ণিত সবচেয়ে তীব্র অনাচারগুলি হয় অদৃশ্য হয়েছে, নয়ত তেমন চোখে পড়ে না। জলনিকাশ ব্যবস্থার প্রবর্তন বা উন্নয়ন হয়েছে; আমি যেসব অতিজঘন্য বস্তির বিবরণ দিতে বাধ্য হয়েছিলাম, তার অনেকগুলির উপর দিয়ে চওড়া রাস্তা পাকা হয়েছে। 'ছোট আয়র্ল্যাণ্ড'* অদৃশ্য হয়েছে এবং উচ্ছেদ তালিকায় এরপরই 'সেভেন ডায়ালসের'** স্থান। কিন্তু তাতে কী হল? ১৮৪৪-এ যেসব পাড়াকে আমি কাব্যময় বলে বর্ণনা করতে পেরেছিলাম, শহরের কলেবরবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেসব পাড়ার অনেকগুলিই আজ সেই একই জীর্ণতা, অসুবিধা ও দুর্দশার মধ্যে নেমে এসেছে। তফাৎ কেবল এই যে, আজকাল আর শুয়োর বা আবর্জনার স্তূপ বরদাস্ত করা হয় না। শ্রমিক শ্রেণীর দুর্দশাকে ঢাকা দেবার কৌশলে বুর্জোয়া শ্রেণী আরও অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর বাসস্থানের ব্যাপারে বিশেষ কোনো উন্নতি যে হয়নি তা 'গরিবদের গৃহব্যবস্থা সম্পর্কে' ১৮৮৫-এর রাজকীয় কমিশনের রিপোর্টেই বেশ প্রমাণিত হয়েছে। অন্যান্য ব্যাপারেও সেই একই অবস্থা। পুলিশী বিধি নির্দেশের খুবই ছড়াছড়ি, কিন্তু তা দিয়ে শ্রমিকদের দুরবস্থাকে বেড়াবন্দী করে রাখা যেতে পারে, দূর করা যায় না।

পুঁজিবাদী শোষণের যৌবনের যে বর্ণনা আমি দিয়েছি, ইংলণ্ড এইভাবে তাকে অতিক্রম করে গেলেও অন্যান্য দেশ সবেমাত্র সে স্তরে পৌঁছেছে। ফ্রান্স, জার্মানি এবং বিশেষত আমেরিকা আজ বিপজ্জনক প্রতিযোগী, -- ১৮৪৪ সালেই আমি এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম, — তারা শিল্পজগতে ইংলণ্ডের একাধিপত্যকে ক্রমেই বেশি করে ভেঙ্গে দিচ্ছে। ইংলণ্ডের তুলনায় এদের শিল্প নবীন, কিন্তু সে শিল্প বাড়ছে

* 'ছোট আয়র্ল্যাণ্ড' — ১৯শ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে ম্যাঞ্চেস্টারে একটি সবচেয়ে নিকৃষ্ট শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চল। — সম্পাঃ

** 'সেভেন ডায়ালস' — লণ্ডনের কেন্দ্রস্থলে শ্রমিক বস্তি। -- সম্পাঃ

ইংলণ্ডের চেয়ে অনেক বেশী দ্রুত হারে, এবং লক্ষণীয় এই যে, ঠিক বর্তমানে তারা ১৮৪৪-এর ইংরেজ শিল্পের সমপর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। আমেরিকার কথা ধরলে, এই তুলনা সত্যই খুব চোখে লাগে। একথা সত্য যে, আমেরিকায় শ্রমিক শ্রেণী যে বহিঃপরিবেশের মধ্যে আছে তা অনেক স্বতন্ত্র, কিন্তু এক্ষেত্রেও সেই একই অর্থনৈতিক নিয়ম কাজ করে চলেছে, তার ফলও সর্ববিষয়ে একেবারে এক না হলেও মোটামুটি একধরনের হতে বাধ্য। তাই আমরা আমেরিকায়ও দেখছি হ্রস্বতর শ্রমদিনের জন্য, আইনের দ্বারা কাজের সময়, বিশেষত কারখানায় নারী ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদেব বেলায়, বেঁধে দেওয়ার জন্য সেই একই সংগ্রাম চলেছে; ট্রাকসিসটেমের পূর্ণ বিকাশ দেখা যাচ্ছে এবং 'কর্তারা' শ্রমিকদের উপর আধিপত্য বিস্তারের উপায় হিসাবে গ্রামাঞ্চলে 'কুটির প্রথার' সুযোগ নিচ্ছে। ১৮৮৬ সালে, কনেলস্‌ভিল জেলায় ১২,০০০ পেনসীলভানিয়ান কয়লা খনি-শ্রমিকের বিরাট ধর্মঘটের বিবরণ সম্বলিত আমেরিকান সংবাদপত্রগুলি পেয়ে আমার মনে হল যেন উত্তর ইংলণ্ডের কয়লাশ্রমিকদের ১৮৪৪-এর ধর্মঘট সম্পর্কে আমার নিজেরই লেখা বিবরণ পড়ছি। ভুল বাটখারার সাহায্যে শ্রমজীবী মানুষকে ঠকাবার সেই একই ব্যবস্থা; সেই একই ট্রাকসিস্টেম; শ্রমিকদের বাসগৃহ থেকে অর্থাৎ, কোম্পানীর মালিকানাধীন কুটিরগুলি থেকে উচ্ছেদ — মালিকদের এই শেষ কিন্তু অমোঘ হাতিয়ার প্রয়োগ করে খনি-শ্রমিকদের প্রতিরোধ চূর্ণ করার সেই একই প্রচেষ্টা।

বর্তমান অনুবাদে বইটিকে আমি সময়োপযোগী করার বা ১৮৪৪-এর পর যেসব পরিবর্তন ঘটেছে তা বিশদে বিবৃত করার কোনো চেষ্টা করিনি। করিনি দুটি কারণে: প্রথমত, তা ভাল করে করতে গেলে বইখানির কলেবর দ্বিগুণ বেড়ে যাবে; এবং দ্বিতীয়ত, কার্ল মার্কস রচিত 'পুঁজি' বইটির প্রথম খণ্ডে, তার একটা ইংরেজি অনুবাদ বাজারে আছে, তাতে ১৮৬৫ সাল নাগাদ, অর্থাৎ বৃটিশ শিল্প সমৃদ্ধির চূড়ান্ত পর্যায়ে ব্রিটিশ শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা সম্পর্কে বেশ অনেকখানি বর্ণনা রয়েছে। ফলে, মার্কসের বিখ্যাত বইটিতে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে আমায় আবার সেইসব বিষয়ই আলোচনা করতে হত।

একথা উল্লেখের বোধহয় বিশেষ কোনো প্রয়োজন নেই যে, এই বইয়ে সাধারণ তাত্ত্বিক — দার্শনিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক — যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে, তার সঙ্গে আমার আজকের দৃষ্টিভঙ্গির সর্বত্র মিল নেই। আধুনিক আন্তর্জাতিক যে সমাজতন্ত্র পরে, প্রধানত মার্কসের প্রায় একক চেষ্টার ফলে, বিজ্ঞানরূপে পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে, তার অস্তিত্ব ১৮৪৪-এ ছিল না। আমার এই বইখানি তারই ভ্রূণাবস্থার এক পর্যায় মাত্র; এবং মানব-ভ্রূণের প্রথমাবস্থায় যেমন তার মৎস্য পূর্বপুরুষদের ফুলকোর বেষ্টনীঅস্থি পুনরাবির্ভূত হয়, তেমনি আধুনিক সমাজতন্ত্রের অন্যতম

পূর্বপুরুষ জার্মান দর্শন থেকে উদ্ভবের চিহ্নও এই বইয়ে সর্বত্র পরিস্ফুট। যেমন, কমিউনিজম শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিগত মতবাদমাত্র নয়, বরং পুঁজিপতি শ্রেণী সমেত সমস্ত সমাজের বর্তমান সংকীর্ণ পরিবেশ থেকে মুক্তির একটি তত্ত্ব — এই কথার ওপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। কথাটা বিমূর্তভাবে দেখলে নিশ্চয়ই ঠিক, কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে অর্থহীন এবং অনেক সময় তার চেয়েও খারাপ। বিত্তবান শ্রেণীগুলি যতদিন মুক্তির প্রয়োজন অনুভব না করে, উপরন্তু শ্রমিক শ্রেণীর নিজমুক্তি সাধনে প্রাণপণে বাধা দেয়, ততদিন শ্রমিক শ্রেণীকে একাই সমাজ বিপ্লবের প্রস্তুতি এবং সংগ্রাম করতে হবে। ১৭৮৯ সালে ফরাসী বুর্জোয়ারাও ঘোষণা করেছিল যে, বুর্জোয়াদের মুক্তিই সমগ্র মানবসমাজের মুক্তি; কিন্তু অভিজাতরা এবং পাদ্রীরা সেকথা বুঝতে চায়নি; সাময়িকভাবে, সামন্ততন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিপাদ্যটি বিমূর্ত ঐতিহাসিক সত্য হলেও অল্পদিনের মধ্যেই তা নিতান্তই ভাবপ্রবণতায় পরিণত হল এবং বিপ্লবী সংগ্রামের আগুনে একেবারেই মিলিয়ে গেল। আর বর্তমানে, যেসব লোক নিজেদের উঁচু দৃষ্টিভঙ্গির 'নিরপেক্ষতা' থেকে শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী-স্বার্থ ও শ্রেণী-সংগ্রামের বহু ঊর্ধ্বে দণ্ডায়মান এবং উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণীর স্বার্থকে মহত্তর মানবতার মধ্যে মিলিয়ে দেবার জন্যে সচেষ্ট এক সমাজতন্ত্রের বাণী প্রচার করে, তারা হয় নিতান্তই আনাড়ী এবং তাদের অনেক কিছু শেখার বাকি, নয়ত তারা শ্রমিকের নিকৃষ্ট শত্রু — ভেড়ার ছদ্মবেশে নেকড়ে বাঘ।

লেখার মধ্যে মহা শিল্প সংকটের পুনরাবৃত্তিকাল পাঁচবছর বলা হয়েছে। ১৮২৫ থেকে ১৮৪২-এর ঘটনাবলীর বিচারে বাহ্যত এইরকমই মনে হয়েছিল, কিন্তু ১৮৪২ থেকে ১৮৬৮-এর শিল্প-ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, আসল পুনরাবৃত্তিকাল হচ্ছে ১০ বছর; অন্তর্বর্তীকালীন ধাক্কাগুলি ছিল গৌণ এবং ক্রমে আরও মিলিয়ে যাবার দিকেই তাদের ঝোঁক। ১৮৬৮ সালের পর আবার পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। সে সম্পর্কে পরে আরও আলোচনা করা যাবে।

এই লেখায় যৌবনসুলভ উৎসাহবশে আমি একাধিক ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলাম, তার মধ্যে একটি ছিল ইংলণ্ডে সমাজবিপ্লবের আসন্নতা সম্পর্কে; বর্তমান সংস্করণে সেগুলি যাতে বাদ না পড়ে সেবিষয়ে আমি নজর রেখেছি। ভবিষ্যৎ বাণীর বেশ কয়েকটিই যে ভুল প্রমাণিত হয়েছে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, বরং তার মধ্যে এতগুলি যে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে এবং ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের, বিশেষত আমেরিকার প্রতিযোগিতার ফলে ইংলণ্ডের বাণিজ্যে সংকট দেখা দেবে বলে আমি যে কথা বলেছিলাম তা যে, তত দ্রুত না হলেও, বাস্তবে পরিণত হয়েছে, এইটাই আশ্চর্যের কথা। এই প্রসঙ্গে *London Commonweal* পত্রিকার ১ই মার্চ, ১৮৮৫, সংখ্যায় '১৮৪৫ ও ১৮৮৫-এর ইংলণ্ড' শীর্ষক যে প্রবন্ধটি আমি প্রকাশ করেছিলাম

সেটি এখানে উপস্থিত করে বর্তমান লেখাটিকে সময়োপযোগী করা সম্ভব এবং একান্ত কর্তব্য। ঐ প্রবন্ধে ইংলন্ডের শ্রমিক শ্রেণীর এই ৪০ বৎসরের ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্রও পাওয়া যাবে। প্রবন্ধটি নিচে দেওয়া হল:

'৪০ বৎসর আগে ইংলন্ড এক সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল, সবকিছু দেখে মনে হচ্ছিল যে বলপ্রয়োগ ছাড়া সে সংকটের সমাধান অসম্ভব। শিল্প-উৎপাদনের বিপুল ও দ্রুত বিকাশ তখন বিদেশী বাজারের বিস্তার ও চাহিদার বৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে গেছে। প্রতি দশ বছর অন্তর একটা সর্বব্যাপী বাণিজ্য বিপর্যয় শিল্পের অগ্রগতি প্রচণ্ড ব্যাহত করেছিল, তাকে অনুসরণ করে আসছিল কয়েক বছরের একটানা মন্দার পর সামান্য কয়েক বছরের সমৃদ্ধি এবং প্রতিবারই তার পরিণামে উন্মত্ত অতিরিক্ত উৎপাদন এবং তার ফলে নূতনতর ভাঙ্গন। মালিক শ্রেণী শস্যে অবাধ বাণিজ্য প্রবর্তনের জন্য কলরব সুরু করল এবং শহরের বুভুক্ষু জনতাকে তারা যেখান থেকে এসেছিল সেই গ্রামাঞ্চলে, জন ব্রাইটের ভাষায় 'অন্নের ভিখারী নিঃস্বরূপে নয়, শত্রুদেশ দখলকারী সেনাদলের মতো,' ফেরৎ পাঠিয়ে জোর করে ঐ দাবী প্রতিষ্ঠার হুমকি দিতে লাগল। শহরের শ্রমজীবী জনতা দাবি করল রাজনৈতিক ক্ষমতায় তাদের ভাগ — জনগণের সনদ; তাদের সমর্থন করল ছোট ব্যবসায়ী শ্রেণীর অধিকাংশ, দুপক্ষের মধ্যে মতভেদ ছিল শুধু এই বিষয়ে যে, শারীরিক বলপ্রয়োগে সনদ হাসিল করা হবে, না নৈতিক বলপ্রয়োগে। তারপর এল ১৮৪৭-এর বাণিজ্য বিপর্যয়, আয়র্ল্যান্ডে দুর্ভিক্ষ এবং এ দুয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের সম্ভাবনা।

'১৮৪৮-র ফরাসী বিপ্লব ইংরেজ মধ্য শ্রেণীকে বাঁচিয়ে দিল। বিজয়ী ফরাসী শ্রমিকদের সমাজতন্ত্রী ঘোষণাবলী ইংলন্ডের ছোট মধ্য শ্রেণীকে ভয় পাইয়ে দিল, এবং ইংলন্ডের শ্রমিক শ্রেণীর সংকীর্ণতর কিন্তু বেশী ব্যবহারিক আন্দোলনকে বিশৃংখল করে দিল। ঠিক যে সময় সর্বশক্তিতে চার্টিস্ট মতবাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা করার কথা, ঠিক সেই সময়, ১৮৪৮-এর ১০ই এপ্রিল তারিখের বাহ্য মৃত্যুর আগেই তার আভ্যন্তরীণ মৃত্যু ঘটল। শ্রমিক শ্রেণীর কর্মতৎপরতা পিছনে সরে গেল। গোটা রণসীমান্ত জুড়ে জয় হল পুঁজিপতি শ্রেণীর।

'১৮৩১-এর রিফর্ম বিলে* ভূস্বামী অভিজাত শ্রেণীর উপর সমগ্র পুঁজিপতি শ্রেণীর জয় সূচিত হয়েছিল। শস্য আইন প্রত্যাহার কেবল ভূস্বামী অভিজাত শ্রেণীর

---

* ১৮৩২ সালের জুন মাসে ইংলন্ডের পার্লামেন্ট নির্বাচনী অধিকার সংস্কারের যে বিল পাশ করে তার কথা বলা হচ্ছে। এ সংস্কার ছিল ভূস্বামী ও ফিনান্স অভিজাতদের রাজনৈতিক একাধিপত্যের বিরুদ্ধে, পার্লামেন্টে শিল্প বুর্জোয়াদের প্রবেশের পথ করে দেয় তা। সংস্কার আন্দোলনের প্রধান শক্তি পেটি বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতকে প্রতারিত করে উদারনীতিক বুর্জোয়ারা, কোনো নির্বাচনী অধিকার পায় না তারা। — সম্পাঃ

বিরুদ্ধে নয়, ব্যাঙ্ক মালিক, ফাটকা দালাল, লভ্যাংশজীবী প্রভৃতি পুঁজিপতি শ্রেণীর যেসব অংশ জমি সংক্রান্ত স্বার্থের সঙ্গে কমবেশী জড়িত, তাদের বিরুদ্ধেও শিল্প পুঁজিপতিদের জয়ের নিদর্শন। এই শিল্প পুঁজিপতিরাই তখন জাতির প্রতিভূ। অবাধ বাণিজ্যের অর্থ দাঁড়াল এই শিল্প পুঁজিপতিদের স্বার্থে ইংলণ্ডের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য ও আর্থিক নীতির আমূল পুনর্বিন্যাস, এবং সোৎসাহে সেই পথে তারা অগ্রসর হল। শিল্প উৎপাদনের পথে সমস্ত বাধা নির্মমভাবে অপসারিত হল। শুল্ক ও সমগ্র কর ব্যবস্থায় বিপ্লবী পরিবর্তন সাধিত হল। সমস্ত কাঁচা উৎপাদন দ্রব্য, বিশেষত শ্রমিক শ্রেণীর জীবিকার উপকরণগুলি সুলভ করা, কাঁচামালের দাম কমান এবং শ্রমিকদের মজুরি তখনও পর্যন্ত কমাতে না পারলেও অন্তত আর বাড়তে না দেওয়া -- শিল্প পুঁজিপতির পক্ষে অত্যাবশ্যক এই অনন্য লক্ষ্যসাধনে সবকিছুকে অধীনস্থ করা হল। ইংলণ্ডের হওয়া চাই 'সারা দুনিয়ার শিল্পশালা', ইতিমধ্যেই ইংলণ্ডের জন্য আয়র্ল্যাণ্ড যা হয়ে উঠেছিল, অন্য সব দেশও হবেই ঠিক তাই, অর্থাৎ হবে তার শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার এবং বিনিময়ে তারা তাকে কাঁচামাল ও খাদ্য সরবরাহ করবে। ইংলণ্ড — সে এক কৃষিপ্রধান বিশ্বের মহান শিল্পকেন্দ্র, ক্রমেই আরও বেশী সংখ্যক শস্য ও কার্পাস উৎপাদনকারী আয়র্ল্যাণ্ডদের দ্বারা প্রদক্ষিত শিল্পসূর্য। কী উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ!

'ইউরোপের মূলখণ্ডের বেশি সংকীর্ণমনা সহযাত্রীদের তুলনায় অনেক প্রবল কাণ্ডজ্ঞান এবং প্রচলিত রীতিনীতি সম্পর্কে অবজ্ঞা বরাবরই ইংলণ্ডের শিল্প পুঁজিপতিদের বৈশিষ্ট্য, তাই নিয়ে তারা তাদের এই মহান লক্ষ্যসাধনে আত্মনিয়োগ করল। চার্টিস্ট মতবাদ তখন মুমূর্ষু। ১৮৪৭-এর ধাক্কা মন্দীভূত হয়ে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসা-বাণিজ্যে যে সমৃদ্ধি ফিরে এল, তাকে দেখান হল একমাত্র অবাধ বাণিজ্যের ফল বলে। এই দুই কারণ মিলে শ্রমিক শ্রেণীকে রাজনৈতিকভাবে শিল্প পুঁজিপতিদের নেতৃত্বাধীন 'মহান উদারনৈতিক পার্টির' লেজুড়ে পরিণত করল। একবার যখন এই সুবিধা পাওয়া গেল তখন তাকে স্থায়ী করা দরকার। চার্টিস্টপন্থীরা অবাধ বাণিজ্যের বিরোধিতা করেনি, কিন্তু তাকেই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রশ্নে পরিণত করার বিরোধিতা করেছিল, এর থেকে শিল্প পুঁজিপতিদের এ শিক্ষা হয়েছিল এবং ক্রমশই আরও বেশি করে হচ্ছিল যে, শ্রমিক শ্রেণীর সাহায্য ছাড়া মধ্য শ্রেণীরা কখনও সারা জাতির উপর তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। এইভাবে এই দুই শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্কে একটা ক্রমিক পরিবর্তন ঘটল। 'কারখানা আইনগুলি' একসময় ছিল প্রত্যেক শিল্পমালিকের চক্ষুশূল। এখন সেই আইনের কাছে শুধু যে স্বেচ্ছায় নতি স্বীকার করা হল তাই নয়, প্রায় প্রত্যেক শিল্পে প্রযোজ্য রূপে সেগুলির পরিবর্ধনও সহ্য করা হল। এতদিন

ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে স্বয়ং শয়তানের আবিষ্কার মনে করা হত, এখন সেগুলি সম্পূর্ণ আইনসম্মত সংগঠন এবং শ্রমিকদের মধ্যে সুষ্ঠু অর্থনৈতিক মতবাদ প্রচারের কার্যকরী উপায় বলে আদর ও আনুকূল্য পেতে লাগল। ১৮৪৮ পর্যন্ত ধর্মঘটের মতো পাপাচার আর কিছু ছিল না, এখন ক্রমে তারও কালবিশেষে সবিশেষ উপযোগিতা আবিষ্কৃত হতে লাগল, বিশেষত যেসব ক্ষেত্রে মালিকরাই, তাদের নিজেদের সুযোগমতো, উস্কানি দিয়ে সেই ধর্মঘট লাগিয়ে দিচ্ছে। যেসব বিধিবদ্ধ আইন মালিকের চেয়ে শ্রমিককে নিচের স্তরে বা অসুবিধাজনক স্থানে রেখেছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে দৃষ্টিকটু আইনগুলি অন্তত প্রত্যাহৃত হল। এবং যে শিল্পপতিরা শেষ পর্যন্ত 'জনতার সনদের' বিরোধিতা করেছিল, সেই অসহনীয় 'সনদটি' কার্যত তাদেরই রাজনৈতিক কর্মসূচিতে পরিণত হল। 'সম্পত্তি শর্তের অবসান' ও 'ব্যালটে ভোটগ্রহণ' আজ দেশের আইনের অঙ্গীভূত। ১৮৬৭ এবং ১৮৮৪-এর সংস্কার আইন 'সর্বজনীন ভোটাধিকারের', অন্তত জার্মানিতে তা যেভাবে এখন বর্তমান, তার কাছাকাছি পৌঁছেছে; বর্তমানে পার্লামেন্টের বিবেচনাধীন 'পুনর্বিন্যাস আইনের খসড়ায়' 'সমান নির্বাচক মণ্ডলীর' ব্যবস্থা হচ্ছে যা অন্তত জার্মানির তুলনায় বেশি অসমান নয়; 'পার্লামেন্টের সদস্যদের জন্য ভাতা' এবং একেবারে বছরে বছরে নির্বাচন না হোক অন্তত আরও ঘনঘন পার্লামেন্ট নির্বাচনের সম্ভাবনা দূরে দেখা যাচ্ছে — তবু এমন কিছু লোক আছে যারা বলে বেড়ায় যে, চার্টিস্ট মতবাদের মৃত্যু হয়েছে।

'পূর্বগামী আরও অনেক বিপ্লবেরই মতো ১৮৪৮-এর বিপ্লবেরও অদ্ভুত অদ্ভুত সহযোগী এবং উত্তরাধিকারী দেখা গেছে। এই বিপ্লবকে যারা দমন করল তারাই, মার্কসের ভাষায়, হল তার উইলের নির্দেশপালক। লুই নেপোলিয়নকে স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ইতালি সৃষ্টি করতে হল, বিসমার্ককে জার্মানিতে বিপ্লবীকরণ সাধন এবং হাঙ্গারির স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হল, আর ইংরেজ শিল্পমালিকদের 'জনতার সনদকে' আইনে বিধিবদ্ধ করতে হল।

'ইংলন্ডের পক্ষে, গোড়ার দিকে শিল্প পুঁজিপতিদের এই প্রাধান্যের ফল হল চাঞ্চল্যকর। ব্যবসা-বাণিজ্যে পুনরুজ্জীবন দেখা দিল এবং আধুনিক শিল্পের এই জন্মস্থানের পক্ষেও অশ্রুতপূর্ব মাত্রায় তা বিস্তার লাভ করল; ১৮৫০ থেকে ১৮৭০ এই কুড়ি বৎসরে অভাবনীয় উৎপাদনের পাশাপাশি, আমদানি ও রপ্তানি, পুঁজিপতিদের হাতে সঞ্চিত সম্পদ ও বড় বড় শহরে কেন্দ্রীভূত মানব শ্রমশক্তির বিহ্বলকর পরিমাণের সঙ্গে তুলনায় পূর্ববর্তী যুগের বাষ্প ও যন্ত্রের বিস্ময়কর সৃষ্টিগুলিও অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেল। এই অগ্রগতি অবশ্য, আগেকারই মতো, দশ বছর অন্তর, ১৮৫৭ এবং ১৮৬৬ সালে, সংকটের দ্বারা বিঘ্নিত হয়; কিন্তু এ ধাক্কাগুলিকে স্বাভাবিক, অপরিহার্য

ঘটনা বলেই ধরে নেওয়া হল, যাকে ভবিতব্য হিসাবে মেনে নিতেই হবে এবং শেষ পর্যন্ত তা সর্বদা আপনা থেকেই ঠিক হয়ে যায়।

'আর এই যুগে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা? ব্যাপক শ্রমিক জনতার অবস্থায় পর্যন্ত সাময়িক উন্নতি ঘটল। কিন্তু বিপুল সংখ্যক বেকার মজুত বাহিনীর প্রবাহ, ক্রমাগত নতুন নতুন যন্ত্র দ্বারা শ্রমিকের স্থান অধিকার, এবং কৃষিতেও ক্রমেই বেশী হারে যন্ত্র প্রয়োগেরও ফলে স্থানচ্যুত কৃষিজীবী জনতার আগমনের ফলে এই উন্নতিও সর্বদাই আগেকার স্তরে নেমে যেত।

'শ্রমিক শ্রেণীর দুটি 'সুবিধাভোগী' অংশের বেলায়ই কেবল স্থায়ী উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, কারখানার শ্রমিকদের ক্ষেত্রে; পার্লামেন্টের আইনের দ্বারা এদের কাজের ঘণ্টা অপেক্ষাকৃত যুক্তিসম্মত সীমার মধ্যে বেঁধে দেওয়ায় তাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার ঘটেছে ও একটা নৈতিক শক্তি পেয়েছে তারা, স্থানীয় কেন্দ্রীকরণের ফলে যা আরো বেড়ে গেছে। ১৮৪৮-এর আগেকার তুলনায় তারা যে ভালো আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই যে, যত ধর্মঘট তারা করে তার দশটির মধ্যে নটির ক্ষেত্রেই মালিকরা নিজেরাই উৎপাদন কমাবার একমাত্র উপায় হিসাবে উস্কানি দিয়ে ধর্মঘট ঘটায়। কারখানায় তৈয়ারী মাল যতই অবিক্রীত থাক না কেন, শ্রমদিন হ্রাসে মালিকদের কখনও রাজী করান যায় না, কিন্তু শ্রমিকদের দিয়ে ধর্মঘট করাও, অমনি বিনা ব্যতিক্রমে প্রত্যেক মালিক কারখানা বন্ধ করে দেবে।

'দ্বিতীয়ত, বড় বড় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ক্ষেত্রে; যেসব বৃত্তিতে **প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের** শ্রমই প্রধান বা একমাত্র প্রযোজ্য, এগুলি সেইসব বৃত্তির সংগঠন। এইসব বৃত্তিতে স্ত্রীলোক ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিযোগিতা বা যন্ত্রের প্রতিযোগিতা এখনও তাদের সংগঠিত শক্তিকে দুর্বল করতে পারেনি। যন্ত্র নির্মাণের মজুর, ছুতার মিস্ত্রী, আসবাব মিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রী — এই প্রত্যেকটি অংশই এতটা করে শক্তির অধিকারী যে, যেমন রাজমিস্ত্রী ও তার সহকারী মজুরদের ক্ষেত্রে, তারা যন্ত্র প্রবর্তনে পর্যন্ত সফলভাবে বাধা দিতে পারে। ১৮৪৮-এর পর থেকে এদের অবস্থা যে লক্ষ্যণীয়ভাবে উন্নত হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহেরই অবকাশ নেই, এবং তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, আজ ১৫ বৎসরের বেশীকাল ধরে তাদের মালিকরাই যে কেবল তাদের সঙ্গে বেশ ভালো সম্পর্ক বজায় রেখেছে তাই নয়, তারাও মালিকদের সঙ্গে খুবই ভালো সম্পর্ক বজায় রেখে এসেছে। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এরা এক অভিজাত গোষ্ঠী হয়ে উঠেছে; নিজেদের জন্য অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থা তারা জোর করে চালু করতে পেরেছে এবং সেই অবস্থাকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নিয়েছে। এরাই হচ্ছে লেওন লেভি ও গিফেন মহাশয়দের আদর্শ শ্রমিক এবং সত্যিই বিশেষ করে যে কোনো বিবেচক পুঁজিপতি এবং সাধারণভাবে সমগ্র পুঁজিপতি শ্রেণীর কাছে এরা আজকাল বড় চমৎকার লোক।

'কিন্তু শ্রমজীবী জনতার বিপুল অংশ আজ যে দুর্দশা ও অনিরাপত্তার মধ্যে বাস করছে তা আগের তুলনায় বেশী নিচু না হলেও, অন্তত সমান নিচু। লন্ডনের ইস্ট এন্ড হচ্ছে রুদ্ধস্রোত দারিদ্র্য ও হতাশার, কর্মহীনতার কালে অনাহার আর কর্মরত কালে শারীরিক ও নৈতিক অধঃপতনের এক ক্রমবিস্তারমান বদ্ধ জলার মতো। শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষ সুবিধাভোগী অল্পাংশকে বাদ দিলে প্রত্যেক বড় শহরেরও এই অবস্থা, এবং ছোটখাট শহর ও কৃষি অঞ্চলগুলিতেও তাই। যে নিয়মে শ্রমশক্তির **মূল্য** পরিণত হয় প্রাণধারণের অবশ্য প্রয়োজনীয় উপকরণের মূল্যে এবং অপর যে-নিয়ম শ্রমের **গড়পরতা দরকে** সেই অবশ্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলির সর্বনিম্ন মাত্রায় নামিয়ে আনে - এই দুই নিয়ম স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের অদম্য শক্তি নিয়ে তাদের উপর প্রযুক্ত হয় এবং চাকার নিচে তাদের গুঁড়িয়ে দেয়।

'এই হল, তাহলে, ১৮৪৭-এর অবাধ বাণিজ্য নীতি এবং শিল্প পুঁজিপতিদের বিশ বছরের শাসনের ফল। কিন্তু এর পর এক পরিবর্তন ঘটল। ১৮৬৬-এর বিপর্যয়ের পর অবশ্য ১৮৭৩-এ এক সামান্য ও স্বল্পকালস্থায়ী পুনরুজ্জীবন দেখা দিয়েছিল, কিন্তু বেশী দিন টেকেনি। প্রত্যাশিত সময়ে, ১৮৭৭ বা ১৮৭৮-এ আমাদের অবশ্য পূর্ণ সংকটের মধ্য দিয়ে যেতে হয়নি, কিন্তু ১৮৭৬ থেকেই শিল্পের সমস্ত প্রধান প্রধান শাখায় একটানা অচল অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি। পূর্ণ বিপর্যয় যেমন আসে না, সে বিপর্যয়ের আগে ও পরে আকাঙ্ক্ষিত সমৃদ্ধির যে পর্যায় আমাদের পাবার কথা তাও তেমনি আসে না। একটা নিস্তেজ মন্দা, সমস্ত ব্যবসায়ে সমস্ত বাজারমালের একটানা বাহুল্য, এই অবস্থার মধ্যেই আমরা প্রায় দশ বৎসর চলেছি। কেন এমন হল?

'অবাধ বাণিজ্য তত্ত্ব দাঁড়িয়েছিল এই অনুমানের উপর: ইংলন্ড হবে এক কৃষিপ্রধান বিশ্বের একমাত্র বিপুল শিল্পকেন্দ্র। আর বাস্তব ঘটনা দাঁড়িয়েছে এই যে, অনুমানটি এক অবিমিশ্র ভ্রান্তি বলে প্রমাণিত হয়েছে। যেখানেই জ্বালানি, বিশেষত কয়লা, আছে সেখানেই আধুনিক শিল্পের পরিস্থিতি, বাষ্পশক্তি ও যন্ত্রপাতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এবং ইংলন্ড ছাড়া অন্য দেশে — ফ্রান্স, বেলজিয়ম, জার্মানি, আমেরিকা, এমনকি রাশিয়ায় কয়লা আছে। এবং সেখানকার লোকেরা ইংরেজ পুঁজিপতিদের সম্পদ ও গৌরব বাড়াবার জন্য আইরিশ নিঃস্ব কৃষকে পরিণত হবার সুবিধাটা হৃদয়ঙ্গম করেনি। তারা দৃঢ় সংকল্পে শিল্প-উৎপাদনে লেগে গেল, কেবল নিজেদের জন্য নয়, বাকি দুনিয়ার জন্যও; আর তার ফল হল এই যে, ইংলন্ড প্রায় শতাব্দীকাল ধরে শিল্প-উৎপাদনে যে একাধিপত্য ভোগ করে আসছিল, সেটা চিরকালের মতো ভেঙ্গে গেল।

'অথচ শিল্প-উৎপাদনে এই একাধিপত্যই হচ্ছে ইংলন্ডের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার ভর-কেন্দ্র। সে একাধিপত্য যখন বজায় ছিল তখনও পণ্যের বাজার ইংরেজ শিল্প-মালিকদের ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে তাল রাখতে পারছিল না; ফলে

দশ বছর অন্তর সংকট দেখা দিচ্ছিল। আর আজ তো নতুন বাজার প্রতিদিন আরও দুর্লভ হয়ে উঠছে এবং এতই দুর্লভ হয়ে উঠছে যে, এবার কঙ্গোর নীগ্রোদেরও ম্যাঞ্চেস্টারের ছিট-কাপড়, স্ট্যাফোর্ডশায়ারের পটারি আর বার্মিংহামের লোহার জিনিস রূপী সভ্যতায় সবলে সামিল করে নিতে হচ্ছে। এরপর যখন ইউরোপের মহাদেশ, বিশেষত আমেরিকা থেকে জিনিসপত্র ক্রমেই বেশী পরিমাণে আসতে আরম্ভ করবে, আজও বৃটিশ শিল্প-মালিকদের হাতেই যে প্রধান অংশটা রয়েছে সেটা বছরের পর বছর যখন কমতে থাকবে, তখন অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? সর্বরোগহর হে অবাধ বাণিজ্য, জবাব দাও।

'এ কথাটা আমিই প্রথম বলিনি। ১৮৮৩ সালেই ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের সাউথপোর্ট অধিবেশনে অর্থনীতি বিভাগের সভাপতি মিঃ ইঙ্গলিস পালগ্রেইভ স্পষ্ট বলেছিলেন যে, "ইংলণ্ডে বিপুল ব্যবসাগত মুনাফার দিন শেষ হয়েছে, এবং শিল্প-উদ্যোগের একাধিক বৃহৎ শাখার অগ্রগতিতে ছেদ পড়েছে। **প্রায় একথাই বলা যায় যে, দেশ এক প্রগতিহীন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে।**"

'কিন্তু তার ফল কী হবে? পুঁজিবাদী উৎপাদন থামতে পারে না। তাকে বাড়তেই হবে, বিস্তৃততর হতেই হবে, নইলে তার মৃত্যু। ইতিমধ্যেই, বিশ্বের বাজারে সরবরাহের ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের রাজকীয় ভাগাটা হ্রাস পাওয়ার অর্থই হল রুদ্ধস্রোত অবস্থা, দুর্দশা, কোথাও পুঁজির আধিক্য, কোথাও বা বেকার শ্রমিকের আধিক্য। বাৎসরিক উৎপাদন বৃদ্ধি যখন একেবারেই থেমে যাবে তখন অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

'এইখানেই পুঁজিবাদী উৎপাদনের ঘাতপ্রবণস্থান, এ্যাকিলিসের গোড়ালি*। নিরবচ্ছিন্ন বিস্তারের আবশ্যিকতা তার ভিত্তি এবং সেই নিরবচ্ছিন্ন বিস্তারই আজ অসম্ভব হয়ে পড়ছে। ফলে দেখা দিচ্ছে এক অচল অবস্থা। এক এক বৎসর যাচ্ছে আর ইংলণ্ড আরও বেশী এই প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছে: হয় দেশ, নয়ত পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থা, একটাকে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতে হবে। কোনটা যাবে?

'আর শ্রমিক শ্রেণী? ১৮৪৮ থেকে ১৮৬৮-এর অভূতপূর্ব বাণিজ্য ও শিল্প বিস্তারের মধ্যেও যদি তাদের এত দৈন্য সহ্য করতে হয়ে থাকে; সেদিনও তাদের মধ্যে এক অতি সামান্য, বিশেষ সুবিধাভোগী 'সংরক্ষিত' সংখ্যালঘু অংশ স্থায়ীভাবে উপকৃত হলেও অধিকাংশের অবস্থায় যদি বড়জোর অস্থায়ী উন্নতিমাত্র হয়ে থাকে, তাহলে এই চোখ-ধাঁধানো যুগ অনিবার্যভাবে যেদিন শেষ হবে, যেদিন আজকের এই নিরানন্দ

* এ্যাকিলিস — প্রাচীন গ্রীক কাব্য 'ইলিয়ডের' অন্যতম এক সাহসী বীর। পুরাকথা অনুসারে এ্যাকিলিসের মা, সমুদ্রের দেবী থিতিদা, পুত্রকে অমর করার বাসনায় তার গোড়ালি ধরে স্টিক্স-এর পবিত্র জলে তাকে চোবায়, ফলে এই গোড়ালিটা তার দুর্বল জায়গা থেকে যায়। পারিস তার গোড়ালিতে বাণ মেরে এ্যাকিলিসকে নিহত করে। — সম্পাঃ

রুদ্ধস্রোত অবস্থা কেবল তীব্রতরই হবে না, এ বদ্ধাবস্থা সেই তীব্রতররূপেই ইংরেজ ব্যবসা বাণিজ্যের স্থায়ী, স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হবে, সেদিন পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে?

'প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই: শিল্পক্ষেত্রে ইংলণ্ডের একাধিপত্যের যুগে ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীও কিছু পরিমাণে সেই একাধিপত্যের সুফলের অংশ পেয়েছে। এই সুফল তাদের মধ্যে বণ্টিত হয়েছে খুবই অসমানভাবে; বিশেষ সুবিধাভোগী সংখ্যাল্প অংশ তার বেশীর ভাগটাই আত্মসাৎ করেছে, কিন্তু বৃহত্তর শ্রমিকসাধারণও, অন্তত সাময়িকভাবে, কখনও কখনও তার ভাগ পেয়েছে। এবং এই কারণেই ওয়েনবাদের অবলুপ্তির পর ইংলণ্ডে আর কোনো সমাজতন্ত্র দেখা দেয়নি। সেই একাধিপত্য ভেঙ্গে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীও বিশেষ সুবিধাভোগীর স্থান হারাবে; এবং দেখতে পাবে যে, তারা সাধারণভাবে — বিশেষ সুবিধাভোগী এবং নেতৃত্বকারী অল্পসংখ্যকরাও তার থেকে বাদ পড়বে না — অপরাপর দেশের শ্রমিকদের সঙ্গে এক স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে। আর এই কারণেই ইংলণ্ডে আবার সমাজতন্ত্র দেখা দেবে।'

১৮৮৫ সালে যেমন মনে হয়েছিল সেইভাবে বিষয়টির যে বর্ণনা আমি এখানে দিয়েছি তারপর আর বলার বিশেষ কিছু নেই। বলা বাহুল্য, আজ সত্যই 'ইংলণ্ডে আবার সমাজতন্ত্র' দেখা দিয়েছে এবং বেশ যথেষ্ট পরিমাণেই দেখা দিয়েছে সর্ববর্গের সমাজতন্ত্র: সজ্ঞান এবং অজ্ঞান সমাজতন্ত্র, গদ্যময় এবং কাব্যময় সমাজতন্ত্র, শ্রমিক শ্রেণীর এবং মধ্য শ্রেণীর সমাজতন্ত্র, কারণ, সত্যই সেই জঘন্য থেকে জঘন্যতম জিনিস সমাজতন্ত্রটা কেবল যে জাতে উঠেছে তাই নয়, উপরন্তু তার গায়ে সত্যিই সান্ধ্য পোষাক চড়েছে এবং ড্রইং রুমের আরাম কেদারায় অলসভঙ্গিতে আরামে সে গা এলিয়ে দিয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জনমত নামক 'সমাজের' সেই ভয়ংকর স্বেচ্ছাচারী প্রভুটি কতটা চঞ্চল, এবং বিগত এক যুগের সমাজতন্ত্রী আমরা যে সেই জনমতকে অবজ্ঞা করে এসেছিলাম, তার ন্যায্যতাও আর একবার প্রমাণিত হচ্ছে। তাহলেও এ লক্ষণ দেখে আমাদের চটবার কারণ নেই।

মৃদু জোলো সমাজতন্ত্রের যে ভাব দেখানো বুর্জোয়া মহলে সাময়িক ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে তার চেয়ে, এমনকি ইংলণ্ডে সাধারণভাবে সমাজতন্ত্রের সত্যই যে অগ্রগতি হয়েছে, তার চেয়েও যে ঘটনাকে আমি অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি তা হচ্ছে লণ্ডনের ইস্ট এণ্ডের পুনরুজ্জীবন। দুর্দশার এই বিপুল লীলাভূমি আজ আর ছয় বৎসর আগেকার মতো বদ্ধ ডোবা নয়। সে তার অসাড় হতাশা ঝেড়ে ফেলে আবার প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠেছে এবং আজকাল যাকে 'নয়া ইউনিয়নবাদ' বলা হয় তার, অর্থাৎ 'অদক্ষ' শ্রমিকদের বিপুল জনগণের সংগঠন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এই সংগঠন বহুল পরিমাণে পুরাতন 'দক্ষ' শ্রমিকদের ইউনিয়নেরই চেহারা নিতে পারে, কিন্তু চরিত্রগতভাবে তা মূলত পৃথক। পুরাতন ইউনিয়নগুলি যে সময় প্রতিষ্ঠা হয়েছিল

সে সময়কার ঐতিহ্য বহন করে চলেছে, এবং মজুরি প্রথাকে তারা এমন এক চিরস্থায়ী, চূড়ান্ত ব্যাপার বলে মনে করে, যা বড় জোর ইউনিয়নের সদস্যদের স্বার্থে খানিকটা সংস্কৃত করতে পারা যায়। নতুন ইউনিয়নগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন একসময় যখন মজুরি প্রথার অনন্ত অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাসের উপর রূঢ় আঘাত পড়েছে। এগুলির প্রতিষ্ঠাতারা ও পরিচালকেরা সচেতনভাবে বা আবেগের দিক দিয়ে সমাজতন্ত্রী, যে জনতার আনুগত্য এগুলিকে শক্তি জোগাল তারা ছিল অমার্জিত, অবহেলিত, শ্রমিক শ্রেণীর অভিজাত অংশ তাদের দেখত তাচ্ছিল্যের চোখে; কিন্তু এইদিক থেকে তাদের বিপুল সুবিধা ছিল যে, **তাদের মন ছিল অকর্ষিত জমির মতো,** উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যেসব 'ভদ্র' বুর্জোয়া কুসংস্কার অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল 'পুরাতন' ইউনিয়ন-পন্থীদের মস্তিষ্কে বাধা জন্মায় তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আর এখন আমরা দেখছি যে, এই নতুন ইউনিয়নগুলিই সাধারণভাবে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং সমৃদ্ধ ও গর্বিত 'পুরাতন' ইউনিয়নগুলিকে ক্রমেই নিজেদের পেছনে টেনে আসছে।

ইস্ট এন্ডের কর্মীরা অনেক বড় বড় ভুল করেছে তাতে সন্দেহ নেই, এধরনের ভুল তাদের পূর্বগামীরাও করেছে, আর তাদের যারা 'ছিঃ ছিঃ' করে সেই মতবাগীশ সমাজতন্ত্রীরাও করে থাকে। একটা বৃহৎ জাতির মতো একটা বৃহৎ শ্রেণীও নিজের ভুলের পরিণাম ভুগে যত তাড়াতাড়ি এবং ভালভাবে শেখে, অন্য কোনোভাবে তা শেখে না। এবং অতীতে, বর্তমানে বা ভবিষ্যতে যত ভুলই হোক না কেন, লণ্ডনের ইস্ট এন্ডের পুনরুজ্জীবন আজও এই fin de siècle-র বৃহত্তম ও ফলবান ঘটনা এবং এই ঘটনা দেখে যেতে পারলাম বলে আমি আনন্দিত ও গর্বিত।*

ফ. এঙ্গেলস

'ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' বইটির ১৮৯২ সালে লণ্ডনে প্রকাশিত ইংরেজি সংস্করণের জন্য এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত

১৮৯২-এর সংস্করণের পাঠানুসারে মুদ্রিত
মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ

* 'ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার' দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণের মুখবন্ধে এঙ্গেলস উপরোক্ত ইংরেজী মুখবন্ধের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেন এবং তারপর পরিসমাপ্তিতে নিম্নলিখিত অংশ যোগ করে দেন:

'ছ-মাস আগে আমি উল্লিখিত অংশ লেখার পর ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন আবার বড় এক ধাপ অগ্রসর হয়েছে। এই সেদিন অনুষ্ঠিত পার্লামেন্টারী নির্বাচন আনুষ্ঠানিকভাবে রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক এই উভয় পার্টিকে জানিয়ে দিয়েছে যে, এরপর থেকে তৃতীয় পার্টি, শ্রমিক দলের কথা তাদের হিসাবের মধ্যে ধরতে হবে। শ্রমিকদের এই পার্টি সবেমাত্র গড়ে উঠছে; এবং তার

উপাদানগুলি এখনও সর্বপ্রকার চিরাচরিত সংস্কার — বুর্জোয়া, প্রাচীন ট্রেড ইউনিয়নপন্থী, এমনকি মতবাগীশ সমাজতন্ত্রী সংস্কারগুলিও ঝেড়ে ফেলার কাজে ব্যাপৃত, যাতে তারা শেষ পর্যন্ত সকলের গ্রহণযোগ্য ভিত্তিতে একত্রিত হতে পারে। কিন্তু তাসত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ হবার যে সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী তারা চলেছে তা ইতিমধ্যেই এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে, তারই ফলে ইংলণ্ডের পক্ষে অশ্রুতপূর্ব নির্বাচনী ফলাফল দেখা গেল। লণ্ডনে দু-জন শ্রমিক নির্বাচনে দাঁড়ান এবং তাও সরাসরি সমাজতন্ত্রী হিসাবে, উদারনীতিকরা তাঁদের বিরুদ্ধে কাউকে দাঁড় করাতেই সাহস পেল না এবং সমাজতন্ত্রী দু-জন বিপুল ও অপ্রত্যাশিত ভোটাধিক্যে জয়লাভ করলেন। মিডল্সবরোতে শ্রমিকদের একজন প্রার্থী একজন রক্ষণশীল ও একজন উদাবনীতিক প্রার্থীর সঙ্গে একটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ঐ দু-জনের বাধা সত্ত্বেও নির্বাচিত হন। অপরদিকে, শ্রমিকদের নতুন প্রার্থীদের মধ্যে যারা উদারনীতিকদের সাথে সমঝোতা করেছিলেন, তাঁদেব মাত্র একজন ছাড়া সকলেই নৈরাশ্যজনকভাবে পরাজিত হন। আগেকাব তথাকথিত শ্রমিক প্রতিনিধিদের, অর্থাৎ যারা শ্রমিক শ্রেণীর লোক হয়েও ক্ষমা পায় একমাত্র এই কারণে যে, তারা নিজেরাই উদাবনীতিবাদের মহাসাগরে নিজেদের শ্রমিক চরিত্রকে ডুবিয়ে দিতে চায়, তাদের মধ্যে পুরাতন ইউনিয়নবাদের সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রতিনিধি হেনরি ব্রডহার্স্ট বন্যার মুখে তৃণখণ্ডের মতো ভেসে গেলেন, কারণ তিনি ৮ ঘণ্টা রোজের বিরোধিতা করেছিলেন। গ্লাসগোতে ২টি, সলফোর্ডে ১টি এবং আবও একাধিক নির্বাচন কেন্দ্রে শ্রমিকদের স্বতন্ত্র প্রার্থীরা দুটি পুরাতন পার্টিরই প্রার্থীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাঁরা অবশ্য হেরে গেছেন, কিন্তু উদারনীতিক প্রার্থীরাও জিততে পারেননি। এক কথায়, একাধিক বড় শহরে এবং শিল্পপ্রধান নির্বাচনী অঞ্চলে শ্রমিকরা সুনিশ্চিতভাবেই পুরাতন পার্টিগুলির সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এবং তারই ফলে এমন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাফল্য অর্জন করেছে যা আগেকার কোনো নির্বাচনে দেখা যায়নি। আর তারই জন্য মেহনতী জনতাব মধ্যে আনন্দ উন্দাম। ভোটাধিকারকে নিজ শ্রেণীর স্বার্থে ব্যবহার করলে কী করা যায় তা এই প্রথম তাবা দেখল এবং অনুভব করল। 'মহান উদারনৈতিক পার্টি' সম্পর্কে কুসংস্কারগত বিশ্বাসের যে মোহ প্রায় ৪০ বছব ধবে ইংবেজ শ্রমিক শ্রেণীকে আচ্ছন্ন কবে রেখেছিল, তা আজ ভেঙ্গেছে। একাধিক চাঞ্চল্যকর উদাহরণ থেকে তারা বুঝেছে যে, তারা শ্রমিকবাই হল ইংলণ্ডে চূড়ান্ত শক্তি, খালি যদি তাবা চায় আব কী চায় সেটা জানে। ১৮৯২-এর নির্বাচন থেকে সেই জানা ও চাওয়ার সূত্রপাত। বাকি যা করাব, ইউবোপ মহাদেশেব শ্রমিকদেব আন্দোলন তাব ব্যবস্থা করবে। জার্মান ও ফরাসী শ্রমিকদেব ইতিমধ্যেই পার্লামেণ্টে ও স্থানীয় কাউন্সিলগুলিতে বহুসংখ্যায় প্রতিনিধি রয়েছে, তাবা আবও সাফল্য অর্জনের মধ্য দিয়ে ইংরেজদেব মধ্যে প্রতিযোগিতাব মনোভাব উপযুক্ত মাত্রায় চালু বাখবে। এবং অদূবে ভবিষ্যতে যদি দেখা যায় যে, এই নতুন পার্লামেণ্ট মিঃ গ্ল্যাডস্টোনকে নিয়ে বিশেষ কিছু কবে উঠতে পারছে না আর মিঃ গ্ল্যাডস্টোনও এই পার্লামেণ্টকে নিয়ে কিছু কবে উঠতে পাবছেন না, তাহলে ইংরেজ শ্রমিক পার্টি ততদিনে নিশ্চযই এতটা সংগঠিত হযে উঠবে যাতে পুরাতন দুই পার্টি যেভাবে একের পব এক সরকারের আসনে বসে আসছে এবং ঠিক এই কায়দায বুর্জোয়াদেব শাসন চিরস্থাযী কবে বাখছে, তাদের সেই নাগবদোলা খেলার দ্রুত অবসান ঘটাতে পারবে। — সম্পাঃ

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

ফ্রান্স ও জার্মানির কৃষক সমস্যা

সর্বত্র সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে কৃষক সমস্যা আজ হঠাৎ কেন আশু আলোচ্যের মধ্যে স্থান পেয়েছে তা নিয়ে বুর্জোয়া ও প্রতিক্রিয়াশীল পার্টিগুলির মধ্যে খুবই বিস্ময় সঞ্চার হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, অনেকদিন আগেই এই আলোচনা শুরু হয়নি বলেই তাদের বিস্মিত হওয়া উচিত ছিল। আয়র্ল্যান্ড থেকে সিসিলি, আন্দালুসিয়া থেকে রাশিয়া ও বুলগেরিয়া পর্যন্ত কৃষকরা জনসংখ্যা, উৎপাদন ও রাজনৈতিক ক্ষমতার এক অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। ব্যতিক্রম হল পশ্চিম ইউরোপের শুধু দুটো অঞ্চল। খাস গ্রেট ব্রিটেনে বড় বড় ভূসম্পত্তি ও বৃহদায়তন কৃষি ব্যবস্থা স্ব-নির্ভর কৃষকের স্থান সম্পূর্ণ দখল করে নিয়েছে; এলবা নদীর পূর্বতীরের প্রাশিয়ায় কয়েক শত বছর ধরে এই প্রক্রিয়া চলে আসছে; এখানেও কৃষককে ক্রমেই বেশী সংখ্যায় 'বিতাড়িত' করা হচ্ছে বা অন্তত অর্থনীতিক ও রাজনীতিক দিক থেকে আড়ালে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

এতদিন পর্যন্ত কৃষক কেবল তার উদাসীনতার মধ্য দিয়েই রাজনৈতিক ক্ষমতার কারিকা রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। গ্রাম্য জীবনের বিচ্ছিন্নতার মধ্যেই তার সেই ঔদাস্যের মূল নিহিত। জনসংখ্যার বিপুল অংশের এই ঔদাস্য প্যারিস ও রোমে পার্লামেণ্টী দুর্নীতিরই শুধু নয়, রুশ স্বেচ্ছাতন্ত্রেরও দৃঢ়তম স্তম্ভ। অথচ এ অনীহা মোটেই দুর্লঙ্ঘ্য নয়। পশ্চিম ইউরোপে, বিশেষত ছোট কৃষক মালিকানার অঞ্চলে, শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের অভ্যুত্থানের পর থেকে, কৃষকদের চোখে সমাজতন্ত্রী শ্রমিকদের সন্দেহভাজন ও বিরাগভাজন করে তোলা খুব কঠিন হয়নি; কৃষকদের কাছে সমাজতন্ত্রী শ্রমিকদের এমনভাবে দেখান হয়েছে যেন এরা হল কুঁড়ে লোভী একদল শহুরে লোক, যারা কৃষকদের সম্পত্তির উপর নজর দিয়েছে, partageux, যারা চায় কৃষকদের সম্পত্তি ভাগবাটোয়ারা করে নিতে। ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারির বিপ্লবের ধোঁয়াটে সমাজতন্ত্রী আশা আকাঙ্ক্ষাকে অতি দ্রুত সমাধি দেওয়া হয় ফরাসী কৃষকদের প্রতিক্রিয়াশীল ভোটের জোরেই; কৃষক মানসিক শান্তি চেয়েছিল, তার সযত্নে রক্ষিত স্মৃতিকোষ থেকে সে কৃষকের সম্রাট নেপোলিয়নের কিংবদন্তী বের করে আনল, এবং দ্বিতীয়

সাম্রাজ্য* সৃষ্টি করল। কৃষকদের এই একটা কৃতিত্বের কী মূল্য ফরাসী জনগণকে দিতে হয়েছে তা আমরা সবাই জানি; সে দুর্ভাগ্যের জের আজও চলছে।

কিন্তু তারপর অনেক কিছুই বদলে গেছে। পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার বিকাশের ফলে কৃষিতে ক্ষুদ্র উৎপাদনের জীবনসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে; ক্ষুদ্র উৎপাদন অনিবার্য গতিতে উচ্ছন্নের দিকে চলছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং ভারতের প্রতিযোগিতাও সস্তা শস্যে ইউরোপের বাজার ভাসিয়ে দিয়েছে, সে শস্য এত সস্তা যে ইউরোপের কোনো উৎপাদক তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। বড় বড় ভূস্বামী আর ছোটখাট কৃষক উভয়েই আজ ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। উভয়েই জমির মালিক এবং উভয়েই গ্রামবাসী, তাই বড় ভূস্বামীরা ছোট কৃষকদের স্বার্থের রক্ষক বলে নিজেদের জাহির করছে এবং ছোট কৃষকরাও তাদের সেইভাবে মোটের উপর স্বীকার করছে।

ইতিমধ্যে পশ্চিমাংশে এক শক্তিশালী সমাজতন্ত্রী শ্রমিক পার্টি গড়ে উঠেছে এবং বিকাশ লাভ করেছে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময়কার অস্পষ্ট সব ধারণা ও অনুভূতি আজ পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে, বিস্তৃততর ও গভীরতর হয়েছে এবং সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন সম্মত এক কর্মসূচির আকার নিয়েছে যার মধ্যে স্থান পেয়েছে একাধিক নির্দিষ্ট বাস্তব দাবী; ক্রমবর্ধমানসংখ্যক সমাজতন্ত্রী প্রতিনিধিরা জার্মান, ফরাসী ও বেলজিয়ান পার্লামেণ্টে এইসব দাবী নিয়ে সংগ্রাম করছেন। সমাজতন্ত্রী পার্টির দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল আজ আর সুদূর ভবিষ্যতের ব্যাপার নয়। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে হলে এই পার্টিকে প্রথমে শহর থেকে গ্রামে প্রবেশ করতে হবে, গ্রামাঞ্চলে একটা শক্তি হয়ে উঠতে হবে। অন্য সকলের তুলনায় এই পার্টির এই একটা বিশেষ সুবিধা রয়েছে যে, অর্থনৈতিক কারণ এবং রাজনৈতিক পরিণতি এই দুইয়ের অন্তঃসম্পর্ক সম্বন্ধে তার স্পষ্ট অন্তদৃষ্টি আছে এবং তাতে করে কৃষকের নাছোড়বান্দা বন্ধু এইসব বড় বড় ভূস্বামীদের মেষচর্মাবৃত নেকড়ের স্বরূপ সে অনেকদিন আগেই ধরে ফেলেছে। এই পার্টির পক্ষে কি সম্ভব ভাগ্যাহত কৃষককে তার কপট রক্ষাকর্তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া, যাতে শেষ পর্যন্ত কৃষক শিল্প-শ্রমিকের নিষ্ক্রিয় বিরোধী থেকে সক্রিয় বিরোধীতে পরিণত হয়? এতে আমরা কৃষক সমস্যার কেন্দ্রীয় কথায় পৌঁছচ্ছি।

১

গ্রামের যে জনতার প্রতি আমরা কথা বলতে পারি তাদের মধ্যে অনেকরকমের ভাগ আছে এবং বিভিন্ন অঞ্চলেও তার সবিশেষ বিভিন্নতা দেখা যায়।

* দ্বিতীয় সাম্রাজ্য (১৮৫২ সালের ২রা ডিসেম্বর থেকে ১৮৭০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর) — সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সরকারাধীন ফরাসী দেশের একটা ঐতিহাসিক পর্ব। — সম্পাঃ

পশ্চিম জার্মানিতে, ফ্রান্স ও বেলজিয়মেরই মতো ছোটজোতের মালিক কৃষকদের ক্ষুদ্রায়তন কৃষিরই প্রাধান্য। এদের মধ্যে অধিকসংখ্যকই নিজ নিজ জমিখণ্ডের মালিক এবং অল্পাংশ সে জমি ইজারায় নিয়েছে।

উত্তর-পশ্চিমে — নিম্ন স্যাক্সনি ও শ্লেজভিগ-হলস্টাইনে — বড় এবং মাঝারি চাষীর প্রাধান্য দেখতে পাই। পুরুষ এবং স্ত্রী ক্ষেতমজুর তো বটেই, এমনকি দিনমজুর ছাড়াও এদের চলে না। বাভেরিয়ার একাংশ সম্পর্কেও একথা খাটে।

এলবা নদীর পূর্বতীরের প্রাশিয়ায়, এবং মেখ্লেনবার্গে দেখা যায় বড় বড় ভূসম্পত্তি এবং চাকরবাকর, ক্ষেতমজুর ও দিনমজুর দিয়ে বৃহদায়তন চাষের অঞ্চল, আর তাদেরই মাঝে মাঝে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্রমক্ষীয়মান সংখ্যায় ছোট ও মাঝারি কৃষক।

মধ্য জার্মানিতে উৎপাদন ও মালিকানার এইসব রূপই ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে মিশে আছে দেখা যায়। কোনো বড় অঞ্চল জুড়ে কোনো একটা বিশেষ রূপের সুস্পষ্ট প্রাধান্য নেই।

এগুলি ছাড়াও ছোট বড় এমন সব অঞ্চল আছে যেখানে নিজস্ব বা ইজারায় নেওয়া আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ পরিবারের জীবিকা নির্বাহের পক্ষে যথেষ্ট নয়, সে পরিমাণ জমি কেবল পারিবারিক কোনো বৃত্তিরই ভিত্তি হতে পারে এবং তারই সাহায্যে সে বৃত্তি অন্যথা অকল্পনীয় কম মজুরি দিতে পারে, ফলে সমস্ত বৈদেশিক প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও তার উৎপন্ন মালের নিয়মিত বিক্রি সুনিশ্চিত থাকে।

এই গ্রাম্য জনতার কোন কোন অংশকে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি পক্ষে আনতে পারে? আমরা অবশ্য খুবই মোটামুটিভাবে এই প্রশ্নের আলোচনা করব: সুনির্দিষ্ট রূপগুলিই কেবল আমরা বেছে নেব। মধ্যবর্তী স্তর বা মিশ্রিত গ্রাম্য জনতা সম্পর্কে আলোচনা করার মতো স্থান এখানে নেই।

ছোট কৃষককে নিয়েই শুরু করা যাক। পশ্চিম ইউরোপে সাধারণভাবে সমস্ত কৃষকের মধ্যে এই ছোট কৃষকের স্থানই যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেবল তাই নয়, তার স্থান সেই সন্ধিবিন্দুতে যার উপর সমগ্র প্রশ্নটিরই সমাধান নির্ভর করে। একবার নিজেদের মনে ছোট কৃষকদের সম্পর্কে মনোভাব আমরা ঠিক করে নিতে পারলে গ্রাম্য জনতার অন্যান্য অংশের প্রতি আমাদের মত স্থির করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত নির্ভরবিন্দু আমাদের হাতে এসে যায়।

নিজে এবং নিজ পরিবারের সাহায্যেই যতটা চাষ করা যায়, তার চেয়ে বড় নয়, এবং যতটুকু থেকে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন চলে, তার চেয়ে ছোট নয়, — ছোট কৃষক বলতে এখানে আমরা সেইরকম এক খণ্ড জমির মালিক বা ইজারাদার, বিশেষত মালিককেই, বোঝাছি। ঠিক ছোট হস্তশিল্পীদের মতো এই ছোট কৃষকও তাহলে একজন শ্রমজীবী,

আধুনিক প্রলেতারীয়ের সঙ্গে তার পার্থক্য এই যে, সে এখনও তার শ্রমের হাতিয়ারের মালিক, এবং সেইজন্যই সেটা এক বিগত উৎপাদন-পদ্ধতির জের। ভূমিদাস, অধীন চাষী বা অতি ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে খাজনা দিতে ও সামন্ত দায় পালনে বাধ্য মুক্ত কৃষক — এইসব পূর্বপুরুষদের সঙ্গে এইসব ছোট কৃষকের পার্থক্য তিনদিক থেকে। প্রথম পার্থক্য এইখানে যে, ভূস্বামীর কাছে তার যে সামন্ত বাধ্যবাধকতা ও দেয় ছিল তা থেকে ফরাসী বিপ্লব তাকে মুক্ত করেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে, অন্তত রাইন নদীর বামতীরে, তারই হাতে নিজস্ব স্বাধীন সম্পত্তিরূপে তার কৃষি জোত তুলে দিয়েছে। দ্বিতীয় পার্থক্য এইখানে যে, স্বয়ংশাসিত মার্ক গোষ্ঠীর আশ্রয় এবং তাতে অংশ নেবার অধিকার সে হারিয়েছে এবং তাই আগেকার এজমালি জমির উপর তার অংশ থেকেও সে বঞ্চিত হয়েছে। এজমালি মার্ককে ঝাপ্টা মেরে সরিয়ে দেয় অংশত আগেকার সামন্ত প্রভুরা এবং অংশত রোমান আইনের আদর্শে রচিত উদারনীতিক আমলাতান্ত্রিক আইনকানুন। এর ফলে, পশু খাদ্য না কিনেই ভারবাহী পশুদের খাওয়াবার যে সুযোগ ছিল তা থেকে আধুনিক কালের ছোট কৃষক বঞ্চিত হল। অবশ্য অর্থনৈতিকভাবে সামন্ত বাধ্যবাধকতা উঠে যাওয়ার ফলে যে লাভ হয়েছে তার চেয়ে এজমালি জমির উপর অধিকার হারিয়ে তার লোকসান হয়েছে অনেক বেশী; নিজস্ব ভারবাহী পশু রাখতে পারে না এমন কৃষকের সংখ্যা অনবরত বেড়ে চলছে। তৃতীয়ত, কৃষক আজ আগেকার উৎপাদনী কার্যকলাপের অর্ধেক হারিয়েছে। আগে সে আর তার পরিবার মিলে, তার নিজেরই উৎপন্ন কাঁচামাল থেকে নিজের প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্যের অধিকাংশ উৎপাদন করত; অবশিষ্ট প্রয়োজন মেটাত তার প্রতিবেশীরা, এরাও চাষবাসের পাশাপাশি কোনো না কোনো একটি বৃত্তি অনুসরণ করত এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মূল্য পেত দ্রব্য বিনিময় করে বা পরস্পরের বদলি কাজ মারফত। প্রতিটি পরিবার, বিশেষ করে প্রতিটি গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ; নিজেদের প্রয়োজন প্রায় সবকিছুই তারা নিজেরাই উৎপাদন করত। সে ছিল প্রায় অবিমিশ্র স্বভাব অর্থনীতি; টাকার প্রায় কোন প্রয়োজনই ছিল না। পুঁজিবাদী উৎপাদন এই অবস্থার অবসান ঘটাল মুদ্রা অর্থনীতি ও বৃহদায়তন শিল্পের দ্বারা। কিন্তু এজমালি জমি যদি কৃষকের অস্তিত্বের প্রথম মূল শর্ত বলে ধরা হয়, তবে শিল্পগত এই গৌণ বৃত্তি তার দ্বিতীয় শর্ত। এবং এইভাবেই কৃষক আরও গভীরে ডুবতে থাকে। করভার, শস্যহানি, উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা আর মামলা মকদ্দমা, সব মিলে একজনের পর একজন কৃষককে মহাজনের কবলে ঠেলে দেয়, ঋণগ্রস্ততা ক্রমেই আরও সর্বজনীন এবং প্রত্যেক ব্যক্তি-কৃষকের ক্ষেত্রেই আরো দুঃসহনীয় হয়ে উঠে — এক কথায়, বিগত উৎপাদন-পদ্ধতির অন্য সব অবশেষের মতোই, আমাদের ছোট কৃষকও নিশ্চিতভাবেই ধ্বংসের মুখে যাচ্ছে। সে একজন ভবিষ্যৎ প্রলেতারীয়।

এইদিক থেকে সমাজতন্ত্রী প্রচারে তার সাগ্রহেই সাড়া দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তার দৃঢ়মূল সম্পত্তিবোধ তাকে সাময়িকভাবে বাধা দিচ্ছে। তার বিপন্ন জমিটুকু রক্ষা করা যতই কঠিন হয়ে ওঠে, ততই সে আরও বেপরোয়াভাবে তাকে আঁকড়ে ধরে, আর যে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা সমস্ত ভূসম্পত্তি সমগ্র সমাজের হাতে তুলে দেবার কথা বলে তাদেরকে সে মহাজন আর উকিলদের মতোই বিপজ্জনক শত্রু বলে ভাবতে থাকে। তাদের এই কুসংস্কারকে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা কী উপায়ে জয় করতে পারে? নিজেদের প্রতি অসৎ না হয়ে থেকেও ধ্বংসোন্মুখ ছোট কৃষককে তারা কী দিতে পারে?

এই প্রসঙ্গে মার্কসবাদী ঝোঁকের ফরাসী সমাজতন্ত্রীদের কৃষি কর্মসূচি থেকে আমরা একটি ব্যবহারিক নির্ভরবিন্দু পাই; ছোট কৃষক অর্থনীতির চিরায়ত দেশ থেকে এসেছে বলেই এই কর্মসূচিটি আরো অনুধাবনযোগ্য।

১৮৯২-এ অনুষ্ঠিত মার্সাই কংগ্রেসে পার্টির প্রথম কৃষি কর্মসূচি গৃহীত হয়। তাতে সম্পত্তিহীন ক্ষেত **মজুরদের** (অর্থাৎ দিনমজুর ও চাকরবাকরদের) জন্য দাবি করা হয়: ট্রেড ইউনিয়ন ও গোষ্ঠীর সভাগুলি দ্বারা নির্ধারিত সর্বনিম্ন মজুরি; গ্রাম্য বৃত্তি-আদালত, যার অর্ধেক সভ্য হবে শ্রমিক; গোষ্ঠীর জমি বিক্রয় নিষিদ্ধ করা এবং রাষ্ট্রীয় জমি গোষ্ঠীর কাছে ইজারা দেওয়া, এই গোষ্ঠীগুলো সমস্ত জমি — তা সে জমি নিজেদের হোক বা ইজারা নেওয়াই হোক — মিলিত চাষের জন্য সম্পত্তিহীন ক্ষেতমজুর পরিবারদের নিয়ে গঠিত সমিতিকে ইজারা দেবে এই শর্তে যে, তারা মজুরি-শ্রমিক নিয়োগ করতে পারবে না, গোষ্ঠী তাদের ওপর তদারক করবে; বার্ধক্য ও অসুস্থতার জন্য পেনশন, তার খরচ চালান হবে বড় বড় ভূসম্পত্তির উপর বিশেষ কর বসিয়ে।

ইজারাদারদের কথাও বিশেষ বিবেচনা করে, কর্মসূচিতে **ছোট কৃষকদের** জন্য এই দাবি করা হয়েছে: গোষ্ঠী চাষের যন্ত্রপাতি কিনে সেগুলি পড়তা খরচায় কৃষকদের কাছে ইজারা দেবে; সার, পয়ঃপ্রণালীর পাইপ, বীজ প্রভৃতি ক্রয় এবং উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য কৃষকদের সমবায় সমিতি গঠন; ৫,০০০ ফ্রাঁর বেশি মূল্যের ভূসম্পত্তি না হলে তার উপর থেকে হস্তান্তর কর তুলে নেওয়া; অতিরিক্ত খাজনা কমাবার জন্য এবং যে ইজারাদার বা ভাগচাষী (métayers) জমি ছেড়ে দিচ্ছে তার শ্রমের মধ্যে দিয়ে জমির উন্নতির দরুন তাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য আইরিশ আদর্শে সালিশী আদালত; দেওয়ানী বিধির যে ২১০২ নং ধারা জমিদারদের হাতে ফসল ক্রোক করার অধিকার দিয়েছে সেই ধারা রদ এবং কেটে তোলার আগে মাঠের ফসল বন্ধকী দখলের যে ক্ষমতা মহাজনদের আছে তার অবসান; চাষের যন্ত্রপাতি এবং ফসল, বীজ, সার, ভারবাহী পশু, এককথায় কাজ চালাবার জন্য চাষীর একান্ত প্রয়োজনীয় সবকিছুতে বন্ধকী দখল নিষিদ্ধ করা; বহুদিন থেকেই অচল হয়ে পড়া সাধারণ মোকররী তালিকার

সংশোধন, এবং যতদিন তা না হয় ততদিন প্রতি গোষ্ঠীতে স্থানীয় সংশোধন; সর্বশেষে, চাষ সম্পর্কে বিনামূল্যে শিক্ষাদান ব্যবস্থা এবং পরীক্ষামূলক কৃষিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।

দেখা যাচ্ছে যে, কৃষকদের জন্য যেসব দাবি করা হয়েছে — শ্রমিকদের জন্য দাবিগুলি আপাতত আমাদের আলোচ্য নয় — সেগুলি খুব সুদূরপ্রসারী নয়। এর একাংশ ইতিমধ্যেই অন্যান্য কোনো কোনো দেশে প্রচলিত হয়েছে। ইজারাদারদের সালিশী আদালত যে আইরিশ আদর্শ থেকে নেওয়া হয়েছে, সেকথা তো স্পষ্ট। কৃষকদের সমবায় সমিতি রাইন প্রদেশে আগে থেকেই আছে। মোকররী তালিকার সংশোধন সারা পশ্চিম ইউরোপের সমস্ত উদারপন্থী, এমনকি আমলাদেরও চিরকালের সাধু ইচ্ছা। অন্যান্য দাবিগুলিও বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গুরুতর কোন হানি না করে কার্যে পরিণত করা যায়। কর্মসূচিটির চরিত্র বর্ণনা করার জন্যই এত আলোচনা, তিরস্কার এর উদ্দেশ্য নয়, বরং ঠিক তার বিপরীত।

ফ্রান্সের অতি বিভিন্ন ধরনের সব অঞ্চলে এই কর্মসূচি নিয়ে পার্টি এত চমৎকার সাফল্য অর্জন করেছে যে, কৃষকদের রুচির সঙ্গে এটিকে আরও খাপ খাইয়ে নেবার সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে লাগল, কেননা খেতে পেলেই ক্ষিদে বাড়ে। সেইসঙ্গে অবশ্য এও বোঝা গেল যে, এতে বিপজ্জনক পথে পা দেওয়া হবে। সাধারণ সমাজতন্ত্রী কর্মসূচির মূলনীতিগুলি লংঘন না করে কৃষককে, ভবিষ্যৎ প্রলেতারীয় রূপে নয়, আজকের সম্পত্তি-মালিক কৃষককে কি সাহায্য করা সম্ভব? এই আপত্তি খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে নূতন ব্যবহারিক প্রস্তাবগুলির আগে একটি তত্ত্বগত মুখবন্ধ যোগ করে দেওয়া হল, তাতে প্রমাণ করার চেষ্টা হল যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্তির হাত থেকে ছোট কৃষকের সম্পত্তি রক্ষা করা সমাজতন্ত্রের নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, যদিও একথা ভাল করেই জানা আছে যে, সে ধ্বংস অনিবার্য। এ বছর সেপ্টেম্বর মাসে নাণ্টেস কংগ্রেস এই মুখবন্ধটি এবং তার সঙ্গে দাবিগুলিও গৃহীত হয়। এবার উভয়কেই আরও একটু মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করা যাক।

মুখবন্ধটি শুরু হয়েছে এইভাবে:

'যে-হেতু, পার্টির সাধারণ কর্মসূচি অনুসারে উৎপাদকেরা মুক্ত হতে পারে কেবল উৎপাদন-উপায়ের উপর তাদের মালিকানা বর্তালে;

'যে-হেতু, শিল্পক্ষেত্রে এই সমস্ত উৎপাদন-উপায় ইতিমধ্যেই পুঁজিবাদী কেন্দ্রীকরণের এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, যৌথ বা সামাজিকরূপে ছাড়া সেগুলি উৎপাদকদের হাতে প্রত্যর্পণ করা যায় না, অথচ কৃষির ক্ষেত্রে — অন্তত বর্তমান ফ্রান্সে — অবস্থা মোটেই সেরকম নয়, কেননা, উৎপাদন-উপকরণ অর্থাৎ জমি বহু অঞ্চলে এখনও এক একজন উৎপাদকের হাতে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে বর্তমান;

'যে-হেতু, ক্ষুদ্রায়তন মালিকানা যার বৈশিষ্ট্য সেই বর্তমান ব্যবস্থার ধ্বংস অনিবার্য হলেও (est fatalement appelé à disparaître) সে ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করা সমাজতন্ত্রের কাজ নয়, কেননা শ্রমের কাছ থেকে সম্পত্তি বিচ্ছিন্ন করা তার কর্তব্য নয়, বরং তার বিপরীত, সর্বপ্রকার উৎপাদনের এই দুই উপাদানকে একই হাতে ন্যস্ত করে এক করে দেওয়াই তার কর্তব্য — প্রলেতারিয়েতে পরিণত শ্রমিকের দাসত্ব ও দারিদ্র্য এই দুই উপাদানের বিচ্ছিন্নতারই ফল;

'যে-হেতু, একদিকে যেমন বড় বড় ভূসম্পত্তির বর্তমান অলস মালিকদের উচ্ছেদ করে যদি সেই সমস্ত ভূসম্পত্তির উপরে কৃষক প্রলেতারীয়দের যৌথ বা সামাজিক মালিকানার অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সমাজতন্ত্রের কর্তব্য হয়, তাহলে অপরদিকেও তেমনি যে কৃষক নিজ ভূমিখণ্ডের দখল রেখে নিজেই চাষ করে তাকে করভার, সুদখোর মহাজন এবং নতুন গজিয়ে ওঠা বড় বড় জমিদারদের কবল থেকে বাঁচিয়ে রাখাও সমাজতন্ত্রের কম জরুরী কর্তব্য নয়;

'যে-হেতু যেসব উৎপাদনকারী ইজারাদার বা ভাগচাষী (métayers) হিসাবে অন্য মালিকের জমি চাষ করে এবং যারা নিজেরা দিন মজুরদের শোষণ করলেও সেটা করতে খানিকটা বাধ্য হয় তারা নিজেরাও শোষিত হয় বলেই, তাদেরও জন্য উপরোক্ত রক্ষা ব্যবস্থা প্রযোজ্য হওয়া যুক্তিযুক্ত, —

'তাই শ্রমিক পার্টি, যে পার্টি নৈরাজ্যবাদীদের মতো সমাজব্যবস্থা রূপান্তরের জন্য দারিদ্র্যের বৃদ্ধি ও বিস্তারের উপর নির্ভর করে না, বরং বিশ্বাস করে যে, শহর ও গ্রামের মেহনতীদের সংগঠন ও মিলিত প্রচেষ্টায়, সরকার ও আইনপ্রণয়ন ব্যবস্থা স্বহস্তে অধিকার করার মাধ্যমেই কেবলমাত্র শ্রম ও সমাজের মুক্তি লাভ সম্ভব, — সেই শ্রমিক পার্টি নিম্নলিখিত কৃষি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, যাতে গ্রামীণ উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত অংশকে, ভিন্ন ভিন্ন অধিকার ও পাট্টার বলে যেসব বৃত্তিতে জাতীয় ভূমি-সম্পদ ব্যবহার করা হয় সেইসব বৃত্তিকে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ভূস্বামী সামন্ত প্রথার বিরুদ্ধে একই সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করা যায়।'

এবার এই সব 'যে-হেতু' আর একটু মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করা যাক।

প্রথমত, উৎপাদকদের মুক্তির পূর্বশর্ত হচ্ছে উৎপাদন-উপায়ের উপর তাদের অধিকার, ফরাসী কর্মসূচির এই উক্তিটীর সঙ্গেই জড়িত পরের কথাগুলি যোগ করে নেওয়া একান্ত দরকার যে, উৎপাদন-উপায়ের উপর অধিকার মাত্র দুটি রূপে সম্ভব, হয় ব্যক্তিগত অধিকাররূপে, সমস্ত উৎপাদকদের ক্ষেত্রে এই অধিকার কখনও কোথাও ছিল না এবং শিল্প প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও অসম্ভব হয়ে উঠছে; নতুবা সাধারণের অধিকাররূপে. পুঁজিবাদী সমাজের নিজস্ব বিকাশের মধ্য দিয়েই এই ধরনের অধিকারের বৈষয়িক ও মানসিক ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে; এবং সেইজন্যই, প্রলেতারিয়েতকে তার

ক্ষমতাধীন সমস্ত উপায় দিয়ে উৎপাদন-উপায়ের উপর **যৌথ** অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে হবে।

এইভাবে, উৎপাদন-উপায়গুলির উপর সাধারণ অধিকার প্রতিষ্ঠাই এখানে একমাত্র প্রধান লক্ষ্য বলে উপস্থিত করা হচ্ছে, যারই জন্য লড়াই করতে হবে। ইতিমধ্যেই যার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে সেই শিল্পক্ষেত্রেই কেবল তা নয়, সাধারণভাবেই, সুতরাং কৃষিক্ষেত্রেও। কর্মসূচি অনুসারে সব উৎপাদকের ক্ষেত্রে কখনও কোথাও ব্যক্তিগত অধিকার থাকেনি, আর ঠিক সেই কারণেই, এবং তাছাড়াও শিল্পপ্রগতি যখন শেষ পর্যন্ত এর অবসান ঘটাবেই, তখন একে বজায় রাখায় সমাজতন্ত্রের কোনো আগ্রহ নেই, বরং এর অপসারণেই তার আগ্রহ, কেননা এই ধরনের অধিকার যেখানে যতটা পরিমাণে বর্তমান সেখানে ততটা পরিমাণে সাধারণের অধিকার অসম্ভব হয়ে পড়ে। কোনো বক্তব্যের সমর্থনে কর্মসূচির উল্লেখ করতে হলে সমস্ত কর্মসূচির উল্লেখ করা দরকার। তাতে নাণ্টেস-এ উদ্ধৃত প্রতিপাদ্যটা বেশ কিছুটা বদলে যায়, কেননা তাতে করে অভিব্যক্ত সাধারণ ঐতিহাসিক সত্যটাকে সেই শর্তসাপেক্ষ করা হচ্ছে, যা থাকলে তবেই তা আজ পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় সত্য হতে পারে।

নিজ উৎপাদন-উপায়ের উপর অধিকার থাকলেই একজন উৎপাদক প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে, সে অবস্থা আর নেই। শহরাঞ্চলে হস্তশিল্প তো ইতিমধ্যেই ধ্বংস পেয়েছে, লণ্ডনের মতো মহানগরীগুলিতে তার আর কোনো চিহ্নও চোখে পড়ে না, তার স্থান নিয়েছে বৃহদায়তন শিল্প, রক্ত-নিংড়ানো কারখানা ব্যবস্থা আর সেই হতভাগা প্রবঞ্চকদের দল, দেউলিয়াপনার প্রসাদে যাদের জীবনযাপন ঘটে। স্ব-নির্ভর কৃষকের নিজের ছোট জমির ফালিটুকুর উপর অধিকারও নিরাপদ নয়, স্বাধীনতাও তার নেই। তার ঘরবাড়ি, তার খামার, তার সামান্য কয়েক টুকরো জমি এবং তার সঙ্গে সে নিজে পর্যন্ত মহাজনের সম্পত্তি; তার জীবিকা প্রলেতারীয়ের চেয়েও অনিশ্চিত, সে তবু মাঝে মাঝে দু-একটা দিন শান্তিতে থাকতে পায়, চিরলাঞ্ছিত ঋণদাস সেটুকুও কখনও পায় না। দেওয়ানী বিধির ২১০২ নং ধারা তুলে দিন, আইনে ব্যবস্থা করে দিন যাতে কৃষকের চাষের সরঞ্জাম ও ভারবাহী পশু ক্রোক থেকে অব্যাহতি পাবে, তবু তাকে সেই নিরুপায় অবস্থা থেকে বাঁচাতে পারবে না, যখন সে 'স্বেচ্ছায়' তার গরু বলদ বেচতে বাধ্য হবে, মহাজনের কাছে দেহমন লিখে দিয়ে সাময়িক রেহাই পেয়ে খুশী হবে। ছোট কৃষককে তার সম্পত্তিতে টিকিয়ে রাখার জন্য আপনাদের এই চেষ্টায় তার স্বাধীনতা রক্ষা পায় না, কেবল তার দাসত্বের বিশেষ রূপটিই বজায় থাকে; শুধু জীবন্মৃত অবস্থাই চালিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তার বাঁচারও উপায় নেই, মরারও উপায় নেই। সুতরাং আপনাদের বক্তব্যের সমর্থনে আপনাদের কর্মসূচির প্রথম অনুচ্ছেদ উল্লেখ করা এখানে একান্তই অপ্রাসঙ্গিক।

মুখবন্ধে বলা হয়েছে, আজকের ফ্রান্সে উৎপাদনের উপায় অর্থাৎ জমি, অনেক অঞ্চলেই এখনও এক একজন উৎপাদকের হাতে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে রয়েছে; এবং শ্রমের কাছ থেকে সম্পত্তি বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া সমাজতন্ত্রের কর্তব্য নয়, বরং সমস্ত উৎপাদনের এই দুই উপাদানকে এক হাতে ন্যস্ত করে মিলিত করাই তার কর্তব্য। -- ইতিপূর্বেই দেখান হয়েছে যে, শেষোক্তিটা এইরকম সাধারণ রূপে, কোনোক্রমেই সমাজতন্ত্রের কর্তব্য নয়। প্রকৃতপক্ষে তার কর্তব্য হচ্ছে কেবল উৎপাদন-উপায়গুলিকে উৎপাদকদের কাছে **সাধারণ মালিকানা** হিসাবে হস্তান্তরিত করা। এই কথাটি ভুলে গেলেই উক্তিটি সরাসরি বিভ্রান্তিকর হয়ে পড়ে, কেননা তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, ছোট কৃষকের নিজ জমির উপর বর্তমানে যে ভুয়া অধিকার আছে তাকে প্রকৃত অধিকারে পরিণত করা, অর্থাৎ ছোট ইজারাদারকে মালিকে পরিণত করা এবং ঋণগ্রস্ত মালিককে ঋণমুক্ত মালিকে রূপান্তরিত করাই সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য। কৃষক মালিকানার এই ভুয়া আপাতদৃশ্যের অবসান সমাজতন্ত্র নিশ্চয়ই চায়, কিন্তু এভাবে নয়।

সে যাই হোক, এত দূর পর্যন্ত যখন এগিয়ে আসা গেল তখন কর্মসূচির মুখবন্ধ এবার সরাসরি ঘোষণা করতে পারে যে, সমাজতন্ত্রের কর্তব্য, শুধু কর্তব্য নয় অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে, 'যে কৃষক নিজ ভূমিখণ্ডের দখল রেখে নিজেই চাষ করে তাকে করভার, সুদখোর মহাজন এবং নূতন গজিয়ে ওঠা বড় বড় জমিদারদের কবল থেকে বাঁচিয়ে রাখা।' এই ভাবে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে যা অসম্ভব বলে ঘোষণা করা হল, এখানে মুখবন্ধে সেই কাজই অপরিহার্য কর্তব্য বলে সমাজতন্ত্রের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কৃষকের ক্ষুদ্রায়তন কৃষি-ব্যবস্থাকে 'বজায় রাখার' ভার দেওয়া হচ্ছে, অথচ এই মুখবন্ধেই বলা হয়েছে যে, এই ধরনের মালিকানার 'ধ্বংস অনিবার্য'। পুঁজিবাদী উৎপাদন যেসব হাতিয়ারে এই অনিবার্য ধ্বংস সংঘটিত করে তা এই করভার, সুদখোর মহাজন এবং নূতন গজিয়ে ওঠা বড় বড় জমিদাররা ছাড়া আর কী? এই 'ত্রিমূর্তি'র কবল থেকে কৃষককে রক্ষার জন্য 'সমাজতন্ত্রকে' যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, সে বিষয় পরে আলোচনা করা হবে।

কিন্তু কেবল ছোট কৃষকের সম্পত্তিকে রক্ষা করলেই হবে না। 'যেসব উৎপাদনকারী ইজারাদার বা ভাগচাষী (métayers) হিসাবে অন্য মালিকের জমি চাষ করে এবং যারা নিজেরা দিনমজুরদের শোষণ করলেও সেটা করতে খানিকটা বাধ্য হয় তারা নিজেরাও শোষিত হয় বলেই, তাদেরও জন্য উপরোক্ত রক্ষা ব্যবস্থা প্রযোজ্য হওয়া যুক্তিযুক্ত।' এবার আমরা সত্যই বিচিত্র জায়গায় এসে পড়লাম। সমাজতন্ত্র বিশেষভাবে মজুরি-শ্রমের শোষণের বিরোধী। অথচ এখানে আক্ষরিকভাবে এই ভাষায় ঘোষণা করা হচ্ছে যে, ফরাসী ইজারাদাররা যখন 'দিনমজুরদের **শোষণ করে**' তখনও তাদের রক্ষা

করা সমাজতন্ত্রের একান্ত কর্তব্য! আর তার কারণ এই যে, 'নিজেরাও শোষিত হয় বলেই' তারা এই শোষণ করতে অনেকটা বাধ্য হয়!

ঢালুতে একবার নামতে শুরু করলে গড়িয়ে যাওয়াটাই কত সহজ আর আরামদায়ক! এবার যখন জার্মানির বড় ও মাঝারি কৃষকরা এই অনুরোধ নিয়ে ফরাসী সমাজতন্ত্রীদের কাছে আসবে যে, তাদের পুরুষ ও মেয়ে ক্ষেতমজুরদের শোষণের ব্যাপারে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি তাদের যাতে রক্ষা করে তার জন্য জার্মান পার্টির কার্যকরী কমিটির কাছে তাঁরা যেন একটু অনুরোধ করেন, এবং সেই বক্তব্যের সমর্থনে দেখাবে যে মহাজন, কর-আদায়কারী, ফসল নিয়ে ফাটকাদার এবং পশু ব্যবসায়ীদের দ্বারা 'তারাও শোষিত হয়', তখন ফরাসী সমাজতন্ত্রীরা কী জবাব দেবেন? আমাদের বড় বড় ভূস্বামীরাও যে কাউণ্ট কনিৎসকে (ইনিও শস্য আমদানির ব্যাপারে রাষ্ট্রের একচেটিয়া স্থাপনের অনুরূপ এক প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন) ফরাসী সমাজতন্ত্রীদের কাছে পাঠিয়ে গ্রাম্য শ্রমিক শোষণ ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে বলবে না এবং এই কথার সমর্থনে ফাটকাবাজার, মহাজন ও শস্য নিয়ে ফাটকাদারদের দ্বারা 'তারা নিজেরাও শোষিত হয়' এই যুক্তি হাজির করবে না, তারই কি কোনো নিশ্চয়তা আছে?

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যে, আমাদের ফরাসী বন্ধুদের উদ্দেশ্য যতটা খারাপ মনে হচ্ছে ততটা খারাপ নয়। জানা গেল যে, উপরের উক্তিটি কেবল একটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই তাঁদের উদ্দেশ্য, সে ক্ষেত্রটি হচ্ছে এই: আমাদের যেসব অঞ্চলে চিনি-বীট চাষ করা হয় সেই সব অঞ্চলেরই মতো উত্তর ফ্রান্সেও বীট চাষ করতেই হবে, এই বাধ্যবাধকতায় ও অত্যন্ত কঠোর শর্তে কৃষকদের জমি ইজারা দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট কোনো কারখানায় নির্দিষ্ট মূল্যে তাদের সেই বীট সরবরাহ করতে হবে, নির্দিষ্ট বীজ কিনতে হবে, জমিতে নির্দিষ্ট সার নির্দিষ্ট পরিমাণে দিতে হবে এবং তারপর ফসল পৌঁছে দেবার সময় নির্মমভাবে ঠকতে হবে। জার্মানিতেও আমরা এই ধরনের ব্যবস্থার সঙ্গে খুবই পরিচিত। কিন্তু এই ধরনের কৃষককে রক্ষা করার কথাই যদি হয়, তবে সে কথা স্পষ্টভাবে খোলাখুলি বলাই উচিত। বাক্যটি এখন যেভাবে আছে তার সেই সাধারণ অসীমাবদ্ধ রূপে কেবল যে ফরাসী কর্মসূচিরই বিরোধিতা করা হয় তাই নয়, সাধারণভাবে সমাজতন্ত্রের মূলনীতিও লঙ্ঘন করা হয়, ফলে বিভিন্ন মহল থেকে যদি তাঁদের অভিপ্রায়েব বিপরীতে অসাবধান সম্পাদনাব এই নিদর্শনটি তাঁদের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হয় তাহলেও রচয়িতাদের পক্ষ থেকে নালিশ করার উপায় থাকবে না।

মুখবন্ধের শেষ কথাটিরও কদর্থ হওয়া সম্ভব। সেখানে বলা হচ্ছে যে 'গ্রামীণ উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত অংশকে, ভিন্ন ভিন্ন অধিকার ও পাট্টার বলে যেসব

বৃত্তিতে জাতীয় ভূমি-সম্পদ ব্যবহার করা হয় সেইসব বৃত্তিকে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে, ভূস্বামী সামন্ত প্রথার বিরুদ্ধে একই সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করা' সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টির কর্তব্য। গ্রামের প্রলেতারিয়েত এবং ছোট কৃষক ছাড়াও, মাঝারি ও বড় কৃষক, এমনকি বড় বড় মহালের ইজারাদার, পুঁজিবাদী পশুপ্রজনন ব্যবসায়ী এবং জাতির ভূমি-সম্পদের অন্যান্য পুঁজিবাদী ব্যবহারকারীদেরও নিজেদের মধ্যে নিয়ে নেওয়া সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টির কর্তব্য হতে পারে, একথা আমি সরাসরি অস্বীকার করি। ভূস্বামী সামন্ততন্ত্র এদের সবারই কাছে শত্রুরূপে দেখা দিতে পারে। কোনো কোনো প্রশ্নে আমরা এদের সঙ্গে সমস্বার্থ হতে বা নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য সাধনের জন্য পাশাপাশি লড়াই করতেও পারি। সমাজের যে-কোন শ্রেণী থেকে আগত ব্যক্তি বিশেষকে আমরা পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি, কিন্তু পুঁজিপতি, মাঝারি বুর্জোয়া বা মাঝারি কৃষক স্বার্থের প্রতিনিধিত্বমূলক কোনো দলে আমাদের কোনোই প্রয়োজন নেই। অবশ্য এক্ষেত্রেও, এঁদের আসল উদ্দেশ্য যতটা খারাপ দেখাচ্ছে ততটা খারাপ নয়। স্পষ্টতই, কর্মসূচির রচয়িতারা এসব দিক সম্পর্কে বিশেষ ভাবেনইনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সাধারণ উক্তির উৎসাহে তাঁরা গা ভাসিয়ে দিয়েছেন, সুতরাং তাঁরা মুখে ঠিক যা বলছেন সেই ভাবেই সেটা নিলে তাঁদের বিস্মিত হওয়া উচিত নয়।

মুখবন্ধের পরই আসে কর্মসূচিরই নতুন সংযোজনীর কথা। এখানেও সেই একই অসাবধান সম্পাদনার পরিচয় পাওয়া যায়।

যে ধারায় বলা হয়েছিল যে, গোষ্ঠীকেই চাষের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে হবে এবং সেগুলি পড়তা খরচায় কৃষকদের কাছে ইজারা দিতে হবে, সেটিকে বদলে এইভাবে দাঁড় করান হয়েছে যে, প্রথমত, গোষ্ঠী এর জন্য রাষ্ট্র থেকে অর্থ সাহায্য পাবে এবং দ্বিতীয়ত, যন্ত্রপাতি ছোট কৃষককে দেওয়া হবে বিনামূল্যে। এই অতিরিক্ত সুবিধায়ও ছোট কৃষকের বিশেষ কোনো উপকার হবে না, কেননা তার ক্ষেত ও উৎপাদন-পদ্ধতি এমনই যে সেখানে যন্ত্রপাতির ব্যবহার অতি সামান্যই সম্ভব।

তারপর, 'বর্তমান সমস্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের পরিবর্তে ৩,০০০ ফ্রাঁর বেশী সমস্ত আয়ের উপর ক্রমবর্ধমান হারে একটিমাত্র আয়কর প্রবর্তন।' — প্রায় প্রত্যেক সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক কর্মসূচিতেই বহু বছর ধরে এই ধরনের একটা দাবি স্থান পেয়ে আসছে। কিন্তু এখানে দাবিটিকে যে ছোট কৃষকদের বিশেষ স্বার্থে তোলা হয়েছে সেটা সত্যই অভিনব, এবং তাতে বোঝা যায় যে, এই দাবির বাস্তব তাৎপর্য কত কম বিবেচনা করা হয়েছে। গ্রেট ব্রিটেনের উদাহরণই ধরা যাক। সেখানে রাষ্ট্রের বাৎসরিক বাজেটের পরিমাণ ৯ কোটি পাউন্ড স্টার্লিং। তার মধ্যে ১ কোটি ৩৫ লাখ থেকে ১ কোটি ৪০ লাখ আসে আয়কর থেকে। বাকি ৭ কোটি ৬০ লাখের একটা ক্ষুদ্রতর অংশ আসে কারবারের উপর শুল্ক থেকে (ডাক, তার ব্যবস্থা থেকে আদায়, স্ট্যাম্প শুল্ক); কিন্তু

বৃহত্তম অংশই আসে সর্বসাধারণের ভোগদ্রব্যের উপর শুল্ক থেকে, দেশবাসীর, বিশেষত তার দরিদ্র অংশের প্রত্যেকের আয় থেকে প্রতিবারে যৎসামান্য, অননুভবযোগ্য একটু করে কেটে কেটে নিয়ে, যার মোট ফল দাঁড়ায় কোটি কোটি পাউন্ড। বর্তমান সমাজে রাষ্ট্রের ব্যয় নির্বাহ করার অন্য কোনো পথ নেই বললেই চলে। ধরে নেওয়া যাক, গ্রেট ব্রিটেনে যাদের আয় ১২০ পাউন্ড স্টার্লিং (৩,০০০ ফ্রাঁ) বা তার বেশী তাদের সকলের উপর প্রত্যক্ষ ক্রমবর্ধমান হারে আয়কর বসিয়ে এই ৯ কোটির বোঝা সবটাই চাপিয়ে দেওয়া হল। গিফেনের মতে, গড় জাতীয় সঞ্চয়, সর্বমোট জাতীয় সম্পদের বাৎসরিক বৃদ্ধি ১৮৬৫-- ১৮৭৫-এ ছিল ২৪ কোটি পাউন্ড স্টার্লিং। ধরে নেওয়া যাক বর্তমানে তার পরিমাণ বাৎসরিক ৩০ কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছে; ৯ কোটি ট্যাক্সের ভার এই সর্বমোট সঞ্চয়ের একতৃতীয়াংশ গ্রাস করবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, সমাজতন্ত্রী সরকার ছাড়া অন্য কোনো সরকার এরকম একটা কাজে হাত দিতে পারে না। আর সমাজতন্ত্রীরা যখন রাষ্ট্রের হাল ধরবে তখন তাদের এমন বহু কাজই করতে হবে যার কাছে কর-ব্যবস্থার এই সংস্কার নিতান্তই একটা তাৎপর্যহীন, আপাতিক আগাম বলে মনে হবে, এবং ছোট কৃষকদের সামনে তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন সম্ভাবনার দরজা খুলে যাবে।

রচয়িতাদের বোধ হয় একথা খেয়াল ছিল যে, কর-ব্যবস্থার এই সংস্কারের জন্য কৃষককে বেশ দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হবে। তাই 'অন্তর্বর্তীকালে' (en attendant) তাদের এই পরিপ্রেক্ষিত দেওয়া হচ্ছে: 'নিজ শ্রমে জীবিকা নির্বাহকারী সমস্ত কৃষকের ভূমিকর থেকে অব্যাহতি এবং সমস্ত বন্ধকী জমির উপর এই করভার হ্রাস।' এই দাবির শেষার্ধ শুধু **বৃহত্তর** জোত নিয়েই সম্ভব, যেগুলির কেবলমাত্র নিজ পরিবার দ্বারা চাষ হয় না; সুতরাং এই ব্যবস্থাও সেইসব কৃষকের অনুকূলে, যারা 'দিনমজুরদের শোষণ করে'।

তারপর 'পশুপাখি, মৎস্য ও শস্য সংরক্ষণের জন্য যে বিধিনিষেধের প্রয়োজন, তাছাড়া অন্য সর্ববিষয়ে শিকার ও মাছ ধরার নিরঙ্কুশ অধিকার'। কথাটা শুনতে খুব জনপ্রিয়, কিন্তু তার প্রথমার্ধের দ্বারা শেষার্ধের নাকচ ঘটান হয়েছে। কৃষক পরিবার প্রতি কটি খরগোস, পাখি বা মাছ আজও গ্রামাঞ্চলে আছে? প্রত্যেক কৃষককে বছরে **একটিমাত্র** দিন শিকার ও মাছ ধরার অধিকার দিলে যত দরকার তার চেয়ে বেশী বলে মনে হয় কি?

'আইনগত ও প্রথাগত সুদের হার হ্রাস' -- সুতরাং, সুদের বিরুদ্ধে নতুন আইন, গত দুহাজার বছর ধরে যে পুলিসী ব্যবস্থা সর্বদেশে সর্বকালে ব্যর্থ হয়েছে তাকে আর একবার চালু করার প্রচেষ্টা। ছোট কৃষক যদি এমন অবস্থায় পড়ে যখন মহাজনের শরণাপন্ন হওয়াই তার কাছে কম বিপদ, তখন মহাজন মহাজনী আইন বাঁচিয়েই তার অস্থিমজ্জা শুষে নেবার উপায় ঠিক বার করে নেবে। এর দ্বারা বড়জোর ছোট কৃষককে

প্রবোধ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার কোনো উপকার এতে হবে না; বরং সবচেয়ে প্রয়োজনের সময় ঋণ পেতে তার আরও অসুবিধারই সৃষ্টি করবে।

'বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং পড়তা খরচায় ঔষধ পাওয়ার ব্যবস্থা' — এটা আর যাই হোক, কেবল কৃষককে রক্ষা করার কোন বিশেষ ব্যবস্থা নয়, জার্মান কর্মসূচি এর চেয়ে অগ্রসর, সেখানে ঔষধও বিনামূল্যে দাবি করা হয়েছে।

'যেসব মজুদ সৈনিকদের সামরিক কাজে ডাকা হয়েছে তাদের পরিবারদের জন্য ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা' — জার্মানি এবং অস্ট্রিয়ায় এই ব্যবস্থা খুবই অসন্তোষজনকভাবে হলেও বর্তমান, তাছাড়া এটাও কেবল কৃষকদের দাবি নয়।

'জমির জন্য সার, চাষের যন্ত্রপাতি ও উৎপন্ন মাল পরিবহণের মূল্য হ্রাস' -- মোটামুটিভাবে জার্মানিতে চালু রয়েছে এবং রয়েছে প্রধানত.. বড় বড় ভূস্বামীদেরই স্বার্থে।

'জমির উন্নতিসাধন এবং কৃষি উৎপাদন বিকাশের উদ্দেশ্যে পূর্তকর্মের একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা রচনার জন্য অবিলম্ব প্রস্তুতি-কাজ' -- এতে সবকিছুই অনিশ্চিত ও মনোরম প্রতিশ্রুতির জগতে থেকে যায় এবং এতেও সর্বোপরি বড় বড় ভূসম্পত্তিরই স্বার্থসাধন হয়।

সংক্ষেপে, মুখবন্ধে প্রদর্শিত প্রচণ্ড তত্ত্বগত প্রচেষ্টার পর, ফরাসী শ্রমিক পার্টি কোন পন্থায় ছোট কৃষককে তার ছোটজোতের অধিকারে টিকিয়ে রাখবে বলে আশা করে, যে অধিকারের ধ্বংস কর্মসূচিরই ভাষায় অনিবার্য -- সেকথা তাদের নূতন কৃষিসংক্রান্ত কর্মসূচির ব্যবহারিক প্রস্তাবের পরও আরও বেশী অস্পষ্ট রয়ে গেল।

২

একটি বিষয়ে আমাদের ফরাসী কমরেডরা সম্পূর্ণ সঠিক: — ফ্রান্সে ছোট কৃষকদের **ইচ্ছার বিরুদ্ধে** কোনো স্থায়ী বিপ্লবী রূপান্তর সম্ভব নয়। তবে আমার মতে, কৃষকদের প্রভাবাধীনে আনাই যদি তাঁদের উদ্দেশ্য হয় তাহলে তাঁরা ঠিক জায়গাটিতে হাত দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

তাঁরা অবিলম্বে, এমনকি সম্ভবত আগামী সাধারণ নির্বাচনে ছোট কৃষকদের নিজের পক্ষে টানতে চান বলে মনে হয়। অত্যন্ত বিপজ্জনক সব সাধারণ প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং তার সমর্থনে আরও বিপজ্জনক সব তত্ত্বগত যুক্তি খাড়া করেই মাত্র তাঁরা এ কাজে সফল হবার আশা করতে পারেন। তার পরে যখন ভালো করে বিচার করা হয় তখন ধরা পড়ে যে, এই সাধারণ প্রতিশ্রুতিগুলি পরস্পর বিরোধী (যে-ব্যবস্থার ধ্বংস নিজেরাই অনিবার্য বলে ঘোষণা করেছেন তাকেই টিকিয়ে রাখার প্রতিশ্রুতি) এবং

যেসব ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে সেগুলি হয় ব্যবহারিকভাবে নিতান্তই নিষ্ফল (মহাজনী আইন), নয়ত তা সাধারণভাবেই শ্রমিকদের দাবি, অথবা এমন দাবি যাতে বড় বড় ভূস্বামীরাও উপকৃত হয়, কিংবা শেষত, এমন দাবি, ছোট কৃষকের স্বার্থ সাধনে যার কোনোদিক থেকেই বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। ফলে, কর্মসূচির প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক অংশ দ্বারা তার ভ্রান্ত প্রথমাংশ আপনা থেকেই সংশোধিত হয় এবং মুখবন্ধের আপাত ভয়াবহ বাগাড়ম্বর বাস্তবে নিরীহ ব্যবস্থায় পরিণত হয়।

কথাটা গোড়াতেই স্পষ্ট বলে নেওয়া যাক: ছোট কৃষকদের সমগ্র অর্থনৈতিক অবস্থা, তাদের শিক্ষাদীক্ষা এবং তাদের বিচ্ছিন্ন জীবনযাত্রা প্রণালী থেকে যে কুসংস্কার উদ্ভূত হয় যাতে ইন্ধন জোগায় বুর্জোয়া সংবাদপত্র আর বড় বড় ভূস্বামীরা, তাতে ছোটো কৃষককে অবিলম্বে পক্ষে টানা সম্ভব কেবল এমন সব প্রতিশ্রুতি দিয়ে যা রক্ষা করা যাবে না বলে আমরা নিজেরাই জানি। অর্থাৎ, যত অর্থনৈতিক শক্তির ঝাপটা তাদের উপর আসছে কেবল তা থেকেই সর্বদা তাদের সম্পত্তি রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলে চলবে না। বর্তমানে তাদের উপর যেসব বোঝা চেপে আছে তা থেকেও মুক্ত করার, ইজারাদারকে স্বাধীন মালিকে পরিণত করার, বন্ধকী দায়ের ভারে মুমূর্ষু মালিককে ঋণ থেকে মুক্ত করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও আমাদের দিতে হবে। এতসব করতে পারলেও আমরা আবার সেইখানেই ফিরে যাব যেখান থেকে ঐ বর্তমান অবস্থার পুনরাবর্তন আবার শুরু হতে বাধ্য। কৃষককে মুক্ত করতে আমরা পারব না, একটা সাময়িক রেহাই দেব শুধু।

কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা গেল না বলে কাল যদি আবার হারাতে হয়, তবে আজ রাতারাতি কৃষককে পক্ষে আনায় আমাদের কোনো স্বার্থ নেই। যে-ছোট কারিগর চিরস্থায়ীভাবে মালিক হতে পারলে খুশী হয় তাকে পার্টিতে এনে যতটা লাভ, যে কৃষক ভাবে যে আমরা তার ক্ষুদ্র জোতের সম্পত্তি চিরস্থায়ী করে দেব তাকে পার্টিতে এনে তার চেয়ে বেশী কোনো লাভ নেই। এ সব লোকের জায়গা সেমেটিক-বিরোধীদের (anti-Semites) কাছে। তাদের কাছেই এরা যাক এবং তারাই এদের ছোট ছোট গৃহস্থালীকে পুনরুদ্ধার করার প্রতিশ্রুতি দিক। এইসব ফাঁকা কথার প্রকৃত মূল্য কী এবং সেমেটিক-বিরোধী স্বর্গ থেকে কোন সুরঝঙ্কার নেমে আসে সে শিক্ষা একবার পেলে, তখন এরা ক্রমেই বুঝবে যে, আমরা যারা অনেক কম প্রতিশ্রুতি দিই এবং মুক্তির অন্য পথ খুঁজি সেই আমরা শেষ পর্যন্ত অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য। আমাদের দেশের মতো তীব্র সেমেটিক-বিরোধী বাগাড়ম্বর-বৃত্তি থাকলে ফরাসীরা কখনই নাণ্টেসের ভুল করতেন না।

ছোট কৃষকদের সম্বন্ধে তাহলে আমাদের মনোভাব কী হবে? ক্ষমতা দখলের সময় তাদের প্রতি কী ধরনের ব্যবহার করা উচিত?

প্রথমেই বলা দরকার, ফরাসী কর্মসূচিতে সঠিকভাবেই বলা হয়েছে যে, ছোট কৃষকদের অনিবার্য ধ্বংস আমরা আগে থেকেই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কোনো হস্তক্ষেপ দ্বারা তাকে ত্বরান্বিত করা আমাদের ব্রত নয়।

দ্বিতীয়ত, এ কথাও সমান স্পষ্ট যে, আমরা যখন রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করব তখন ছোট কৃষকদের জোর করে উৎখাত (ক্ষতিপূরণসহ বা বিনা ক্ষতিপূরণে) করার কথা আমরা চিন্তায়ও স্থান দেব না, কিন্তু বড় বড় ভূস্বামীদের ক্ষেত্রে সেই পথই আমাদের নিতে হবে। ছোট কৃষকদের সম্পর্কে আমাদের কর্তব্য হল, প্রথমত, তাদের ব্যক্তিগত উৎপাদন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সমবায়ী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা, জবরদস্তি করে নয়, উদাহরণ দেখিয়ে, এবং এই উদ্দেশ্যে সামাজিক সাহায্যের প্রস্তাব করে। তখন নিশ্চয় ছোটো কৃষককে তার ভবিষ্যৎ সুবিধা দেখিয়ে দেবার প্রচুর সুযোগ আমরা পাব, যে সুবিধা এমনকি আজই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠার কথা।

ডেনিশ সমাজতন্ত্রীদের দেশে প্রকৃত শহর বলতে একটিই — কোপেনহেগেন, তাই সেই শহরের বাইরে তাদের প্রচার প্রায় একমাত্র কৃষকদের উপর নির্ভরশীল। তাঁরা প্রায় ২০ বছর আগে এই ধরনের পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। এক একটি গ্রাম বা প্যারিশ-এর কৃষকরা — ডেনমার্কে অনেক বড় বড় ব্যক্তিগত গৃহস্থালী আছে — তাদের সমস্ত জমি মিলিত চাষের জন্য একত্র করে একটি একক বৃহৎ খামার গড়ে তুলবে এবং যে যত জমি, অর্থ বা শ্রম দিয়েছে, আয় সেই অনুপাতে ভাগ হবে। ডেনমার্কে ছোট ভূসম্পত্তির ভূমিকা খুবই গৌণ। কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন কৃষি প্রধান কোনো অঞ্চলে এই ধারণাকে কাজে লাগালে দেখা যাবে যে, সব একত্র করে মোট জমিতে বৃহদায়তন পদ্ধতিতে চাষ করলে এযাবৎ নিযুক্ত শ্রমশক্তির একটা অংশ বাড়তি হয়ে পড়বে। এই ধরনের শ্রম বাঁচানোই হচ্ছে বৃহদায়তন পদ্ধতিতে চাষের অন্যতম প্রধান সুবিধা। এই শ্রমশক্তি নিয়োগ করার দুটি পথ হতে পারে। হয়, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বড় বড় ভূসম্পত্তি থেকে অতিরিক্ত জমি নিয়ে কৃষক সমবায়ের হাতে দেওয়া, নয়, এই কৃষকদের আনুষঙ্গিক শিল্পগত কাজের উপায় ও সম্ভাবনা জোগানো, যদিও প্রধানত তাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য। উভয় ক্ষেত্রেই তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে এবং সেইসঙ্গে সমাজের কেন্দ্রীয় শক্তির পক্ষে এতটা প্রভাব নিশ্চিত করা যাবে যাতে এই সব কৃষক সমবায়কে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নত করা এবং সমগ্রভাবে সমবায় ও ব্যক্তিগতভাবে তাদের সভ্যদের দায়িত্ব ও অধিকার গোটা যৌথের অন্যান্য বিভাগের দায়িত্ব ও অধিকারের সমপর্যায়ে আনা সম্ভব হয়। নির্দিষ্ট এক একটি ক্ষেত্রে কার্যত সেটা কী ভাবে করা যাবে তা নির্ভর করবে প্রতিটি ক্ষেত্রের বিশিষ্ট পরিবেশ এবং কোন অবস্থায় আমরা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করছি তারই উপর। সুতরাং এই সমবায়গুলিকে আরও কিছু সুবিধা দেওয়া হয়ত বা সম্ভব হতে পারবে, যেমন জাতীয় ব্যাংক দ্বারা তাদের সমস্ত বন্ধকী ঋণের দায়

গ্রহণ এবং সেইসঙ্গে সুদের হারের প্রভূত হ্রাস; বৃহদায়তন উৎপাদনের জন্য রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে অগ্রিম দাদন (এই দাদন যে প্রধানত টাকায়ই দিতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই, যন্ত্রপাতি, কৃত্রিম সার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী হিসাবেও দেওয়া চলতে পারে) এবং অন্যান্য সুবিধা।

এদিকে প্রধান কথা কৃষককে এইটে বোঝানো যে, কৃষকের ঘরবাড়ি এবং জমিকে বাঁচাতে, রক্ষা করতে আমরা পারি কেবল সমবায়ী পদ্ধতিতে পরিচালিত সমবায়ী সম্পত্তিতে তাদের রূপান্তরিত করেই। ব্যক্তিগত মালিকানার শর্তাধীন ব্যক্তিগত চাষপ্রথাই কৃষককে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ব্যক্তিগত কাজের পদ্ধতি আঁকড়ে থাকতে চাইলে সে অনিবার্যভাবেই ভিটেমাটি থেকে বিতাড়িত হবে, তাদের সাবেকী উৎপাদন-পদ্ধতি পুঁজিবাদী বৃহদায়তন উৎপাদনের দ্বারা স্থানচ্যুত হবে। এই হচ্ছে আসল ব্যাপার। এই পরিস্থিতিতে আমরা কৃষকদের সামনে উপস্থিত হচ্ছি এবং তারা নিজেরাই যাতে পুঁজিপতিদের জন্য নয়, নিজেদেরই সকলের জন্য বৃহদায়তন পদ্ধতিতে উৎপাদন সুরু করতে পারে তার সুযোগ খুলে দিচ্ছি। এতে যে কৃষকেরই স্বার্থ রক্ষিত হবে, এই যে তাদের মুক্তির একমাত্র পথ, একথা তাদের বোঝান কি সত্যই অসম্ভব?

পুঁজিবাদী উৎপাদনের সর্বশক্তিমত্তার কবল থেকে ছোট জোতের মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ বাঁচিয়ে রাখব এমন প্রতিশ্রুতি তাকে আজ বা ভবিষ্যতে কখনও আমরা দিতে পারি না। এইটুকু প্রতিশ্রুতি কেবল দিতে পারি যে, তাদের সম্পত্তি-সম্পর্কে আমরা জোর করে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো হস্তক্ষেপ করব না। তাছাড়াও, এই দাবি আমরা সমর্থন করতে পারি যে, ছোট কৃষকের বিরুদ্ধে পুঁজিপতি ও বড় বড় ভূস্বামীর সংগ্রামে যেন এখন থেকে যতদূর সম্ভব কম অসাধু পন্থা গৃহীত হয় এবং বর্তমানে যে খোলাখুলি দস্যুতা ও বঞ্চনা প্রায়ই ঘটে তা যেন যতদূর সম্ভব বন্ধ হয়। অবশ্য অতি ব্যতিক্রমের দু একটা ক্ষেত্রেই আমাদের দাবি ফলপ্রসূ হবে। বিকশিত পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিতে কোথায় সততার শেষ আর বঞ্চনার শুরু সেকথা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু দেশের কর্তৃপক্ষ বঞ্চিতের পক্ষে, না বঞ্চকের পক্ষে, এর ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। আমরা অবশ্যই দ্বিধাহীনভাবে ছোটকৃষকের পক্ষে; তার অবস্থা আরো সহনীয় করার জন্য, সে মনস্থির করলে তার সমবায়ে পৌঁছবার সর্বপ্রকার সুবিধা করে দিতে, এমনকি সে যদি তখনও এবিষয়ে মন স্থির করতে না পেরে থাকে তাহলে বেশ দীর্ঘকাল যাতে সে তার ছোট জমিটুকুতে টিকে থেকে আরও ভাবার সময় পায়, তার জন্য আমরা যথাসম্ভব সবকিছুই করব। নিজ শ্রমে জীবিকা নির্বাহ করে যে ছোট কৃষক তাকে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ একজন মনে করি বলেই শুধু নয়, পার্টির প্রত্যক্ষ স্বার্থেও একাজ আমরা করি। যত বেশী সংখ্যক কৃষককে আমরা প্রলেতারীয় শ্রেণীতে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারব, তারা কৃষক

থাকতে থাকতেই আমাদের পক্ষে টেনে আনতে পারব, ততই দ্রুত এবং সহজে সামাজিক রূপান্তর ঘটান সম্ভব হবে। কবে পুঁজিবাদী উৎপাদন সর্বত্র বিকশিত হয়ে তার চূড়ান্ত ফল প্রসব করবে, কবে শেষ কারিগর এবং শেষ ছোট কৃষকটি পর্যন্ত পুঁজিবাদী বৃহৎ উৎপাদনের শিকার হবে, সে পর্যন্ত এই রূপান্তর স্থগিত রেখে আমাদের কোনো লাভ নেই। কৃষকের স্বার্থ রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে এই কাজে যে বৈষয়িক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, সেটা পুঁজিবাদী অর্থনীতির নজরে অর্থের অপচয় মাত্র হলেও চমৎকার অর্থ বিনিয়োগ, কেননা এর ফলে সামাজিক পুনর্গঠনের সাধারণ খরচে হয়ত দশগুণ সাশ্রয় হবে। সুতরাং, এই অর্থে, কৃষকদের সঙ্গে অতি উদার ব্যবহার আমরা করতে পারি। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা বা এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নির্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থিত করার স্থান এটা নয়, এখানে আমরা কেবল সাধারণ নীতি নিয়েই আলোচনা করতে পারি।

অতএব আমরা ছোট জোত চিরদিন বাঁচিয়ে রাখতে চাই, এরকম এতটুকু ধারণা সৃষ্টি হতে পারে এমন কোন প্রতিশ্রুতি দিলে তাতে পার্টি বা ছোট কৃষকের যত ক্ষতি হবে তেমন আর কিছুতে নয়। এর অর্থ কৃষকের মুক্তির পথে সরাসরি বাধা সৃষ্টি করা এবং পার্টিকে সেমেটিক-বিরোধী দাঙ্গাবাজদের পর্যায়ে টেনে নামান। বরঞ্চ, পার্টির পক্ষ থেকে ছোট কৃষকদের বার বার এই কথাই পরিষ্কার করে বলা উচিত যে, পুঁজিবাদ যতদিন কর্তৃত্ব করবে ততদিন তাদের কোনোই আশা নেই, তাদের ছোট ছোট জোতগুলিকে ছোট জোত হিসাবেই তাদের জন্য বাঁচিয়ে রাখা নিতান্তই অসম্ভব, রেলগাড়ি যেমন করে ঠেলাগাড়ি গুঁড়িয়ে দেয়, তেমনি করেই পুঁজিবাদী বৃহৎ উৎপাদন-ব্যবস্থাও সুনিশ্চিতভাবে তাদের অক্ষম, অচল হয়ে যাওয়া ক্ষুদে উৎপাদন-ব্যবস্থাকে চূর্ণ করে দেবে। এ কাজ করলে আমরা অর্থনৈতিক বিকাশের অনিবার্য গতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলব এবং সে বিকাশ ছোট কৃষকদের কাছে আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণে ব্যর্থ হবে না।

প্রসঙ্গত, নান্টেস কর্মসূচির রচয়িতারাও যে মূলত আমার সঙ্গে একমত, এ বিশ্বাস প্রকাশ না করে আমি এই বিষয়ে আলোচনা শেষ করতে পারি না। যেসব জমি আজ ছোট ছোট জোতে বিভক্ত সেটাও যে শেষ পর্যন্ত সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত হতে বাধ্য, এটা না বোঝার মতো অন্তর্দৃষ্টিহীন তাঁরা নন। তাঁরা নিজেরাই স্বীকার করেন যে, ছোট জোতের মালিকানার অবলুপ্তি সুনিশ্চিত। লাফার্গ রচিত জাতীয় পরিষদের যে রিপোর্ট নান্টেসের কংগ্রেসে উপস্থিত করা হয় তাতেও এই মতের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। বর্তমান বৎসরের ১৮ই অক্টোবর সংখ্যায় বার্লিন *Sozial-Demokrat* পত্রিকায় এই বিবরণী জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। নান্টেসের কর্মসূচির বিভিন্ন কথার পরস্পর বিরোধিতা থেকেই বোঝা যায় যে, রচয়িতারা আসলে যা বলেছেন সেটা

ঠিক তাঁরা বলতে চাননি। তাই তাঁদের আসল কথা যদি না বুঝে বক্তব্যগুলির অপব্যবহার করা হয়, যা সত্যিই ঘটেছে, তবে সেটা তাঁদের দোষ। সে যাই হোক, এই কর্মসূচিটিকে তাঁদের আরও ব্যাখ্যা করতে হবে এবং আগামী ফরাসী কংগ্রেসে এর আগাগোড়া সংশোধন করতে হবে।

এবার বেশি বড় কৃষকদের প্রসঙ্গে আসা যাক। প্রধানত উত্তরাধিকারের ভাগাভাগি, কিন্তু সেই সঙ্গে ঋণগ্রস্ততা এবং বাধ্য হয়ে জমি বিক্রির ফলে এসব ক্ষেত্রে ছোট জোতের কৃষক থেকে শুরু করে পৈতৃক সম্পত্তি অটুট রেখেছে এবং বাড়িয়েছে এমন বড় কৃষক ভূস্বামী পর্যন্ত একাধিক অন্তর্বর্তী পর্যায় দেখা যায়। যেসব জায়গায় মাঝারি কৃষক বাস করে ছোট কৃষকদের মধ্যে, সেখানে তার স্বার্থ ও চিন্তাধারা প্রতিবেশীদের থেকে খুব বেশী পৃথক হবে না; নিজ অভিজ্ঞতা থেকেই সে জানে যে, তার মতো কত জন ইতিপূর্বে ছোট কৃষকের পর্যায়ে নেমে গেছে। কিন্তু যেখানে মাঝারি কৃষক ও বড় কৃষকেরই প্রাধান্য এবং খামারের কাজে সাধারণত পুরুষ ও স্ত্রী কৃষি-মজুরের প্রয়োজন হয়, সেসব জায়গায় অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরকম। বলা বাহুল্য, শ্রমিক পার্টিকে সর্বাগ্রে মজুরি-শ্রমিক অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী কৃষি-মজুর এবং দিনমজুদের হয়ে লড়াই করতে হবে। তাই শ্রমিকদের মজুরি-দাসত্ব বজায় থাকবে এই মর্মে কৃষকদের কাছে কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া যে কোনোক্রমেই চলতে পারে না সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অথচ বড় ও মাঝারি কৃষকেরা যতদিন বড়ো ও মাঝারি কৃষক হিসাবেই থাকছে, ততদিন মজুরি-শ্রমিক ছাড়া তারা চালাতে পারে না। সুতরাং, ছোট জোতের কৃষককে চিরদিনই ছোট জোত কৃষক হিসাবে বাঁচিয়ে রাখার প্রতিশ্রুতি দেওয়া যদি আমাদের পক্ষে নির্বুদ্ধিতা হয়, তাহলে বড় ও মাঝারি কৃষকদের সেরকম কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে বিশ্বাসঘাতকতারই সামিল।

এক্ষেত্রেও শহরের হস্তশিল্পীদের মধ্যে আমরা অনুরূপ পরিস্থিতি দেখতে পাই। এরা কৃষকদের চেয়েও দুস্থ সেকথা ঠিক, কিন্তু এদের মধ্যেও এখনও এমন কিছু লোক আছে যারা তাদের শিক্ষানবিস ছাড়াও জোগাড়ে নিয়োগ করে, কিংবা তাদের শিক্ষানবিসরাই জোগাড়ের কাজ করে। এইসব মালিক-কারিগরদের মধ্যে যারা মালিক-কারিগর রূপেই নিজেদের অস্তিত্ব চিরদিন বজায় রাখতে চায় তারা সেমেটিক-বিরোধীদের সঙ্গেই গিয়ে মিলুক, একদিন তারা বুঝবে যে, সেখানেও তাদের কোনো সুরাহা হবে না। বাকি যারা বোঝে যে, তাদের উৎপাদন-পদ্ধতির ধ্বংস অনিবার্য তারা আমাদের পক্ষে চলে আসুক, এবং শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে সমস্ত শ্রমিকদের ভাগ্যে যা আছে তারই অংশীদার হতে রাজী হোক। বড় ও মাঝারি কৃষকদের পক্ষেও এই একই কথা প্রযোজ্য। তাদের চেয়ে তাদের স্ত্রী-পুরুষ কৃষি-মজুর ও দিনমজুরদের ব্যাপারেই আমাদের ঔৎসুক্য অনেক বেশী সে কথা না বললেই চলে। এই কৃষকেরা যদি চায়

যে, তাদের উদ্যোগগুলির অব্যাহত অস্তিত্ব নিশ্চিত হোক, তবে সে প্রতিশ্রুতি দেবার কোনো উপায় আমাদের নেই। সেক্ষেত্রে তাদের সেমেটিক-বিরোধী, কৃষক সঙ্ঘ বা ঐ ধরনের যেসব দল সবকিছুরই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আনন্দ পায় এবং কোনো প্রতিশ্রুতিই রাখে না, তাদের মধ্যেই স্থান করে নিতে হবে। অর্থনীতির দিক থেকে আমরা স্থির জানি যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন ও বিদেশ থেকে সস্তায় আমদানী করা খাদ্যশস্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বড় ও মাঝারি কৃষককেও ঠিক একইভাবে অনিবার্যভাবেই হার স্বীকার করতেই হবে। এইসব কৃষকদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ঋণভার এবং সর্বক্ষেত্রে তাদের কৃষির প্রকট অবনতির লক্ষণ থেকেই একথা প্রমাণ হচ্ছে। এ অবনতির বিরুদ্ধে এক্ষেত্রেও ভিন্ন ভিন্ন জোত একত্র করে সমবায় সংস্থা গড়ার সুপারিশ ছাড়া আর কিছুই আমরা করতে পারি না; এইসব সমবায় সংস্থায় মজুরি-শ্রমের শোষণ ক্রমেই লোপ পাবে, বৃহৎ জাতীয় উৎপাদন-সমবায়ের শাখায় এগুলির ক্রমিক রূপান্তর ঘটানো যাবে, যেখানে প্রতিটি শাখা সমান দায়িত্ব ও অধিকার ভোগ করবে। এই কৃষকেরা যদি তাদের বর্তমান উৎপাদন-পদ্ধতির ধ্বংসের অনিবার্যতার কথা হৃদয়ঙ্গম করে ও তার থেকে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত টানে, তাহলে তারা আমাদের পক্ষে চলে আসুক এবং তখন সেই নতুন উৎপাদন-পদ্ধতিতে তাদের উৎক্রমণ সুগম করার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে তাদের সাহায্য করা হবে আমাদের কর্তব্য। এপথ তারা না গ্রহণ করলে, তাদের ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করে আমরা আবেদন জানাব তাদের মজুরি-শ্রমিকদের কাছে। সেখানে সাড়া নিশ্চয়ই পাব। খুব সম্ভবত এক্ষেত্রেও আমরা বলপূর্বক উৎখাত এড়াতে পারব, কিন্তু এই ভরসা রাখতে পারব যে, ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক বিকাশ এইসব নিরেট মাথাতেও সুবুদ্ধি জাগাবে।

একমাত্র বড় বড় ভূসম্পত্তির বেলাতেই সমস্যাটা অত্যন্ত সরল। এখানে নগ্ন পুঁজিবাদী উৎপাদন নিয়েই আমাদের কারবার, সুতরাং কোনো কুণ্ঠায় সংযত হবার কোনো প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে আমাদের সামনে রয়েছে গ্রামীণ প্রলেতারিয়েত এবং আমাদের কর্তব্যও সুস্পষ্ট। আমাদের পার্টি রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ঠিক শিল্প-মালিকদেরই মতো বড় বড় ভূসম্পত্তির মালিকদেরও উৎখাত করতে হবে। এই উৎখাত করার দরুন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে কিনা তা অনেক পরিমাণে আমাদের উপর নির্ভর করবে না, কোন অবস্থায় আমরা ক্ষমতা পাই এবং বিশেষ করে এই ভদ্রলোকেরা, বড় বড় ভূস্বামীরা কী ব্যবহার করেন তারই উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করবে। কোনো ক্ষেত্রেই ক্ষতিপূরণ দেওয়া চলবে না, একথা আমরা মোটেই ভাবি না। মার্কস আমায় বলেছিলেন (এবং কত বার!) যে, তাঁর মতে এদের গোটা দলটাকে কিনে ফেলতে পারলেই আমরা সবচেয়ে সস্তায় পার পাব। কিন্তু এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় তা নয়। এইভাবে যেসব বৃহৎ মহাল সমাজের হাতে ফিরে আসবে সেগুলি সেখানকার

কর্মরত গ্রামীণ মজুরদের হাতে তুলে দিতে হবে এবং সমবায়-সমিতিতে এদের সংগঠিত করতে হবে। ঐসব জমি তাদের দেওয়া হবে সমাজের নিয়ন্ত্রণাধীনে তাদের ব্যবহার ও উপযোগের জন্য। সে জমিতে তাদের ইজারার সর্ত কী ধরনের হবে সে সম্পর্কে এখনই কিছু বলা যায় না। আর যাই হোক, পুঁজিবাদী উদ্যোগকে সামাজিক উদ্যোগে রূপান্তরিত করার প্রস্তুতি এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ হয়ে আছে এবং ঠিক মিঃ ক্রুপ বা মিঃ ফন শ্‌তুমের কারখানার মতোই রাতারাতি সে রূপান্তর কার্যকরী করা যাবে। এবং শেষ যে ছোট কৃষকদের তখনও আপত্তি থাকবে, সে এবং খুব সম্ভব কিছু বড় কৃষকও এইসব কৃষি সমবায়ের উদাহরণ দেখে সমবায় পন্থায় বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা বুঝতে পারবে।

এইভাবে শিল্প শ্রমিকদেরই মতো গ্রামীণ প্রলেতারীয়দের সামনেও আমরা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে দিতে পারি এবং তখন এলবা নদীর পূর্বতীরের প্রাশিয়ার গ্রাম্য শ্রমিককে পক্ষে আনা কেবলমাত্র সময়ের এবং তাও অল্প সময়ের ব্যাপার হতে বাধ্য। কিন্তু এলবার পূর্বাঞ্চলের গ্রাম্য শ্রমিকদের একবার পেলে সারা জার্মানি জুড়ে নতুন হাওয়া বইতে শুরু করবে। প্রুশীয় য়ুংকারদের* প্রাধান্যের এবং সেইহেতু জার্মানিতে প্রাশিয়ার বিশিষ্ট প্রভুত্বের ভিত্তি হচ্ছে এলবার পূর্বাঞ্চলের গ্রাম্য শ্রমিকদের কার্যত অর্ধ-ভূমিদাসত্ব। এলবার পূর্বতীরের এই য়ুংকাররাই আমলাতন্ত্র ও সামরিক অফিসার মণ্ডলীর বিশেষ রূপের প্রুশীয় চরিত্র গড়ে তুলেছে এবং বাঁচিয়ে রাখছে — ঋণের দায়ে, দারিদ্র্যের চাপে এই য়ুংকাররা ক্রমেই আরও ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে এবং রাষ্ট্রের ও অপরের ঘাড় ভেঙে পরগাছাসুলভ জীবন কাটাচ্ছে, এবং সেই কারণেই যে প্রাধান্য ভোগ করছে তাকে আরও আঁকড়ে ধরছে। এদেরই ঔদ্ধত্য, সংকীর্ণচেতনা এবং অহংকার প্রুশীয় জাতির জার্মান রাইখকে, -- বর্তমানে জাতীয় ঐক্য সাধনের একমাত্র রূপ হিসাবে এই রাইখকে অনিবার্য বলে মেনে নিয়েও — দেশের অভ্যন্তরে এতটা ঘৃণার বস্তু এবং এত বিস্ময়কর জয়লাভ সত্ত্বেও বিদেশে এত কম সম্মানভাজন করে তুলেছে। সাতটি পুরাতন প্রুশীয় প্রদেশের অটুট এলাকায়, অর্থাৎ সমস্ত রাইখের প্রায় এক তৃতীয়াংশ ব্যাপী এই এলাকায় ভূসম্পত্তি এদেরই হাতে এবং এখানে ভূসম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গেই আসে সামরিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষমতা — এই হচ্ছে য়ুংকারদের ক্ষমতার ভিত্তি। এবং কেবল ভূসম্পত্তিই নয়, এদের বীট-চিনি শোধনাগার এবং মদ তৈয়ারীর কারখানা মারফৎ এ অঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পও এদেরই হাতে। বাকি জার্মানির বড় বড় ভূস্বামী বা শিল্পপতিরা কেউই এমন সুবিধাজনক অবস্থার সুযোগ পায় না। তাদের কারোরই এমন সংহত রাজত্ব নেই। তারা উভয়েই এক বিস্তীর্ণ

* য়ুংকার — প্রাশিয়ার অভিজাত ভূস্বামী। — সম্পাঃ

অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে আছে, তাছাড়া পরস্পরের সঙ্গে এবং চারিদিকের অন্যান্য সামাজিক উপাদানের সঙ্গে তারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্যের জন্য প্রতিযোগিতা করে চলছে। কিন্তু প্রুশীয় য়ুঙ্কারদের এই প্রাধান্যের অর্থনৈতিক ভিত ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পড়ছে। সমস্তরকম সরকারী সাহায্য (এবং দ্বিতীয় ফ্রিদরিখের সময় থেকে প্রতিটি য়ুঙ্কার বাজেটে এই খাতে বরাদ্দ থাকেই) সত্ত্বেও এখানেও ঋণভার এবং দারিদ্র্য অনিবার্যভাবে বেড়ে চলেছে। আইন ও দেশাচারের দ্বারা পবিত্রকৃত এক কার্যত আধা-ভূমিদাস প্রথা এবং তারই ফলে গ্রাম্য শ্রমিককে নিরঙ্কুশ শোষণের সম্ভাবনা — কেবল এরই জোরে নিমজ্জমান য়ুঙ্কাররা আজও কোনোরকমে ভেসে আছে। এই শ্রমিকদের মধ্যে সোশ্যাল-ডেমোক্রাট মতবাদের বীজ পুঁতে দাও, উদ্দীপিত করে নিজেদের অধিকারের জন্য সংগ্রামে সংহতি দাও, অমনি য়ুঙ্কারদের রাজত্ব শেষ হয়ে যাবে। সারা ইউরোপের ক্ষেত্রে রুশ জারতন্ত্র যার প্রতীক, জার্মানির ক্ষেত্রে সেই একই বর্বরতা ও লুণ্ঠনপরতার প্রতীকরূপ মহা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিটা বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যাবে। প্রুশীয় সেনাবাহিনীর 'শ্রেষ্ঠ দলগুলি' সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক হয়ে উঠবে, তার ফলে শক্তি বিন্যাসে এমন একটা পরিবর্তন ঘটবে যার মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকবে সমগ্র এক বিপ্লবের সম্ভাবনা। এই কারণেই পশ্চিম জার্মানির ছোট কৃষক তথা দক্ষিণ জার্মানির মাঝারি কৃষকদের চেয়ে এলবার পূর্বতীরের গ্রামীণ প্রলেতারীয়কে পক্ষে টানতে পারার গুরুত্ব অনেক বেশী। আমাদের চূড়ান্ত লড়াই এইখানে, এই এলবাব পূর্বতীরের প্রাশিয়াতেই লড়তে হবে এবং ঠিক সেই কারণেই সরকার ও য়ুঙ্কারতন্ত্র উভয়েই এই অঞ্চলে আমাদের প্রবেশ বন্ধ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে। এবং যে ভয় দেখান হচ্ছে সে অনুযায়ী পার্টির বিস্তার বন্ধ করার জন্য নূতন দমনমূলক ব্যবস্থা যদি অবলম্বন করা হয়, তাহলে তার প্রধান লক্ষ্য হবে এলবার পূর্বতীবের গ্রামীণ প্রলেতারিয়েতকে আমাদের প্রচার থেকে রক্ষা করা। আমাদের অবশ্য তাতে কিছু এসে যায় না। এসব সত্ত্বেও তাদের আমরা পক্ষে টেনে আনবই।

এঙ্গেলস কর্তৃক ১৮৯৪-এর নভেম্বরে লিখিত *Neue Zeit* পত্রিকার ১৮৯৪-এর সংখ্যায় প্রকাশিত

পত্রিকার পাঠ অনুসারে মুদ্রিত
জার্মান থেকে ইংরেজী অনুবাদের ভাষান্তর

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

পত্রাবলী

প. ভ. আন্নেন্‌কভ সমীপে মার্কস

ব্রাসেলস, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৪৬

মাত্র গত সপ্তাহে আমার পুস্তকবিক্রেতা 'দারিদ্র্যের দর্শন' নামক প্রুধোঁর বইখানি আমায় পাঠিয়েছেন, নচেৎ আপনার ১লা নভেম্বর তারিখের পত্রের উত্তর আপনি বহুপূর্বেই পেতেন। যাতে সঙ্গে সঙ্গেই আপনাকে আমার অভিমত জানাতে পারি তজ্জন্য দু-দিনে বইখানি শেষ করেছি। খুব তাড়াতাড়ি পড়ায় বিশদ আলোচনা করতে পারব না, বইখানি পড়ে সাধারণভাবে আমার যা মনে হল, শুধু সেইটুকুই আপনাকে জানাতে পারি। যদি চান তাহলে দ্বিতীয় পত্রে বিশদ আলোচনা করা যায়।

আমি খোলাখুলিই আপনার কাছে স্বীকার করছি, বইখানি আমার কাছে মোটের উপর খারাপ লেগেছে, খুবই খারাপ লেগেছে। এই গড়নহীন ও হামবড়া পুস্তকখানিতে 'জার্মান দর্শনের ছাপ' নিয়ে শ্রী প্রুধোঁ যে জাঁক করেছেন, তাকে তো আপনি নিজেই আপনার চিঠিতে ঠাট্টা করেছেন; কিন্তু আপনি ভেবেছেন অর্থনৈতিক বিচার দার্শনিক বিষে দুষ্ট হয়নি। বলতে কি, অর্থনৈতিক বিচারের ভুলভ্রান্তির জন্য শ্রী প্রুধোঁর দর্শনকে আমিও মোটেই দায়ী করছি না। এক আজগুবি দর্শন হাতে আছে বলেই শ্রী প্রুধোঁ যে অর্থশাস্ত্রের এক ভ্রান্ত সমালোচনা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেছেন তা নয়: তিনি আমাদের এক আজগুবি দর্শনই উপহার দিয়েছেন, কারণ, শ্রী প্রুধোঁ বর্তমান কালের সামাজিক পরিস্থিতিকে তার শৃঙ্খলাবদ্ধতায় (engrènement) বুঝতে পারেননি। কথাটি তিনি অন্য অনেক কিছুর মতোই ফুরিয়ের কাছ থেকে ধার করেছেন।

শ্রী প্রুধোঁ ঈশ্বরের কথা বলেছেন কেন, সার্বজনীন প্রজ্ঞার কথা বলেছেন কেন, কেন তিনি বলেছেন সর্বমানবের নৈর্ব্যক্তিক প্রজ্ঞার কথা, যা চির অভ্রান্ত এবং সর্ব যুগে নিজের সঙ্গে সমান, যার সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে পারলেই সত্য হস্তগত হয়? নিজেকে একজন গভীর তত্ত্বজ্ঞানী বলে জাহির করার জন্য কেনই বা তিনি এক ভাসাভাসা হেগেলপন্থার অবতারণা করেছেন?

এ ধাঁধার চাবিকাঠি তিনি নিজেই দিয়েছেন। শ্রী প্রুধোঁর চোখে ইতিহাস হল এক সুনির্দিষ্ট সামাজিক বিকাশ ধারা; তিনি দেখেছেন ইতিহাসে প্রগতি রূপায়িত হচ্ছে. সর্বশেষে তিনি দেখতে পেয়েছেন মানুষ, ব্যক্তিবিশেষ হিসাবে, জানত না তারা

কী করছে এবং নিজেদের গতি সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণা ছিল; অর্থাৎ তাদের সামাজিক বিকাশকে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় তাদের ব্যক্তিগত বিকাশ থেকে পৃথক, আলাদা ও স্বাধীন। তিনি এই তথ্যগুলির ব্যাখ্যা দিতে পারেননি এবং আত্মপ্রকাশমান সার্বজনীন প্রজ্ঞার প্রকল্পটি হাজির করে দেন। কাণ্ডজ্ঞানের অভাব হলে আধ্যাত্মিক কারণ অর্থাৎ ফাঁকা একটা বুলি আবিষ্কার করার চেয়ে সোজা কাজ আর কিছু হতে পারে না।

কিন্তু শ্রী প্রুধোঁ যখন স্বীকার করেন যে, মানবজাতির ঐতিহাসিক বিকাশের কিছুই তিনি বোঝেন না — বিশ্বজনীন প্রজ্ঞা, ঈশ্বর ইত্যাদি গালভরা কথা ব্যবহারের মধ্য দিয়েই তাঁর এই স্বীকৃতি প্রকাশ পায় — তখন কি তিনি পরোক্ষভাবে কিন্তু নিশ্চিতভাবে এই কথাই স্বীকার করেন না যে, **অর্থনৈতিক বিকাশ** বুঝবার ক্ষমতা তাঁর নেই?

সমাজের রূপ যাই হোক না কেন, সমাজটি কী? মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল। খুসিমতো সমাজ বেছে নেবার স্বাধীনতা কি মানুষের আছে? কোনোমতেই না। মানুষের উৎপাদন-শক্তির বিকাশের একটি বিশেষ অবস্থার কথা যদি ধরা যায়, তাহলে এসে যাবে বাণিজ্য ও পণ্যভোগের একটি ঠিক তদনুযায়ী রূপ। উৎপাদন, বাণিজ্য ও পণ্যভোগের বিকাশের এক বিশেষ পর্যায়ের কথা ধরে নিলেই এসে যাবে সামাজিক গঠনের একটি তদনুযায়ী প্রথা; পরিবার, বর্গ বা শ্রেণী-সংগঠনের একটি তদনুযায়ী রূপ, এক কথায় একটি তদনুযায়ী নাগরিক সমাজ। একটি বিশেষ নাগরিক সমাজ ধরে নিলেই এসে যাবে একটি বিশেষ রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যা নাগরিক সমাজের সরকারী অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ব্যাপারটা প্রুধোঁ কখনও বুঝবেন না; কারণ তাঁর ধারণা রাষ্ট্র থেকে নাগরিক সমাজের কাছে অর্থাৎ সমাজের সরকারী সারাংশটা থেকে সরকারী সমাজটার কাছেই আবেদন জানিয়ে তিনি বড় একটা কিছু করছেন।

বলা বাহুল্য, মানুষের সমস্ত ইতিহাসের যা ভিত্তি সেই **নিজের উৎপাদন-শক্তিনিচয়ের** স্বাধীন নিয়ন্তা মানুষ নয়, কারণ উৎপাদন-শক্তি মাত্রই অর্জিত শক্তি, প্রাক্তন ক্রিয়ার ফল। অতএব উৎপাদন-শক্তিসমূহ হল মানুষের ব্যবহারিক উদ্যোগের ফল; কিন্তু এই উদ্যোগ নিজেই সীমাবদ্ধ, লোকে যে অবস্থার মধ্যে অবস্থিত সেই অবস্থার দ্বারা, ইতিমধ্যে অর্জিত উৎপাদন-শক্তিসমূহের দ্বারা, তাদের আগেই যে সমাজরূপ বিদ্যমান ছিল, যাকে তারা সৃষ্ট করেনি এবং যা পূর্ববর্তী পুরুষের উৎপাদিত ফল, তার দ্বারা সীমাবদ্ধ। প্রত্যেক পরবর্তী পুরুষ পূর্ববর্তী পুরুষের অর্জিত উৎপাদন-শক্তিসমূহের অধিকারী হয় এবং তাদের জন্য সেগুলি নূতন উৎপাদনের কাঁচামালের কাজ করে, এই সহজ ব্যাপারটার জন্যই মানবেতিহাসে একটি সুসংগতির সৃষ্টি হয়, গড়ে ওঠে মানবজাতির এক ইতিহাস এবং যত মানুষের উৎপাদন-শক্তিসমূহ এবং সেইজন্যই তার সামাজিক সম্পর্কাবলীও আরও বিকশিত হয়ে উঠেছে, তত এ ইতিহাস আরও বেশী করে হয়ে

ওঠে মানবজাতির ইতিহাস। কাজে কাজেই এই সিদ্ধান্তে আসতে হয়: লোকেদের সামাজিক ইতিহাস কখনও তাদের ব্যক্তিগত বিকাশের ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়, সে সম্পর্কে লোকে সচেতন থাক বা না থাক। তাদের বৈষয়িক সম্পর্কগুলিই তাদের সমস্ত সম্পর্কের ভিত্তি। এই বৈষয়িক সম্পর্কগুলি তাদের বৈষয়িক ও ব্যক্তিগত কার্য সাধনের প্রয়োজনীয় আধার ছাড়া আর কিছুই নয়।

শ্রী প্রুধোঁ ধারণা ও বস্তুতে গুলিয়ে ফেলেছেন। মানুষ তার অর্জিত বস্তু কখনো হাতছাড়া করে না, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তারা কখনো সেই সমাজরূপটি পরিহার করবে না যার মধ্য দিয়ে তারা কোনো একটা উৎপাদন-শক্তি অর্জন করেছে। বরঞ্চ, লব্ধ ফল থেকে যাতে বঞ্চিত না হতে হয় এবং সভ্যতার ফলগুলি যাতে হারাতে না হয়, তজ্জন্য যখন তাদের সম্পর্কের (commerce) রূপটি আর অর্জিত উৎপাদন-শক্তিসমূহের সঙ্গে খাপ খায় না, ঠিক তখন থেকেই তারা তাদের সমস্ত চিরাচরিত সমাজরূপ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। এখানে আমি 'commerce' শব্দটি ব্যাপকতম অর্থে ব্যবহার করছি, জার্মান ভাষায় 'Verkehr' শব্দটিকে আমরা যেভাবে ব্যবহার করি। যেমন, — বিশেষ অধিকার, গিল্ড ও কর্পোরেশন প্রথা ও মধ্যযুগীয় বিধিব্যবস্থার গোটা আমলটা — এগুলি সেই ধরনের সামাজিক সম্পর্ক, একমাত্র যেগুলিই হচ্ছে অর্জিত উৎপাদন-শক্তিসমূহের অনুগামী এবং সেই সামাজিক অবস্থার অনুগামী যা ইতিপূর্বে বিদ্যমান ছিল এবং যা থেকে এই প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্ভব হয়েছিল। কর্পোরেশন ব্যবস্থা ও তার বিধিবিধানের আশ্রয়ে পুঁজি জমে ওঠে, সামুদ্রিক বাণিজ্য বিকাশলাভ করে, উপনিবেশ স্থাপিত হয়। কিন্তু এর ফল থেকে মানুষ বঞ্চিত হত, যদি তারা যে সমাজরূপের আশ্রয়ে এই ফলগুলি পরিপক্ক হয়ে উঠেছিল সেগুলিকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করত। এই কারণেই দুবার বজ্রপাত হয় — ১৬৪০ সালের ও ১৬৮৮ সালের বিপ্লব। সমস্ত পুরাতন অর্থনৈতিক রূপ এবং তদনুযায়ী সামাজিক সম্পর্ক, পুরাতন নাগরিক সমাজের সরকারী অভিব্যক্তিরূপ রাজনৈতিক ব্যবস্থা ইংলণ্ডে ধ্বংস হয়ে গেল। সুতরাং, যে অর্থনৈতিক রূপগুলির মাধ্যমে মানুষ পণ্য-উৎপাদন, ভোগ ও বিনিময় করে সেগুলি **ক্ষণস্থায়ী ও ঐতিহাসিক**। নূতন উৎপাদন-শক্তি অর্জনের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষ তাদের উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তন করে এবং উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত করে সমস্ত অর্থনৈতিক সম্পর্ককেই, কেননা সেগুলি ছিল কেবলমাত্র এই বিশেষ উৎপাদন-পদ্ধতিরই আবশ্যিক সম্পর্ক।

এই কথাটিই শ্রী প্রুধোঁ বুঝতে পারেননি, দেখাতে তো আরো পারেননি। ইতিহাসের প্রকৃত গতি বুঝতে অক্ষম শ্রী প্রুধোঁ এক আজগুবি ছায়াবাজি সৃষ্টি করেছেন, একে তিনি বড় গলায় দাবি করেছেন দ্বন্দ্বমূলক ছায়াবাজি বলে। তিনি

সপ্তদশ, অষ্টাদশ অথবা ঊনবিংশ শতাব্দীর কথা বলার প্রয়োজনবোধ করেননি, কারণ তাঁর ইতিহাস চলেছে স্থানকালের বহু ঊর্ধ্বে, কল্পনার কুয়াশা-রাজ্যে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এ হচ্ছে পুরাতন হেগেলীয় মণ্ড, এতো ঐহিক ইতিহাস অর্থাৎ মানুষের ইতিহাস নয়, এ হচ্ছে পবিত্র ইতিহাস — ভাবধারার ইতিহাস। তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মানুষ হচ্ছে একটা উপকরণ মাত্র, ভাব অথবা শাশ্বত প্রজ্ঞা যে-উপকরণকে আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যবহার করে থাকে। শ্রী প্রুধোঁ যে **বিবর্তনগুলির** কথা বলছেন সেগুলি যেন পরম ভাবসত্তার অতীন্দ্রীয় গর্ভেই নিষ্পন্ন হচ্ছে। এই রহস্যাচ্ছন্ন ভাষার আবরণ যদি খসিয়ে ফেলা যায়, তাহলে দেখা যাবে শ্রী প্রুধোঁ আপনার সম্মুখে এমন একটি শৃঙ্খলা উপস্থিত করছেন, যেখানকার অর্থনৈতিক বর্গভেদগুলি তাঁর নিজের মাথার মধ্যেই সাজানো রয়েছে। এই শৃঙ্খলা যে এক অত্যন্ত বিশৃঙ্খল মনের শৃঙ্খলা, তা প্রমাণ করা খুব কষ্টসাধ্য হবে না।

শ্রী প্রুধোঁ তাঁর বই সুরু করেছেন **মূল্য** সম্পর্কে গবেষণা দিয়ে। এটি তাঁর প্রিয় বিষয়। আজ আমি এই গবেষণা পরীক্ষা করে দেখতে যাচ্ছি না।

শাশ্বত প্রজ্ঞার অর্থনৈতিক বিবর্তনমালার সূচনা হয়েছে **শ্রমবিভাগ** দিয়ে। শ্রী প্রুধোঁর কাছে শ্রমবিভাগটি অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। কিন্তু জাতিভেদ ব্যবস্থাও কি একটি বিশেষ শ্রমবিভাগ ছিল না? কর্পোরেশন ব্যবস্থাও কি আরেকটি শ্রমবিভাগ ছিল না? আর ইংলণ্ডে হস্তশিল্প-কারখানা কালের যে শ্রমবিভাগ সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি আরম্ভ হয়ে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে শেষ হয়, সে শ্রমবিভাগও কি আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের শ্রমবিভাগ থেকে একেবারে পৃথক নয়?

কিন্তু শ্রী প্রুধোঁ সত্য থেকে এতটা তফাতে রয়েছেন যে, মামুলী অর্থনীতিবিদেরাও যা আলোচনা করেন, তাকেও তিনি উপেক্ষা করে চলেন। যখন তিনি শ্রমবিভাগের কথা বলেন, তখন তিনি **বিশ্ববাজারের** কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করেন না। তাহলে, চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতকে যখন কোনো উপনিবেশ ছিল না, যখন ইউরোপের কাছে আমেরিকার অস্তিত্ব ছিল না এবং পূর্ব এশিয়ার অস্তিত্ব ছিল তার কাছে কনস্টান্টিনোপল্‌রূপে মাধ্যমের মারফত, তখনকার দিনের শ্রমবিভাগ কি মূলগতভাবে পৃথক ছিল না সপ্তদশ শতকের শ্রমবিভাগ থেকে, যখন উপনিবেশ বেশ ভালভাবেই স্থাপিত হয়ে গিয়েছে?

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। সমস্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্কসহ জাতিপুঞ্জের সমগ্র আভ্যন্তরীণ সংগঠন কি একটা নির্দিষ্ট শ্রমবিভাগের অভিব্যক্তি ছাড়া অন্য কিছু? এবং শ্রমবিভাগের পরিবর্তন হলে এদেরও কি পরিবর্তন হবে না?

শ্রমবিভাগের সমস্যাটিকে শ্রী প্রুধোঁ এত কম বুঝেছেন যে, শহর ও গ্রামের বিচ্ছেদের কথা তিনি উল্লেখও করেননি, যে বিচ্ছেদ দৃষ্টান্তস্বরূপ জার্মানিতে ঘটেছিল

নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে। এর উদ্ভব বা বিকাশ সম্পর্কে শ্রী প্রুধোঁ কিছুই জানেন না; তাই তাঁর কাছে এই বিচ্ছেদ হচ্ছে এক শাশ্বত নিয়ম। তার বইয়ের আগাগোড়া তিনি এমনভাবে লিখেছেন যেন একটি বিশেষ উৎপাদন-পদ্ধতির এই সৃষ্টিটি অনন্তকাল টিকে থাকবে। শ্রমবিভাগ সম্পর্কে শ্রী প্রুধোঁ যা কিছু বলেছেন তা তাঁর আগে অ্যাডাম স্মিথপ্রমুখ হাজারো ব্যক্তি যা বলেছেন তারই সারাংশ মাত্র এবং সে সারাংশও আবার অত্যন্ত ভাসাভাসা ও অত্যন্ত অসম্পূর্ণ।

দ্বিতীয় বিবর্তন হল **যন্ত্র**। শ্রী প্রুধোঁর কাছে শ্রমবিভাগ ও যন্ত্রের মধ্যকার সম্পর্ক সম্পূর্ণ রহস্যময়। প্রত্যেক শ্রমবিভাগের ক্ষেত্রে ছিল তার বিশিষ্ট উৎপাদনের উপকরণ। যেমন, সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত মানুষ সবকিছুই হাতে তৈরী করত না। তখন যন্ত্র ছিল এবং তাঁত, জাহাজ, লেভার (levers) প্রভৃতির মতো অত্যন্ত জটিল যন্ত্রই ছিল।

তাই, সাধারণভাবে শ্রমবিভাগ থেকে যন্ত্র এসেছে একথা বলার চেয়ে আজগুবি আর কিছু হতে পারে না।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, যেমন যন্ত্রপাতির উদ্ভব-ইতিহাসকে শ্রী প্রুধোঁ বুঝতে পারেননি, ঠিক তেমনই যন্ত্রপাতির বিকাশ-ইতিহাসকে তিনি আরও কম বুঝেছেন। বলা চলে, ১৮২৫ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ প্রথম বিশ্ব সংকটের পর্ব পর্যন্ত, পণ্যভোগের চাহিদা সাধারণভাবে উৎপাদনের চেয়ে দ্রুততর গতিতে বেড়েছিল এবং যন্ত্রপাতির বিকাশ হয়েছিল বাজারের প্রয়োজনের একটি অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে। ১৮২৫ সাল থেকে, যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন ও প্রয়োগের একমাত্র কারণ হল মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে লড়াই। তবে এ কথা শুধু ইংলন্ডের বেলাতেই প্রযোজ্য। ইউরোপীয় জাতিগুলি সম্পর্কে বলা যায়, নিজেদের দেশের বাজারে ও বিশ্ববাজারে ইংরেজদের প্রতিযোগিতার জন্য তারা যন্ত্রপাতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। সর্বশেষে, উত্তর আমেরিকায় যন্ত্রপাতির প্রবর্তন হয়েছিল অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ও মজুরের অভাবে অর্থাৎ উত্তর আমেরিকার জনসংখ্যা ও তার শিল্পের প্রয়োজনের মধ্যে বৈষম্যের কারণে। এইসব তথ্য থেকে বুঝতে পারবেন, শ্রী প্রুধোঁ যখন যন্ত্রপাতির বিপরীত হিসাবে তৃতীয় বিবর্তন রূপে প্রতিযোগিতার জুজু সৃষ্টি করেন, তখন কী বিজ্ঞতারই না তিনি পরিচয় দেন!

সর্বশেষে এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে, **যন্ত্রপাতিকে** শ্রমবিভাগ, প্রতিযোগিতা, ঋণ প্রভৃতির পাশাপাশি একটি অর্থনৈতিক বর্গ করে তোলা একান্তই আজগুবি ব্যাপার।

যন্ত্রপাতি যদি অর্থনৈতিক বর্গ হয় তবে হালটানা বলদও তাই। বর্তমান কালে যন্ত্রপাতির **প্রয়োগ** আমাদের বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম এক সম্পর্কপাত,

কিন্তু যে পদ্ধতিতে যন্ত্রপাতিকে কাজে লাগানো হয়, সেটা আর আসল যন্ত্রপাতিটা এক বস্তু নয়। মানুষকে জখম করার জন্যই ব্যবহৃত হোক, কিম্বা মানুষের ক্ষত সারাবার জন্যই ব্যবহৃত হোক, বারুদ বারুদই থাকে।

শ্রী প্রুধোঁ যখন প্রতিযোগিতা, একচেটিয়া কারবার, ট্যাক্স বা পুলিশ, বাণিজ্য-ব্যালান্স, ক্রেডিট এবং মালিকানাকে নিজের মাথার মধ্যে ঠিক এই পরম্পরাতেই সৃষ্ট করে তোলেন, তখন কেরামতিতে তিনি নিজেকেই ছাড়িয়ে যান। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের আগেই ইংলণ্ডে প্রায় সমস্ত ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানগুলিই গড়ে উঠেছিল। পাবলিক ক্রেডিট ছিল আর কিছুই নয়, কেবলমাত্র করবৃদ্ধির এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্ষমতালাভ থেকে উদ্ভূত নতুন নতুন চাহিদা মেটানোর এক নূতন উপায়। সর্বশেষে, শ্রী প্রুধোঁর শৃঙ্খলার শেষ বর্গ (category) হচ্ছে **মালিকানা**। আসল দুনিয়ায় কিন্তু শ্রমবিভাগ এবং শ্রী প্রুধোঁর অন্যান্য সমস্ত বর্গই হচ্ছে সামাজিক সম্পর্ক, যেগুলি সামগ্রিকভাবে আজ **মালিকানা** নামে পরিচিত। এই সম্পর্কগুলির বাইরে বুর্জোয়া মালিকানা একটা অধিবিদ্যক অথবা আইনী ভেলকি ছাড়া আর কিছুই নয়। ভিন্ন যুগের মালিকানা, সামন্ত মালিকানা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সামাজিক সম্পর্কধারার মধ্যে গড়ে ওঠে। মালিকানাকে স্বাধীন সম্পর্করূপে দেখাতে গিয়ে শ্রী প্রুধোঁ শুধু যে পদ্ধতিগত একটা ভুল করেছেন তা নয়, তিনি স্পষ্টই প্রমাণ দিয়েছেন যে, **বুর্জোয়া** উৎপাদনের সমস্ত রূপগুলিকে একত্রে বিধৃত করে রাখে যে বন্ধন, তাকে তিনি ধরতে পারেননি এবং কোনো বিশেষ যুগের উৎপাদনের রূপগুলির **ঐতিহাসিক ও অচিরস্থায়ী** প্রকৃতিও তিনি বুঝতে পারেননি। আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে শ্রী প্রুধোঁ ইতিহাসসঞ্জাত বলে মনে করেন না, তিনি তাদের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে কিছুই বোঝেন না। তাই, সেই প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে তিনি শুধু অন্ধ গোঁড়ামিদুষ্ট সমালোচনাই করতে পারেন।

সেইজন্যই শ্রী প্রুধোঁ বিকাশধারার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে **অলীকতার** আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি ধরে নিয়েছেন, শ্রমবিভাগ, ক্রেডিট, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি -- সবকিছুই আবিষ্কৃত হয়েছিল তাঁর বদ্ধমূল ধারণা, সাম্যের ধারণাকে প্রমাণিত করার জন্য। অপূর্ব সরল তাঁর ব্যাখ্যা। সাম্যের স্বার্থেই এই বস্তুগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সাম্যের বিরুদ্ধে গেল। এই হল তাঁর সমগ্র যুক্তি। অর্থাৎ, প্রথমে তিনি খুশিমতো এক অনুমান করলেন এবং পরে প্রকৃত ঘটনাবলী যখন প্রতি পদে তার এ অলীকতাকে খণ্ডন করছে, তখন তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, বিরোধ রয়েছে। সে বিরোধ যে শুধু তাঁর বদ্ধমূল ধারণা ও বাস্তব গতির মধ্যে, সে কথা তিনি চেপে গিয়েছেন।

অতএব, প্রধানত ইতিহাসের জ্ঞানের অভাবের জন্যই শ্রী প্রুধোঁ দেখতে পাননি যে, মানুষের উৎপাদন-শক্তি যতই বিকাশলাভ করতে থাকে, অর্থাৎ যতই তারা বাঁচতে

থাকে, ততই পরস্পরের সঙ্গে তাদের কতকগুলি সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে এবং উৎপাদন-শক্তির পরিবর্তন ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যম্ভাবীরূপেই এই সম্পর্কগুলির প্রকৃতিরও পরিবর্তন হয়। তিনি দেখতে পাননি যে, **অর্থনৈতিক বর্গগুলি** এই আসল সম্পর্কগুলির **অমূর্তায়ণ** মাত্র। এবং এই সম্পর্ক বর্তমান থাকার অবস্থাতেই তা সত্য। তাই তিনি বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের ভুলই করে বসেছেন, যাঁরা এইসব অর্থনৈতিক বর্গগুলিকে ঐতিহাসিক নিয়ম নয়, চিরন্তন বলে ধরে নিয়েছেন। সে ঐতিহাসিক নিয়মগুলি কেবলমাত্র একটি বিশেষ ঐতিহাসিক বিকাশের পক্ষেই, উৎপাদন-শক্তিসমূহের বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরের নিয়ম। অতএব অর্থশাস্ত্রীয় বর্গগুলিকে প্রকৃত, অচিরস্থায়ী, ঐতিহাসিক সামাজিক সম্পর্কসমূহের অমূর্তায়ণ বলে গ্রহণ করার পরিবর্তে শ্রী প্রুধোঁ তাঁর রহস্যবাদী উল্টা-দৃষ্টির বলে প্রকৃত সম্পর্কগুলির মধ্যে এই অমূর্তায়ণগুলিরই রূপায়ণ দেখেছেন। এই অমূর্তায়ণগুলিও আবার জগতের আদিকাল হতে পিতা ঈশ্বরের বুকের মধ্যে সূত্রাকারে সুপ্ত ছিল।

এখানে কিন্তু বেচারা শ্রী প্রুধোঁ এক গুরুতর চিন্তা-বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছেন। যদি এই সমস্ত অর্থনৈতিক বর্গগুলিই ঈশ্বরের বক্ষোকন্দর থেকে বেরিয়ে এসে থাকে, এরাই যদি মানুষের অন্তর্নিহিত ও শাশ্বত জীবন হয়, তবে প্রথমত, কেমন করে বিকাশ বলে জিনিসটি সম্ভব হয় এবং দ্বিতীয়ত, কেমন করেই বা শ্রী প্রুধোঁকে রক্ষণশীল না বলে পারা যায়? এই সুস্পষ্ট অন্তর্বিরোধগুলির ব্যাখ্যা তিনি করেছেন এক পুরা বিরোধপ্রণালীর সাহায্যে।

এই বিরোধপ্রণালী ভালভাবে দেখাবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক।

একচেটিয়াবৃত্তি ভাল জিনিস, কারণ এটি একটি অর্থনৈতিক বর্গ, অতএব ঈশ্বর থেকে নিঃসৃত। প্রতিযোগিতা ভাল জিনিস, কারণ এও একটি অর্থনৈতিক বর্গ। কিন্তু, যা ভাল নয় তা হচ্ছে একচেটিয়াবৃত্তির বাস্তবতাটা এবং প্রতিযোগিতার বাস্তবতাটা। যা আরও খারাপ তা হচ্ছে এই যে, প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়াবৃত্তি পরস্পরকে গ্রাস করে। কী করা যাবে? ঈশ্বরের এই দুটি শাশ্বত ভাব যখন পরস্পরের বিরুদ্ধাচারী, তখন শ্রী প্রুধোঁর কাছে একথা স্পষ্ট যে, ঈশ্বরের বুকের মধ্যে এ দুয়ের সংশ্লেষণও থাকার কথা এবং সে ক্ষেত্রে একচেটিয়াবৃত্তির কুফল প্রতিযোগিতার দ্বারা ও প্রতিযোগিতার কুফল একচেটিয়াবৃত্তির দ্বারা অপসৃত হয়ে সমতা রক্ষিত হচ্ছে। দুইটি ভাবের সংগ্রামের ফলে কেবলমাত্র তাদের ভাল দিকটাই আত্মপ্রকাশ করবে। এই গোপন ভাবটি ঈশ্বর থেকে নিষ্কাশন করে এনে প্রয়োগ করলেই সবকিছুই পরম কল্যাণকর হয়ে উঠবে। মানুষের নৈর্ব্যক্তিক প্রজ্ঞার অন্ধকারে সংগুপ্ত হয়ে আছে যে সমন্বয়ী সূত্র, তাকে প্রকাশ করতে হবে। এই প্রকাশকর্তারূপে এগিয়ে আসতে শ্রী প্রুধোঁ এক মুহূর্তও দ্বিধা করেননি।

কিন্তু মুহূর্তের জন্য বাস্তব জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখুন। বর্তমান কালের অর্থনৈতিক জীবনে শুধু প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়াবৃত্তিই দেখতে পাবেন না; দেখবেন তাদের সংশ্লেষণও, এবং সেটা **সূত্র** নয়, **গতি**। একচেটিয়াবৃত্তি জন্ম দেয় প্রতিযোগিতার, প্রতিযোগিতা জন্ম দেয় একচেটিয়াবৃত্তির। কিন্তু বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা যা মনে করে সেভাবে এই সমীকরণ বর্তমান পরিস্থিতির অসুবিধা দূর করা দূরে থাকুক. আরও কঠিন ও বিভ্রান্তিকর একটা পরিস্থিতিরই সৃষ্টি করে। অতএব, বর্তমান কালের অর্থনৈতিক সম্পর্কসমূহ যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে তাকে যদি পালটে দেওয়া হয়, যদি বর্তমান উৎপাদন-**পদ্ধতিকেই** ধ্বংস করা হয়, তাহলে শুধু যে প্রতিযোগিতা, একচেটিয়াবৃত্তি এবং তাদের পারস্পরিক বিরোধিতাকেই ধ্বংস করা হবে তাই নয়, তাদের ঐক্যকে, তাদের সংশ্লেষণকে, প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়াবৃত্তির মধ্যে সত্যকার ভারসাম্য রক্ষা করে যে গতি তাকেও ধ্বংস করা হবে।

এবার আমি আপনাকে শ্রী প্রুধোঁর দ্বান্দ্বিকতার একটি দৃষ্টান্ত দেব।

স্বাধীনতা ও দাসত্ব নিয়ে একটি পারস্পরিক বৈরভাব গঠিত। স্বাধীনতার ভাল ও মন্দ দিকগুলি সম্পর্কে বলার প্রয়োজন নেই, দাসত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়েও তার খারাপ দিকগুলির আলোচনা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। শুধুমাত্র এর ভাল দিকটাই ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। আমরা এখানে পরোক্ষ দাসত্ব নিয়ে, প্রলেতারিয়েতের দাসত্ব নিয়ে আলোচনা করছি না; আলোচনা করছি প্রত্যক্ষ দাসত্ব নিয়ে, আলোচনা করছি সুরিনামে, ব্রেজিলে, উত্তর আমেরিকার দক্ষিণী রাষ্ট্রগুলিতে কৃষ্ণজাতিদের দাসত্ব নিয়ে।

যন্ত্রপাতি, ক্রেডিট ইত্যাদির মতোই প্রত্যক্ষ দাসত্বও আমাদের বর্তমান শিল্পায়নের একটি খুঁটি। দাসত্ব ছাড়া তুলা অসম্ভব এবং তুলা ছাড়া বর্তমান শিল্প অসম্ভব। দাসত্ব উপনিবেশগুলিকে মূল্যদান করেছে, উপনিবেশগুলি বিশ্ববাণিজ্য সৃষ্টি করেছে, আবার বিশ্ববাণিজ্য হল বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের অপরিহার্য শর্ত। নিগ্রোদের নিয়ে দাস ব্যবসায় শুরু হবার আগে উপনিবেশগুলি পুরাতন দুনিয়াকে খুব অল্প উৎপন্ন পণ্য সরবরাহ করত এবং পৃথিবীতে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। অতএব দাসত্ব একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বর্গ: দাসত্ব ব্যতীত সবচেয়ে প্রগতিশীল দেশ উত্তর আমেরিকা একটি পিতৃতান্ত্রিক দেশে পরিণত হত। জাতিপুঞ্জের মানচিত্র থেকে উত্তর আমেরিকাকে মুছে দিলেই দেখা দিবে শুধু নৈরাজ্য এবং বাণিজ্য ও আধুনিক সভ্যতার সম্পূর্ণ ধ্বংস। কিন্তু দাসত্ব বিলুপ্ত হতে দেওয়ার অর্থ জাতিপুঞ্জের মানচিত্র থেকে উত্তর আমেরিকাকে মুছে দেওয়া। সেইজন্যই, অর্থনৈতিক বর্গ বলেই দাসত্বকে দুনিয়ার আদি থেকেই প্রত্যেক জাতির মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। আধুনিক জাতিগুলি শুধু কী ভাবে নিজের দেশে দাসত্বকে ঢেকে রাখতে হয় সেইটে শিখেছে,

নতুন দুনিয়ায় সেটা রপ্তানি করেছে খোলাখুলি। দাসত্ব সম্পর্কে এইসব কথার পর আমাদের সুযোগ্য শ্রী প্রুধোঁ আর কী ভাবে এগোবেন? তিনি স্বাধীনতা ও দাসত্বের মধ্যে একটা সংশ্লেষণের সন্ধান করবেন, সন্ধান করবেন স্বাধীনতা ও দাসত্বের মধ্যে একটা সুবর্ণ মধ্যপন্থার অথবা ভারসাম্যের।

একথা শ্রী প্রুধোঁ বেশ ভালভাবেই বুঝতে পেরেছেন যে, মানুষই কাপড়, লিনেন, রেশন প্রভৃতি তৈরি করে, এবং এইটুকু বুঝতে পারাও তাঁর পক্ষে মহাকীর্তি বইকি! কিন্তু যা তিনি বুঝতে পারেননি তা হচ্ছে এই যে, এই মানুষগুলিই তাদের উৎপাদন-শক্তি অনুযায়ী সেইসব **সামাজিক সম্পর্কও** তৈরি করে, যে-সম্পর্কের মধ্যে তারা কাপড় ও লিনেন উৎপাদন করে। এর চেয়ে আরও কম যেটা তিনি বুঝেছেন তা হচ্ছে এই যে, যে-মানুষ নিজেদের বৈষয়িক উৎপাদন অনুযায়ী নিজেদের সামাজিক সম্পর্ককে সৃষ্টি করে, সেই মানুষই আবার **ভাবের, বর্গের** অর্থাৎ এই সামাজিক সম্পর্কগুলিরই অমূর্ত আদর্শ অভিব্যক্তির সৃষ্টি করে। কাজেই, বর্গগুলিও তাদের দ্বারা প্রকাশিত সম্পর্কগুলির চেয়ে বেশী শাশ্বত নয়। এরা ঐতিহাসিক ও অচিরস্থায়ী সৃষ্টি। কিন্তু শ্রী প্রুধোঁর কাছে অমূর্তায়ণ, বর্গ -- এগুলিই হচ্ছে আদি কারণ। তাঁর মতে, মানুষেরা নয়, এরাই ইতিহাস সৃষ্টি করে। **অমূর্তায়ণ ও বর্গকে স্বতন্ত্রভাবে দেখলে,** অর্থাৎ মানুষ ও তাদের বৈষয়িক কার্যাবলী থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে, নিশ্চয় তা অমর, অপরিবর্তনীয়, নিশ্চল। তা হচ্ছে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার ফল, যার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, অমূর্তায়ণটা অমূর্তায়ণ হিসেবে অমূর্ত। চমৎকার **জ্ঞাতজ্ঞাপন!**

অতএব, শ্রী প্রুধোঁর কাছে বর্গরূপে বিবেচিত অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি শাশ্বত সূত্র, যাদের উদ্ভবও নেই, অগ্রগতিও নেই।

ব্যাপারটা অন্যভাবে বলা যাক। শ্রী প্রুধোঁ খোলাখুলি একথা বলছেন না যে, তাঁর কাছে **বুর্জোয়া জীবন একটি শাশ্বত সত্য**; সে কথা তিনি বলছেন পরোক্ষভাবে, যখন তিনি বর্গগুলিকে দেবত্ব দান করছেন, যেগুলি হচ্ছে ভাবরূপে অভিব্যক্ত বুর্জোয়া সম্পর্কাবলীই। বুর্জোয়া সমাজের উৎপন্নগুলি তাঁর মনের কাছে বর্গরূপে প্রতিভাত হওয়া মাত্র সেগুলিকে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত, স্বকীয় জীবনসম্পন্ন চিরন্তন জীব বলে ধরে নিয়েছেন। তাতে করে বুর্জোয়া দিগন্তের ঊর্ধ্বে তিনি ওঠেননি। বুর্জোয়া ভাবধারা-গুলি নিয়েই যেহেতু তাঁর কারবার, তাদের শাশ্বত সত্য বলেই তিনি ধরে নিয়েছেন, তাই তাদের একটা সংশ্লেষণ বা ভারসাম্যের সন্ধান তিনি করেছেন; তিনি কিন্তু বুঝতে পারেননি যে, বর্তমানের যে পদ্ধতিতে তারা ভারসাম্যে পৌঁছয়, তাই হল একমাত্র সম্ভাব্য পদ্ধতি।

প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত ভালমানুষ বুর্জোয়া যা করেন, শ্রী প্রুধোঁও তাই করেছেন। তাঁরা সকলেই বলে থাকেন যে, নীতিগতভাবে অর্থাৎ বিমূর্তভাবে বিবেচনা করলে

প্রতিযোগিতা, একচেটিয়াবৃত্তি ইত্যাদিই হচ্ছে জীবনের একমাত্র ভিত্তি, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই সব নয়, বাঞ্ছনীয় আরও অনেক কিছুই বাকি থাকে। এ'রা সকলেই প্রতিযোগিতা চান তার মারাত্মক ফলটা বাদ দিয়ে। তাঁরা সকলেই চান অসম্ভবকে, অর্থাৎ বুর্জোয়া জীবনযাত্রার অবশ্যম্ভাবী ফলগুলি বাদ দিয়ে সেই বুর্জোয়া জীবনযাত্রার পরিস্থিতিকে। তাঁদের কেউই একথা বোঝেন না যে, উৎপাদনের বুর্জোয়া পদ্ধতি হচ্ছে ঐতিহাসিক ও অচিরস্থায়ী, ঠিক যেমন ছিল সামন্তবাদী রূপ। তাঁদের এই ভুলের কারণ এই যে, তাঁরা মনে করেন বুর্জোয়া মানুষই হচ্ছে সমস্ত সমাজের একমাত্র সম্ভাব্য ভিত্তি, এমন কোনো সমাজব্যবস্থা তাঁরা কল্পনা করতে পারেন না যেখানে মানুষ আর বুর্জোয়া নয়।

কাজে কাজেই শ্রী প্রুধোঁ অনিবার্যভাবেই হয়ে পড়েন **মতবাগীশ**। যে ঐতিহাসিক গতি বর্তমান দুনিয়াকে একেবারে উল্টে দিচ্ছে, তা তাঁর কাছে দুটি বুর্জোয়া ভাবের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য, সংশ্লেষণ আবিষ্কারের সমস্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই এই চতুর ব্যক্তিটি সূক্ষ্ম প্যাঁচে ঈশ্বরের গোপন চিন্তাটি, অর্থাৎ দুইটি বিচ্ছিন্ন ভাবের ঐক্যটি আবিষ্কার করে ফেলেন; সে ভাব যে বিচ্ছিন্ন তার একমাত্র কারণ, শ্রী প্রুধোঁ এদের ব্যবহারিক জীবন থেকে, বর্তমান কালের উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন; বর্তমান কালের এ উৎপাদন হচ্ছে সেই সব বাস্তবতারই সমাহার, যার অভিব্যক্তি হচ্ছে ঐ দুটি ভাব। ইতিপূর্বেই অর্জিত মানুষের উৎপাদন-শক্তিসমূহ এবং সেগুলির সঙ্গে আর-যা খাপ খায় না তাদের সেই সামাজিক সম্পর্কসমূহের স্থলে, এদের সংঘর্ষ থেকে উদ্ভূত বিরাট ঐতিহাসিক আন্দোলনের স্থলে; প্রত্যেক জাতির অভ্যন্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে সব ভীষণ যুদ্ধের প্রস্তুতি চলেছে তাদের স্থলে; জনসাধারণের যে ব্যবহারিক বৈপ্লবিক কর্মের দ্বারাই কেবল এই সংঘর্ষের সমাধান হতে পারে, তার স্থলে — এই বিরাট, সুদীর্ঘ ও জটিল গতির স্থলে শ্রী প্রুধোঁ হাজির করেন তাঁর নিজের মস্তিষ্কের খামখেয়ালী গতিকে। তাই, পণ্ডিত ব্যক্তিরাই, অর্থাৎ যাঁরা ঈশ্বরের গোপন চিন্তাটা মেরে দিতে পারেন, তাঁরাই ইতিহাস সৃষ্টি করেন। সাধারণ মানুষের কাজ শুধু তাঁদের ধ্যানসত্যকে কার্যে পরিণত করা। এ থেকেই আপনি বুঝতে পারবেন, কেন শ্রী প্রুধোঁ সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের ঘোষিত শত্রু। তাঁর মতে বর্তমান কালের সমস্যাবলীর সমাধান হবে জনসাধারণের ক্রিয়ায় নয়, তার মস্তিষ্কের দ্বান্দ্বিক আবর্তনে। যেহেতু তাঁর কাছে বর্গগুলিই হচ্ছে চালিকা-শক্তি, তাই বর্গগুলিকে পরিবর্তন করার জন্য বাস্তব জীবনকে পরিবর্তন করার প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন না। বরঞ্চ ঠিক বিপরীত: বর্গগুলিকে পরিবর্তন করলেই বর্তমান সমাজেরও পরিবর্তন ঘটবে।

এই অন্তর্বিরোধগুলির ভিত্তিকেই কি উচ্ছেদ করা উচিত নয়, সে প্রশ্ন কিন্তু

অন্তর্বিরোধগুলিকে মেলাবার চেষ্টায় শ্রী প্রুধোঁ একটিবারও করেননি। তিনি ঠিক সেই রাজনৈতিক মতবাগীশের মতোই, যিনি রাজা, প্রতিনিধি পরিষদ ও অভিজাতদের পরিষদকে সমাজ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে, শাশ্বত বর্গ হিসাবে বজায় রাখতে চান। তিনি শুধু এমন একটি নূতন সূত্র বার করার চেষ্টা করছেন যার দ্বারা এই শক্তিগুলির মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায়; অথচ বর্তমান গতিটাই হল সেই ভারসাম্য, যে গতির মধ্যে কখনো এক শক্তি অন্য শক্তির বিজেতা, কখনো বা তার দাস। এইভাবে অষ্টাদশ শতকে একরাশ মাঝারি মাথাওয়ালা লোক এমন একটি সত্য সূত্র আবিষ্কারে ব্যস্ত হয়েছিল, যার দ্বারা সামাজিক সম্প্রদায়গুলি, অভিজাত শ্রেণী, রাজা, পার্লামেণ্ট ইত্যাদিব মধ্যে ভারসাম্য ঘটবে, আর হঠাৎ একদিন তারা দেখতে পেল যে, প্রকৃতপক্ষে কোনো রাজা, পার্লামেণ্ট বা অভিজাত সম্প্রদায় নেই। এই বিরোধের প্রকৃত ভারসাম্য হচ্ছে সেই সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের উচ্ছেদে, যে সম্পর্কগুলিই ছিল এই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলির এবং তাদের বিরোধের ভিত্তিস্বরূপ।

শাশ্বত ভাবগুলিকে, বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার বর্গগুলিকে শ্রী প্রুধোঁ একদিকে ফেলেছেন, অন্যদিকে ফেলেছেন মানুষকে ও তার ব্যবহারিক জীবনকে, যা তার মতে এই বর্গগুলিরই প্রয়োগ। সেইজন্যই গোড়া থেকেই তাঁর মধ্যে দেখতে পাই জীবন ও ভাবের মধ্যে, আত্মা ও দেহের মধ্যে একটা দ্বৈততা, যা বহুরূপে প্রকাশ পায়। এখন বুঝতে পারছেন, এই বিরোধ আর কিছুই নয়, — যে বর্গগুলিকে শ্রী প্রুধোঁ দেবতার স্তরে তুলে দেন, সেগুলির ইহলৌকিক উদ্ভব ও ইতিহাসকে শ্রী প্রুধোঁর বুঝতে পারার অক্ষমতা।

আমার পত্র ইতিমধ্যেই এত দীর্ঘ হয়ে পড়েছে যে, শ্রী প্রুধোঁ কমিউনিজমের বিরুদ্ধে যে আজগুবি অভিযোগ উত্থাপন করেন, সে সম্পর্কে আলোচনার আর অবকাশ নেই। আপাতত একথা আপনি মেনে নেবেন যে, সমাজের বর্তমান অবস্থাকে যে ব্যক্তি বুঝতে পারেননি, তাঁব পক্ষে সেই ব্যবস্থার উচ্ছেদের আন্দোলনকে এবং সেই বৈপ্লবিক আন্দোলনের সাহিত্যিক অভিব্যক্তিকে আরও কম বোঝাই সম্ভব।

যে **একটিমাত্র বিষয়ে** আমি শ্রী প্রুধোঁর সঙ্গে একমত, তা হচ্ছে ভাবাবেগাপ্লুত সমাজতান্ত্রিক দিবাস্বপ্নের প্রতি তার তীব্র বিরক্তি। ইতিপূর্বেই, শ্রী প্রুধোঁর আগেই, আমি মেষমস্তক, ভাবালুতাগ্রস্থ, ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রকে বিদ্রূপ করে বহু শত্রুতা জুটিয়েছি। সোশ্যালিস্ট ভাবালুতার বিরুদ্ধে, যা দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে, ফুরিয়ে-র ক্ষেত্রে আমাদের মান্যবর প্রুধোঁর আত্মম্ভরি মামুলিয়ানার চেয়ে অনেক বেশী গভীর, তার বিরুদ্ধে নিজের পেটি বুর্জোয়া ভাবালুতাকে উপস্থাপিত করে শ্রী প্রুধোঁ কি অদ্ভুতভাবে আত্মপ্রবঞ্চনা করছেন না? শ্রী প্রুধোঁর পেটি বুর্জোয়া ভাবালুতা বলতে এখানে আমি গৃহ, দাম্পত্যপ্রেম ও অন্যান্য সব মামুলী ব্যাপার নিয়ে তাঁর ভাবোচ্ছ্বাসের

কথাই বলছি। নিজের যুক্তিসমূহের অন্তঃসারশূন্যতা সম্পর্কে, এই বস্তুগুলির আলোচনায় নিজের একান্ত অক্ষমতা সম্পর্কে নিজে সম্পূর্ণ সচেতন বলেই তিনি হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, উদাত্ত ক্রোধে ফেটে পড়েন, চীৎকার করেন, মুখ দিয়ে গেঁজলা তোলেন, শাপশাপান্ত করেন, গালি দেন, ধিক্কার হানেন, বুক চাপড়ান এবং ঈশ্বর ও মানুষের কাছে দম্ভভরে ঘোষণা করেন যে, সোশ্যালিস্ট কলঙ্কের দাগ তাঁর গায়ে লাগেনি! সোশ্যালিস্ট ভাবালুতাকে অথবা সোশ্যালিস্ট ভাবালুতা বলতে তিনি যা বোঝেন তাকে সমালোচনা করেননি তিনি। তিনি সাধু মোহান্তের মতো, পোপের মতো হত-ভাগ্য পাপীদের বহিষ্কৃত করে দেন এবং পেটি বুর্জোয়াদের গুণগান করেন, গার্হস্থ্যজীবনের শোচনীয় প্রেম ও পিতৃতান্ত্রিক মোহের গুণগান করেন। কিন্তু এটা আকস্মিক নয়। কারণ, শ্রী প্রুধোঁ হচ্ছেন আপাদমস্তক পেটি বুর্জোয়াদের দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ। উন্নত সমাজে **পেটি বুর্জোয়ারা** তাদের অবস্থানের কারণেই আবশ্যিকভাবে একদিকে সোশ্যালিস্ট, অন্যদিকে অর্থনীতিবিদ হয়ে ওঠে, অর্থাৎ বৃহৎ বুর্জোয়ার মহিমায় তাদের চোখে ধাঁধা লাগে এবং জনসাধারণের দুর্গতির প্রতি তাদের সহানুভূতিও থাকে। তারা হচ্ছে একাধারে বুর্জোয়া ও জনসাধারণের লোক। অন্তরে অন্তরে তারা এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, তারা নিরপেক্ষ এবং সঠিক ভারসাম্য খুঁজে পেয়েছে, যে ভারসাম্যটা সুবর্ণ মধ্যপন্থা থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র বলে তাদের ধারণা। এই ধরনের পেটি বুর্জোয়া **অন্তর্বিরোধের** গুণগান করে, কারণ অন্তর্বিরোধই হচ্ছে তার সত্তার সারনির্যাস। নিজে সে একটা রূপায়িত সামাজিক অন্তর্বিরোধ ছাড়া কিছুই নয়। কার্যক্ষেত্রে সে নিজে যা, সেটাকে তার সমর্থন করতে হবে তত্ত্ব দিয়ে। ফরাসী পেটি বুর্জোয়ার বৈজ্ঞানিক ভাষ্যকার হবার যোগ্যতা শ্রী প্রুধোঁর আছে — সত্যি করেই যোগ্যতা, কারণ পেটি বুর্জোয়া হবে সমস্ত আসন্ন সমাজবিপ্লবের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

অর্থশাস্ত্র সংক্রান্ত আমার বইখানি যদি এই পত্রের সঙ্গে আপনাকে পাঠাতে পারতাম তাহলে ভাল হত। কিন্তু বইখানা ছাপানো আমার পক্ষে এখনও সম্ভব হয়নি; জার্মান দার্শনিকদের ও সোশ্যালিস্টদের যে সমালোচনার কথা ব্রাসেলসে আপনাকে বলেছিলাম তাও ছাপানো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। জার্মানিতে এই ধরনের বই ছাপাতে গেলে যে কীরূপ বাধার সম্মুখীন হতে হয়, তা আপনি বিশ্বাস করবেন না। বাধা আসে একদিকে পুলিশের নিকট থেকে, অন্যদিকে প্রকাশকদের নিকট থেকে, যারা নিজেরাই হচ্ছে সেই সব ধারারই স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি যে-ধারাগুলিকে আমি আক্রমণ করছি। আর আমাদের পার্টির কথা বলতে গেলে বলতে হয়, তা যে শুধু দরিদ্র তাই নয়, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির একটা বড় অংশ আমার উপর ক্রুদ্ধ এই কারণে যে, আমি তাদের ইউটোপিয়া ও ভাবোচ্ছ্বাসগুলির বিরোধিতা করেছি ...

ইয়ো. ভেইদেমেয়ার সমীপে মার্ক্স

লণ্ডন, ৫ই মার্চ, ১৮৫২

...এখন আমার প্রসঙ্গ ধরলে, বর্তমান সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব আবিষ্কারের, বা তাদের মধ্যে সংগ্রাম আবিষ্কারের কৃতিত্ব আমার নয়। আমার বহুপূর্বে বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা এই শ্রেণী-সংগ্রামের ঐতিহাসিক বিকাশের ধারা এবং বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা বিভিন্ন শ্রেণীর অর্থনৈতিক শারীরস্থান বর্ণনা করেছেন। আমি নূতন যা করেছি তা হচ্ছে এইটে প্রমাণ করা যে, ১) **উৎপাদনের বিকাশের বিশেষ** ঐতিহাসিক স্তরের সঙ্গেই শুধু **শ্রেণীসমূহের অস্তিত্ব** জড়িত; ২) শ্রেণী-সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবীরূপেই **প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বে** পেঁছয়; ৩) এই একনায়কত্বটাও হল **সমস্ত শ্রেণীর বিলুপ্তি ও একটি শ্রেণীহীন সমাজে** উত্তরণ মাত্র...

এঙ্গেলস সমীপে মার্ক্স

লণ্ডন, ১৬ই এপ্রিল, ১৮৫৬

...*People's Paper** পত্রিকাখানির বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত পরশু একটি ছোটোখাটো ভোজসভা হয়েছিল। এবার আমি আমন্ত্রণ গ্রহণ করি, কেননা মনে হয়েছিল এটা সময়োপযোগী হবে, গ্রহণ করি আরো এই জন্য যে, দেশান্তরীদের মধ্যে **একমাত্র** আমিই ছিলাম আমন্ত্রিত (পত্রিকায় তাই ঘোষণা করা হয়), প্রথম স্বাস্থ্যপান প্রস্তাবও জোটে আমার ভাগ্যেই; ঠিক হয়েছিল সমস্ত দেশের প্রলেতারিয়েতের সার্বভৌমতা নিয়ে আমাকে বলতে হবে। অতএব, ইংরেজীতে ছোট একটি বক্তৃতা করেছিলাম, যা ছাপাতে আমি চাই না।** আমার মনে মনে যে উদ্দেশ্য ছিল তা সিদ্ধ হয়েছিল। যাকে আড়াই শিলিং দিয়ে টিকিট কিনতে হয়েছিল সেই শ্রী তালাঁদিয়ে এবং ফরাসী ও অন্যান্য দেশান্তরী দঙ্গলের বাকী সকলেই সুনিশ্চিত হয়েছে যে, আমরাই হচ্ছি চার্টিস্টদের একমাত্র **অন্তরঙ্গ** মিত্র এবং যদিও আমরা প্রকাশ্যে জাহির করি না

* *People's Paper* — লণ্ডনে ১৮৫২-৫৮ সালে প্রকাশিত চার্টিস্টদের মুখপত্র। এর সম্পাদক ছিলেন আর্নেস্ট জোন্‌স্। — সম্পাঃ

** ১৮৫৬ সালের ১৯শ এপ্রিল *People's Paper* পত্রিকায় প্রকাশিত ভোজসভার রিপোর্টে মার্ক্সের বক্তৃতা প্রকাশিত হয়। বর্তমান সংস্করণের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় অংশের ২০—২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

এবং চার্টিজমের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে দহরমমহরমটা ফরাসীদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছি, তবু যে স্থানটি ঐতিহাসিকভাবে আমাদের প্রাপ্য সে স্থানটি যে কোনো সময় আবার আমরা দখল করতে পারি। এবং সেটা আরও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এই জন্য যে, পিয়া-র সভাপতিত্বে ২৫শে ফেব্রুয়ারীর সভায় **শেরৎসার** নামক সেই বুড়ো জার্মান গর্দভটা এগিয়ে এসে মারাত্মক গিল্ড সংকীর্ণতায় জার্মান 'পণ্ডিতদের' ও 'বুদ্ধিজীবী কর্মীদের' চুটিয়ে গালাগালি দিতে আরম্ভ করে, যারা তাদের (গর্দভদের) গাছে তুলে দিয়ে সরে পড়েছে এবং অন্যান্য জাতির সামনে নিজেদের হেয় প্রতিপন্ন করতে তাদের বাধ্য করেছে। প্যারিসে থাকার সময় থেকেই তো এই শেরৎসারকে তুমি জানো। বন্ধু **শাপারের** সঙ্গে আরও কয়েকবার আমার সাক্ষাৎকার হয়েছে, দেখেছি সে অত্যন্ত অনুতপ্ত পাপী। গত দুই বছর ধরে সে যে অবসর গ্রহণ করে আছে তাতে মনে হয় যেন তার মানসিক শক্তির বাহার বেড়েছে। বুঝতেই পারছ, যে কোনো বিপদ আপদে এই লোকটিকে হাতে রাখা এবং বিশেষ করে ভিলিখের কবল থেকে বাইরে রাখা সব সময়ই ভাল। শাপার এখন উইন্ডমিল স্ট্রীটের* গর্দভদের প্রতি রেগে লাল হয়ে আছে।

স্টেফেনের কাছে লেখা তোমার চিঠিখানি আমি পৌঁছিয়ে দেব। লেভির চিঠিখানা ওখানে নিজের কাছে রেখে দেওয়া তোমার উচিত ছিল। যেগুলি আমার কাছে ফেরত পাঠাতে বলব না, সেই চিঠিগুলি সম্পর্কে সাধারণভাবে এই কাজটি করবে। চিঠিগুলি যত কম ডাকে দেওয়া হয় ততই ভাল। রাইন প্রদেশ সম্পর্কে তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। আমাদের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার এই যে, ভবিষ্যতে এমন কিছু দেখছি যা থেকে 'পিতৃভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার' গন্ধ পাওয়া যায়। পুরাতন বিপ্লবে মাইন্স ক্লাবিস্টদের** যে অবস্থা হয়েছিল সেই অবস্থায় পড়তে আমরা বাধ্য হই কিনা তা বহুলাংশ নির্ভর করছে বার্লিনের ঘটনাবলী কী রূপ নেবে তার উপর। ব্যাপার তাহলে আমাদের পক্ষে কঠিন হবে। রাইনের অপর পারের আমাদের সুযোগ্য বন্ধুদের সম্পর্কে তো আমরা কম ওয়াকিবহাল নই! কৃষক যুদ্ধের এক ধরনের দ্বিতীয় সংস্করণের দ্বারা প্রলেতারীয় বিপ্লবকে সহায়তা করার উপর জার্মানিতে সবকিছু নির্ভর করবে। তাহলে চমৎকার ব্যাপার হবে ...

* লণ্ডনের উইণ্ডমিল স্ট্রীটের একটি বাড়ীতে জার্মান শ্রমিক শিক্ষা সমিতির বৈঠক হত। — সম্পাঃ

** মাইন্স ক্লাবিস্ট — মার্কস এখানে মাইন্স-এর জ্যাকোবিন ক্লাবের সভ্যদের কথা বলছেন। ১৭৯২ সালে ফরাসী বিপ্লবী ফৌজ যখন মাইন্স দখল করে এরা তখন তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। — সম্পাঃ

এঙ্গেলস সমীপে মার্কস

লণ্ডন, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭

...তোমার 'ফৌজ'* চমৎকার হয়েছে। শুধু এর আয়তন দেখে আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। কারণ, এতখানি পরিশ্রম করা তোমার পক্ষে খুব ক্ষতিকর। যদি জানতাম যে রাত্রি জেগে কাজ করতে শুরু করবে, তাহলে বরং, ব্যাপারটা চুলোয় দিতেই রাজী হতাম।

উৎপাদন-শক্তি ও সামাজিক সম্পর্কের সংযোগ সম্পর্কিত আমাদের ধারণার নির্ভুলতা **ফৌজের** ইতিহাস থেকে যত স্পষ্ট হয়ে ওঠে আর কিছু থেকে তত নয়। সাধারণভাবে, অর্থনৈতিক বিকাশের দিক থেকে ফৌজ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, ফৌজের মধ্যেই প্রাচীনেরা সর্বপ্রথম একটি পুরাপুরি মজুরি-ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। অনুরূপভাবে, রোমকদের মধ্যে peculium castrense** ছিল প্রথম আইনী রূপ, যাতে অস্থাবর সম্পত্তিতে পরিবারের পিতা ছাড়া অন্যদের অধিকারও স্বীকৃত হয়। Fabri*** কর্পোরেশানের মধ্যে গিল্ড ব্যবস্থাও প্রথম দেখা দেয়। এখানেও দেখি যন্ত্রপাতির প্রথম ব্যাপক ব্যবহার। এমনকি ধাতুর বিশেষ মূল্য এবং মুদ্রা রূপে তাদের ব্যবহারের ভিত্তিটার গুরুত্ব গোড়াতে সম্ভবত ছিল সামরিক — গ্রিস্মের প্রস্তরযুগ শেষ হবামাত্রই। একটি শাখার **মধ্যে** শ্রমবিভাগও সর্বপ্রথম ফৌজেই ঘটে। বুর্জোয়া সমাজের রূপগুলির সমগ্র ইতিহাসটি এখানে আশ্চর্য স্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হয়ে আছে। যদি কোনোদিন সময় পাও, তবে এইদিক থেকে সমস্যাটা নিয়ে কাজ কোরো।

আমার মতে তোমার বিবরণীতে মাত্র এই কয়টি বিষয় বাদ পড়েছে: ১) প্রথম আসল ভাড়াটিয়া সৈন্যদের বৃহদাকারে ও তৎক্ষণাৎ আবির্ভাব কার্থেজীয়দের মধ্যে (আমাদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য কার্থেজীয় ফৌজ সম্পর্কে বার্লিনের এক ভদ্রলোকের লেখা একখানি বই পড়ে দেখব। বইখানির কথা আমি সম্প্রতি জানতে পেরেছি)। ২) পঞ্চদশ শতকে এবং ষষ্ঠদশ শতকের প্রথম দিকে ইতালিতে ফৌজ ব্যবস্থার বিকাশ। রণকৌশলগত ধূর্ততা সেখানেই বেরিয়েছিল। কনডোটিয়েররা**** পরস্পরের সঙ্গে কী ভাবে লড়াই করত ম্যাকিয়াভেলী তাঁর ফ্লোরেন্সের ইতিহাসে তার যে বর্ণনা দিয়েছেন (জিনিসটা তোমার জন্য নকল করে পাঠাব) তা অত্যন্ত কৌতুককর। (না,

* 'নিউ আমেরিকান এনসাইক্লোপিডিয়ায়' প্রকাশিত 'ফৌজ' শীর্ষক এঙ্গেলসের প্রবন্ধ। — সম্পাঃ

** ফৌজী শিবিরের সম্পত্তি। — সম্পাঃ

*** ফৌজের সঙ্গে সংযুক্ত কারুশিল্পীরা। — সম্পাঃ

**** কনডোটিয়েররা — ইতালিতে ১৪—১৫শ শতকে ভাড়াটিয়া সৈন্যবাহিনীর নায়কেরা। কিছু কিছু নায়ক ক্ষমতা দখল করে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করে। — সম্পাঃ

যখন ব্রাইটনে তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাব — কবে? — তখন ম্যাকিয়াভেলীর বইখানি সঙ্গে করে নিয়ে যাব। তাঁর ফ্লোরেন্সের ইতিহাস এক অপূর্ব সৃষ্টি।) এবং সর্বশেষে ৩) এশীয় সামরিক ব্যবস্থা, যা প্রথমে পারসিকদের মধ্যে এবং পরে নানাভাবে পরিবর্তিত আকারে মোগল, তুর্কী ইত্যাদির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে...

ল. কুগেলমান সমীপে মার্কস

লণ্ডন, ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৫

গতকাল আপনার পত্র পেয়েছি। চিঠিখানি আমার কাছে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক লেগেছে। আপনি যে বিষয়গুলি উত্থাপন করেছেন এখন আলাদা আলাদাভাবে সেগুলির জবাব দেব।

সর্বপ্রথম **লাসালের** প্রতি আমার মনোভাব সংক্ষেপে বিবৃত করব। তিনি যখন আন্দোলন চালাচ্ছিলেন তখন আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়: ১) কারণ তাঁর আত্মম্ভরী হামবড়াইভাব এবং সেই সঙ্গে আমার ও অন্যান্যদের লেখা থেকে তার নির্লজ্জতম চুরি; ২) কারণ, তার **রাজনৈতিক** কৌশলকে আমি **নিন্দা করেছি**; ৩) কারণ, তাঁর আন্দোলন সুরু করার **আগেই** আমি এখানে লণ্ডনে বসে তাঁর কাছে পুরাপুরি ব্যাখ্যা করেছি ও 'প্রমাণ করেছি' যে, **'প্রুশীয় রাষ্ট্রের'** দ্বারা প্রত্যক্ষ **সমাজতান্ত্রিক** হস্তক্ষেপটা বাজে কথা। আমার কাছে লেখা তাঁর চিঠিগুলিতে (১৮৪৮—১৮৬৩ সাল) এবং আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে তিনি বরাবরই নিজেকে আমি যে পার্টির প্রতিনিধিত্ব করি সেই পার্টিরই সমর্থক বলে ঘোষণা করে এসেছেন। লণ্ডনে যে মুহূর্তে (১৮৬২ সালের শেষাশেষি) তিনি নিশ্চিত হলেন যে, আমার **সঙ্গে** চাতুরী করা আর তার পক্ষে সম্ভব নয়, সেই মুহূর্তে আমার এবং পুরানো পার্টির **বিরুদ্ধে** 'শ্রমিকদের একাধিপতি' রূপে আত্মপ্রকাশ করার সিদ্ধান্ত করলেন। এসব সত্ত্বেও আন্দোলনকারী হিসাবে তাঁর কাজের আমি স্বীকৃতি দিয়েছি, যদিও তাঁর স্বপ্নকালীন কর্মজীবনের শেষ দিকে সেই আন্দোলনের প্রকৃতিও আমার কাছে ক্রমেই বেশী করে দ্ব্যর্থক বলে মনে হয়েছে। তাঁর আকস্মিক মৃত্যু, পুরাতন বন্ধুত্ব, কাউণ্টেস হাৎসফেল্দের কান্নাকাটিভরা সব চিঠি, বেঁচে থাকতে যাঁকে তারা যমের মতো ভয় করত তাঁর প্রতি বুর্জোয়া পত্রিকাগুলির **কাপুরুষোচিত ঔদ্ধত্যে** ক্রোধ, এইসব কিছুর ফলে আমি হতচ্ছাড়া ব্লিন্দের বিরুদ্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রকাশ করি। (বিবৃতিটি হাৎসফেল্দ *Nordstern** পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন।) সে বিবৃতিতে আমি লাসালের কাজকর্মের **অন্তর্বস্তু** সম্পর্কে কোনো

* *Nordstern* (উত্তরের তারকা) — ১৮৬০-৬৬ সালে হামবুর্গে প্রকাশিত লাসালীয় ঝোঁকের একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা। — সম্পাঃ

আলোচনা করিনি। এই একই কারণে এবং আমার কাছে মারাত্মক বলে মনে হয়েছিল যে সব উপাদান তা দূর করতে পারব এই আশায় এঙ্গেলস ও আমি *Social-Demokrat** পত্রিকায় লিখব বলে প্রতিশ্রুতি দিই (পত্রিকাখানি উদ্বোধনী ভাষণের একটি তর্জমা প্রকাশ করে, এবং পত্রিকাখানির অনুরোধে আমি প্রুধোঁর মৃত্যু উপলক্ষে প্রুধোঁ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছি), এবং শ্‌ভাইৎসার তাঁর **সম্পাদকমণ্ডলীর একটি সন্তোষজনক কর্মসূচি** আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবার পর, আমরা নিয়মিত লেখক রূপে আমাদের নাম প্রকাশের অনুমতি দিই। বেসরকারী সভ্য হিসাবে **ভি. লিবক্লেখতের** সম্পাদকমণ্ডলীতে থাকাটা আমাদের পক্ষে আরও একটা গ্যারাণ্টি ছিল। কিন্তু শীঘ্রই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল এবং আমাদের হাতে প্রমাণ এসে গেল যে, **লাসাল** আসলে পার্টির প্রতি **বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন**। তিনি তখন বিসমার্কের সঙ্গে রীতিমতো একটা চুক্তি করেছেন (অবশ্য, **নিজের** হাতে **কোনোরূপ** গ্যারাণ্টি না রেখে)। কথা ছিল ১৮৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে তিনি হামবুর্গে যাবেন এবং সেখানে (উন্মাদ শ্‌রাম ও প্রুশীয় পুলিশের গুপ্তচর মারের সঙ্গে একযোগে) বিসমার্ককে **'বাধ্য করবেন'** শ্লেজভিগ-হোলণ্টাইনকে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে, অর্থাৎ শ্রমিকদের নামে ইত্যাদিতে তার অন্তর্ভুক্তি ঘোষণা করবেন, পরিবর্তে বিসমার্ক সার্বজনীন ভোটাধিকার এবং কিছু কিছু সোশ্যালিস্ট বুজরুকির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। দুঃখের কথা, এই প্রহসনের শেষ পর্যন্ত অভিনয় করে যেতে লাসাল পারলেন না! তাহলে তিনি ভয়ানক হাস্যকর ও নির্বোধ বলে প্রমাণিত হতেন, ফলে চিরকালের জন্য এ ধরনের সমস্ত চেষ্টারই অবসান ঘটত।

লাসাল যে এইভাবে বিপথগামী হয়েছিলেন তার কারণ, তিনি ছিলেন হের মিকেল ধরনের **'বাস্তব রাজনীতিবিদ'** যদিও তাঁর কাঠামো ছিল অনেক প্রকাণ্ড, লক্ষ্যও ছিল অনেক বড়। (প্রসঙ্গত বলে রাখি, বহুদিন আগেই মিকেলকে আমি যথেষ্ট চিনে রেখেছি, তাই বুঝতে পারি, তিনি যে এগিয়ে এসেছিলেন তার কারণ, এই তুচ্ছ **হ্যানোভারীয়ান** উকিলটিকে নিজের চৌহদ্দির বাইরে সারা জার্মানিতে নিজের কণ্ঠস্বর শোনাতে পারার এবং তাতে করে **হ্যানোভারীয়ান** স্বদেশে নিজের এই পরিস্ফীত 'বাস্তবতার' প্রতিক্রিয়ায় নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারার ও 'প্রুশীয়' আনুকূল্যে **হ্যানোভারীয়ান** মিরাবো সাজার একটি চমৎকার সুযোগ দেয় ন্যাশনাল এসোসিয়েশন**।) ন্যাশনাল এসোসিয়েশনে যোগদান করে 'প্রুশীয় শীর্ষটি' আঁকড়ে থাকার উদ্দেশ্যে মিকেল ও তাঁর বর্তমান বন্ধুরা

---

* *Social-Demokrat* — লাসালপন্থী ইয়োহান বাতিস্ত ফন শ্‌ভাইৎসার কর্তৃক ১৮৬৪ সালের শেষাশেষি থেকে বার্লিন থেকে প্রকাশিত পত্রিকা। — সম্পাঃ

** ন্যাশনাল এসোসিয়েশন — ১৮৫৯ সালের শরৎকালে প্রতিষ্ঠিত হয়। অস্ট্রিয়া ছাড়া অন্য সমস্ত জার্মান রাষ্ট্রকে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সংগঠিত এ ছিল জার্মান বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন। পরে এটি বিসমার্কের নীতি সমর্থন করে। — সম্পাঃ

যেমন প্রুশীয় রাজপ্রতিনিধি প্রবর্তিত 'নূতন যুগকে' লুফে নেন, তারা যেমন সাধারণভাবে **প্রুশীয় রক্ষণাবেক্ষণে** নিজেদের 'নাগরিক গর্ববোধ' বিকশিত করে তোলেন, ঠিক তেমনই লাসালও চেয়েছিলেন উকারমার্কের দ্বিতীয় ফিলিপের সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের মার্কুইস পোজার* ভূমিকা গ্রহণ করতে, আর বিসমার্ক নেবেন তাঁর ও প্রুশীয় রাজ্যের মধ্যে আড়কাটির ভূমিকা। তিনি শুধু ন্যাশনাল এসোসিয়েশনের ভদ্রলোকদের অনুকরণ করেছিলেন। কিন্তু এই ভদ্রলোকেরা বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে 'প্রুশীয় প্রতিক্রিয়াকে' আবাহন করেছিলেন আর লাসাল বিসমার্কের সঙ্গে করমর্দন করেছিলেন প্রলেতারিয়েতের স্বার্থে। লাসালের চেয়ে এই ভদ্রলোকদের যৌক্তিকতা ছিল বেশী, কারণ, বুর্জোয়ারা ঠিক তাঁদের নাকের সম্মুখের স্বার্থটাকেই **'বাস্তবতা'** বলে মনে করতে অভ্যস্ত, তাছাড়া বুর্জোয়া শ্রেণী সর্বত্রই, এমনকি সামন্ততন্ত্রের সঙ্গেও আপোষ করেছে, কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর প্রকৃতিই হল এই যে, তাকে আন্তরিকভাবে 'বৈপ্লবিক' হতেই হবে।

লাসালের মতো থিয়েটারী দম্ভে ভরা চরিত্রের (চাকুরি, মেয়রের পদ ইত্যাদি তুচ্ছ ঘুষ দিয়ে, অবশ্য, তাঁকে কেনা যায় না) পক্ষে এ চিন্তা ছিল দারুণ প্রলোভনের যে, সরাসরি প্রলেতারিয়েতের হিতার্থে একটি কীর্তি সম্পন্ন করছেন ফের্দিনাঁ লাসাল! আসলে সে কীর্তির আনুষঙ্গিক বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থার সম্পর্কে তিনি এতখানি অজ্ঞ ছিলেন যে, নিজের কাজের সমালোচনামূলক বিচার করার শক্তি তাঁর ছিল না। ওদিকে, ১৮৪৯-৫৯ সালের প্রতিক্রিয়াকে বরদাস্ত করতে এবং জনসাধারণের বিহ্বলতাকে চুপ করে দেখে যেতে জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীকে প্রবৃত্ত করিয়েছিল যে ঘৃণিত **'বাস্তব রাজনীতি'**, তার ফলে জার্মান শ্রমিকদের **'মনোবল এতখানি ভেঙে পড়েছিল'** যে, এক লাফে তাদের স্বর্গে তুলে দেবার প্রতিশ্রুতিদাতা এই হাতুড়ে পরিত্রাতাকে তারা স্বাগত না জানিয়ে পারেনি।

যাই হোক, এবার পরিত্যক্ত প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। *Social-Demokrat* প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে, বৃদ্ধা হাৎসফেল্দ লাসালের 'ইচ্ছাপত্রকে' কার্যে পরিণত করতে চান। (*Kreuzzeitung*-এর) ভাগনার মারফৎ তিনি বিসমার্কের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছিলেন। নিখিল জার্মান শ্রমিক সংঘ, *Social-Demokrat* ইত্যাদি তিনি তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ঠিক ছিল, শ্লেজভিগ-হোলস্টাইন গ্রাস *Social-Demokrat* পত্রিকায় ঘোষিত হবে, বিসমার্ককে সাধারণভাবে পৃষ্ঠপোষক করা হবে ইত্যাদি। লিবক্লেখত বার্লিনে ছিলেন এবং *Social-Demokrat* পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন বলেই সমগ্র খাসা পরিকল্পনাটি **বানচাল** হয়ে যায়। যদিও

* মার্কুইস পোজা — শিলারের 'ডন কার্লোস' ট্র্যাজেডির একটি চরিত্র, দ্বিতীয় ফিলিপের রাজদরবারের এক ব্যক্তি, এঁর বিশ্বাস ছিল যে, জনগণের অবস্থা উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা রাজাকে বোঝান সম্ভব এবং স্বৈরপ্রভু থেকে 'জনগণের পিতায়' তাঁর রূপান্তর ঘটানো যায়। — সম্পাঃ

চাটুকারী লাসাল পূজা, মাঝে মাঝে বিসমার্কের সঙ্গে ঢলাঢলি ইত্যাদির জন্য এঙ্গেলস ও আমি পত্রিকাখানির সম্পাদকমণ্ডলীর প্রতি প্রসন্ন ছিলাম না, তথাপি বৃদ্ধা হাৎসফেল্দের চক্রান্ত ও শ্রমিকদের পার্টির পরিপূর্ণ মর্যাদাহানি বানচান করার জন্য আপাতত পত্রিকাখানির সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে সম্পর্ক রাখা আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছিল। তাই, আমরা খারাপ হালের যতটা সম্ভব সদ্ব্যবহার করেছিলাম, যদিও ব্যক্তিগতভাবে বরাবর *Social-Demokrat* পত্রিকার কাছে আমরা লিখে আসছিলাম যে, প্রগতিপন্থীদের* মতো বিসমার্কেরও সমানে বিরোধিতা করতে হবে। এমনকি **শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির বিরুদ্ধে** বের্নহার্দ বেকার নামক সেই ফাঁকা ফুলবাবুটির চক্রান্তও আমরা সহ্য করে গিয়েছি। লাসালের ইচ্ছাপত্র অনুযায়ী প্রাপ্ত মর্যাদাটা সে রীতিমতো গুরুত্ব সহকারেই গ্রহণ করেছিল।

ইতিমধ্যে *Social-Demokrat* পত্রিকায় হের শ্‌ভাইৎসারের প্রবন্ধগুলি ক্রমেই বেশী মাত্রায় বিসমার্কগন্ধী হয়ে দাঁড়াতে লাগল। ইতিপূর্বেই আমি তাকে লিখেছিলাম যে 'জোট স্থাপনের প্রশ্নে' প্রগতিপন্থীদের **ভয় পাওয়ানো** যেতে পারে, কিন্তু **কোনো অবস্থাতেই, কখনও, প্রুশীয় সরকার** জোট সংক্রান্ত আইনের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি মেনে নেবে না। কারণ, তাতে করে আমলাতন্ত্রে ভাঙ্গন ধরবে, শ্রমিকেরা নাগরিক অধিকার লাভ করবে, চাকরবাকর সংক্রান্ত আইন (Gesindeordnung) ভেঙ্গে চুরমার হবে, পল্লী অঞ্চলে অভিজাতগণ কর্তৃক বেত্রাঘাত করা উঠে যাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি, যেটা বিসমার্ক কিছুতেই হতে দিতে পারেন না এবং যা প্রুশীয় **আমলাতান্ত্রিক** রাষ্ট্রের সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না। আমি আরও জানিয়েছিলাম যে, পরিষদ যদি জোট সংক্রান্ত আইন অগ্রাহ্য করে, তা হলে ঐ আইন বলবৎ রাখার জন্য সরকারকে কথার প্যাঁচ তৈরি করতে হবে (যেমন এই ধরনের কথা যে, সামাজিক প্রশ্নটির ক্ষেত্রে 'আরও আমূল' ব্যবস্থাবলী অবলম্বনের প্রয়োজন ইত্যাদি)। এ সবই সত্য প্রমাণিত হয়। কিন্তু হের ফন শ্‌ভাইৎসার কী করলেন? তিনি এক প্রবন্ধ লিখলেন 'বিসমার্কের' **স্বপক্ষে** এবং তাঁর সমস্ত বীরত্ব জমিয়ে রাখলেন সুলৎসে, ফাউখার প্রমুখ তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে।

আমি মনে করি শ্‌ভাইৎসার কোম্পানির **সদিচ্ছা** আছে, কিন্তু তারা 'বাস্তব **রাজনীতিবিদ'। বর্তমান** অবস্থাটা নিয়েই তাঁদের যত হিসাব এবং 'বাস্তব রাজনীতির' **বিশেষ সুবিধাটিকে** তাঁরা মিকেল কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারে দিতে রাজী নন।

---

* ১৮৬১ সালে স্থাপিত জার্মান বুর্জোয়াদের প্রগতিপন্থী পার্টির প্রতিনিধিদের কথা বলা হচ্ছে। এই পার্টির কর্মসূচিতে ছিল প্রাশিয়ার অধীনে জার্মানির ঐক্য, সারা জার্মান পার্লামেণ্ট আহ্বান, প্রতিনিধি সভার কাছে দায়িত্বশীল শক্তিশালী উদারনীতিক মন্ত্রিসভার দাবি। গণবিপ্লবের ভয়ে এরা বনিয়াদী গণতান্ত্রিক দাবি যথা সর্বজনীন ভোটাধিকার, মুদ্রণ, সংগঠন ও সমাবেশের স্বাধীনতা সমর্থন করত না। — সম্পাঃ

(শেষোক্তরা মনে হয় প্রুশীয় সরকারের সঙ্গে দহরম মহরমের অধিকারকে তাদের বিশেষ অধিকার করে রাখতে চায়।) তারা জানে প্রাশিয়ায় (এবং তজ্জন্য বাকী জার্মানিতেও) শ্রমিকদের পত্রপত্রিকা এবং শ্রমিকদের আন্দোলন কেবলমাত্র পুলিশের অনুমতিতে টিকে আছে। তাই, অবস্থাটা যা সেইভাবেই তারা তা নিতে চায়, সরকারকে বিরক্ত করা ইত্যাদি তারা চায় না, ঠিক আমাদের **'প্রজাতন্ত্রী'** বাস্তব রাজনীতিবিদদের মতোই, যারা একজন হয়েনৎসলার্ন **সম্রাটকে** মেনে নেয়। কিন্তু আমি 'বাস্তব রাজনীতিবিদ' নই, তাই এঙ্গেলসের সঙ্গে একযোগে আমি একটি প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে Social-Demokrat পত্রিকার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা প্রয়োজন মনে করেছি। (ঘোষণাটি আপনি শীঘ্রই কোনো না কোনো কাগজে দেখবেন।)

সঙ্গে সঙ্গে আপনি এটাও বুঝবেন কেন বর্তমান মুহূর্তে প্রাশিয়ায় আমি **কিছুই** করতে পারি না। প্রুশীয় নাগরিক হিসাবে আমাকে ফেরত নিতে সেখানকার সরকার সরাসরি অস্বীকার করেছেন। সেখানে আমাকে শুধু সেইভাবেই **আন্দোলন করতে** দেওয়া হবে, যাতে হের বিসমার্কের আপত্তি নেই।

এখানে বসে **আন্তর্জাতিক সমিতি*** মারফত আন্দোলন করাকে আমি শতাধিক গুণ বেশী পছন্দ করি। **ব্রিটিশ** প্রলেতারিয়েতের উপর এর প্রভাব হবে প্রত্যক্ষ এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এখন এখানে সাধারণ ভোটাধিকারের প্রশ্ন নিয়ে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছি, অবশ্য প্রাশিয়ায় এ প্রশ্নটির যে তাৎপর্য, এখানে তার **তাৎপর্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।**

এখানে, প্যারিসে, বেলজিয়মে, সুইজারল্যান্ডে এবং ইতালিতে মোটামুটিভাবে এই সমিতির অগ্রগতি আমাদের **সমস্ত প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেছে।** একমাত্র জার্মানিতেই আমরা লাসালের ওয়ারিসদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি। এ'রা: ১) নির্বোধের মতো নিজেদের প্রভাব হারাবার ভয়ে আতঙ্কিত; ২) জার্মানরা যাকে বলে 'বাস্তব রাজনীতি' তার প্রতি আমার ঘোষিত বিরোধিতা সম্পর্কে অবহিত। (এই ধরনের **'বাস্তবতার'** জন্যই জার্মানি সমস্ত সভ্য দেশের এত পেছনে পড়ে আছে।)

যেহেতু এক শিলিং দিয়ে কার্ড নিলেই সমিতির সভ্য হওয়া যায়, যেহেতু ফরাসীরা (বেলজিয়ানরাও) এই ধরনের ব্যক্তিগত সভ্যপদ পছন্দ করে, কারণ 'এসোসিয়েশন' হিসাবে আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় তাদের আইনে বাধা আছে; যেহেতু জার্মানির পরিস্থিতিও এর অনুরূপ — সেইহেতু আমি এখন স্থির করেছি, এখানে এবং জার্মানিতে আমার বন্ধুদের বলব যে, তারা যেখানেই থাকুক না কেন সেখানেই ছোট ছোট সোসাইটি গঠন করুক — সভ্য সংখ্যায় কিছু আসে যাবে না; প্রত্যেক সভ্য একখানি করে ইংলিশ

* এখানে প্রথম আন্তর্জাতিকের কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

সভ্য কার্ড নেবে। ইংলিশ সোসাইটি হচ্ছে **আইনী** সোসাইটি, তাই ফ্রান্সে পর্যন্ত এই পদ্ধতিতে কোনো বাধা নেই। যদি আপনি ও আপনার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা এইভাবে লণ্ডনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন তবে আনন্দিত হব ...

ল. কুগেলমান সমীপে মার্কস

লণ্ডন, ৯ই অক্টোবর, ১৮৬৬

... জেনেভায় প্রথম কংগ্রেস নিয়ে আমার ভীষণ ভয় ছিল, কিন্তু মোটামুটি, আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে ভালই হয়েছে।* ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় তার প্রতিক্রিয়া আশাতীত। আমি যেতে পারিনি এবং যেতে চাইনি, কিন্তু লণ্ডনের প্রতিনিধিদলের জন্য কর্মসূচি লিখে দিয়েছিলাম। ইচ্ছা করেই আমি কর্মসূচিটি সেই সব বিষয়েই সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম যাতে শ্রমিকদের আশু মতৈক্য এবং ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম সম্ভব হয় এবং যা শ্রেণী-সংগ্রামের এবং একটি শ্রেণীতে শ্রমিকদের সংগঠিত করার প্রয়োজনকে সরাসরি পুষ্ট করতে ও প্রেরণা দিতে পারে। প্রুধোঁপন্থীদের ফাঁকা বুলিতে প্যারিসের ভদ্রলোকদের মাথাগুলো ছিল ভর্তি। বিজ্ঞান নিয়ে তারা বকে খুব, কিন্তু কিছুই জানে না। সমস্ত **বৈপ্লবিক** কর্মকে, অর্থাৎ শ্রেণী-সংগ্রামসঞ্জাত কর্মকে, সমস্ত সংহত সামাজিক আন্দোলনকে তারা ঘৃণা করে, অতএব, যাকে **রাজনৈতিক** উপায়ে কার্যকরী করা চলে (যেমন **আইন করে** শ্রমদিনের ঘণ্টা কমানো) তাকেও তারা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে। **স্বাধীনতার অছিলায়** এবং শাসন-বিরোধিতা বা কর্তৃত্ব বিরোধী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অছিলায় এই যে ভদ্রলোকেরা যোলো বছর ধরে নিকৃষ্টতম স্বৈরাচার সহ্য করে এসেছেন, এখনো সহ্য করছেন, তাঁরা আসলে প্রচার করছেন সাধারণ বুর্জোয়া অর্থনীতিই, শুধু তাকে প্রুধোঁমাফিক আদর্শায়িত করে নেওয়া হয়েছে! প্রুধোঁ প্রচণ্ড ক্ষতি করেছেন। ইউটোপীয়দের সম্পর্কে তাঁর ভুয়া সমালোচনা ও ভুয়া বিরোধিতা (তিনি নিজে এক পেটি বুর্জোয়া ইউটোপীয় মাত্র, অথচ ফুরিয়ে, ওয়েন প্রমুখের ইউটোপিয়ায় নূতন জগতের একটা পূর্বাভাষ ও কাল্পনিক অভিব্যক্তি রয়েছে) প্রথমে 'ঝলমলে তরুণদের' ও ছাত্রদের আকৃষ্ট ও দুর্নীতিদুষ্ট করে এবং পরে আকৃষ্ট ও দুর্নীতিদুষ্ট করে শ্রমিকদের, বিশেষত প্যারিসের শ্রমিকদের, যারা বিলাসিতার পণ্যোৎপাদন শিল্পের শ্রমিক হিসাবে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই পুরাতন আবর্জনার প্রতি দারুণভাবে মোহগ্রস্ত। অজ্ঞ, অহঙ্কারী, দাম্ভিক,

* প্রথম আন্তর্জাতিকের জেনেভা কংগ্রেসে (সেপ্টেম্বর ৩—৮, ১৮৬৬) প্রুধোঁপন্থীদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। মার্কস লিখিত আন্তর্জাতিকের নিয়মাবলী কংগ্রেস অনুমোদন করে এবং মার্কসের নির্দেশপত্র হয় গৃহীত প্রস্তাবাবলীর ভিত্তি। — সম্পাঃ

বাচাল, ভুয়া ঔদ্ধত্যে ফাঁপা এই লোকগুলি সবকিছু প্রায় পয়মাল করে দিতে বসেছিল, কারণ তারা যে সংখ্যায় কংগ্রেসে এসেছিল, তাদের সভ্য সংখ্যার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। রিপোর্টে আমি ওদের নাম না করে একটু ঠুকব।

একই সময় বাল্টিমোরে অনুষ্ঠিত আমেরিকান শ্রমিক কংগ্রেসে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। সেখানকার স্লোগান ছিল পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সংগঠন, এবং খুবই আশ্চর্য যে, জেনেভার জন্য যে দাবিগুলি আমি তৈরি করেছিলাম তার অধিকাংশই সেখানেও উপস্থাপিত হয় শ্রমিকদের নির্ভুল সহজাত প্রবৃত্তির কল্যাণে।

আমাদের কেন্দ্রীয় পরিষদ-সৃষ্ট সংস্কার আন্দোলন* (যাতে আমিও একটা বড় অংশ গ্রহণ করেছিলাম) এখন বিরাট ও অদম্য আকার ধারণ করেছে। আমি বরাবরই নিজেকে পেছনে রেখেছি এবং এখন যখন ব্যাপারটা চালু হয়ে গেছে তখন এ নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছি না।

ল. কুগেলমান সমীপে মার্কস

লণ্ডন, ১১ই জুলাই, ১৮৬৮

...*Centralblatt* প্রসঙ্গে বলতে হয়, মূল্য বলতে যদি আদৌ কিছু বোঝা যায় তাহলে আমার সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করতেই হবে, একথা স্বীকার করে লেখকটি** কিন্তু সর্বাধিক সম্ভব নাতিস্বীকারই করেছে। বেচারা দেখতে পায়নি যে, আমার বই-এ 'মূল্য' সম্পর্কে কোনো অধ্যায় যদি নাও থাকত, তাহলেও প্রকৃত সম্পর্কগুলির যে বিশ্লেষণ আমি দিয়েছি তার ভিতরেই সত্যকার মূল্য-সম্পর্কের প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত পাওয়া যেত। আলোচিত বিষয়টি এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা থেকেই আসছে মূল্যের ধারণাটিকে প্রমাণ করার প্রয়োজন নিয়ে এত সব কথার কচকচি। প্রত্যেক শিশুই জানে যে, কোনো জাতি যদি, এক বছরের জন্য বলব না, কয়েক সপ্তাহের জন্যও কাজ করা বন্ধ রাখে, তাহলে সে জাতি অনাহারে মারা পড়ে। প্রত্যেক শিশু একথাও জানে যে, বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাবার মতো এক একটা উৎপন্নরাশির জন্য লাগে সমাজের মোট শ্রমের বিভিন্ন এবং পরিমাণগতভাবে নির্ধারিত এক একটা রাশি। এ তো স্বতঃসিদ্ধ যে, নির্দিষ্ট অনুপাতে সামাজিক শ্রম **বণ্টনের** এই **প্রয়োজনকে** সামাজিক উৎপাদনের

---

* ইংলণ্ডে ভোটাধিকার সংস্কারের আন্দোলন। ১৮৬৭ সালে সংস্কার প্রবর্তিত হলে আন্দোলন শেষ হয়। — সম্পাঃ

** লাইপজিগের *Literarisches Centralblatt* (কেন্দ্রীয় সাহিত্য পত্রিকা) পত্রিকার ১৮৬৮ সালের ২৮ নং সংখ্যায় প্রকাশিত 'পুঁজি' গ্রন্থের সমালোচনার কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

একটি **বিশেষ রূপের** দ্বারা দূর করা যায় না; বদল হতে পারে কেবল **তার প্রকাশের** রূপটা। কোনো প্রাকৃতিক নিয়মকে বাতিল করা যায় না। এই নিয়মগুলি যে রূপের মধ্যে কাজ করে, সেই **রূপটিই** শুধু ঐতিহাসিকভাবে বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত হতে পারে। অথচ যে সমাজে ব্যক্তিগত শ্রমোৎপন্নের **ব্যক্তিগত বিনিময়ের** মধ্যে দিয়ে সামাজিক শ্রমের অন্তঃসম্পর্ক অভিব্যক্ত হয়, সেই সামাজিক স্তরে শ্রমের আনুপাতিক বণ্টন কার্যকরী থাকে যে রূপের মধ্যে, সেটা হল ঠিক এই উৎপন্নগুলিরই **বিনিময়-মূল্য।**

মূল্যের নিয়ম **কী ভাবে** কাজ করে তাই বোঝানোই হল বিজ্ঞানের কাজ। অতএব, আপাতদৃষ্টিতে এই নিয়মের বিরোধী এমন সমস্ত ঘটনাকেই কেউ যদি একেবারে গোড়াতেই 'ব্যাখ্যা করতে' চায়, তাহলে তাকে বিজ্ঞানের **আগে** বিজ্ঞানকে উপস্থিত করতে হবে। রিকার্ডো ঠিক এই ভুলই করেছিলেন — মূল্য সম্পর্কিত তাঁর প্রথম অধ্যায়ে তিনি আমাদের কাছে তখনও সিদ্ধ নয় এমন সমস্ত সম্ভাব্য বর্গগুলিকে **আগেই ধরে নিয়ে** মূল্যের নিয়মের সঙ্গে তাদের সঙ্গতি প্রমাণের চেষ্টা করেছেন।

অপরদিকে ব্যাপারটি আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন, **তত্ত্বের ইতিহাস** থেকে সুনিশ্চিতভাবেই দেখা যায় যে, মূল্য-সম্পর্কের ধারণা বরাবরই একই রয়েছে যদিও কমবেশী স্পষ্ট, কমবেশী মোহবিজড়িত অথবা কমবেশী বৈজ্ঞানিকভাবে যথাযথ। যেহেতু চিন্তাপ্রক্রিয়া নিজেই কতকগুলি বিশেষ সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত এবং নিজেই একটি **প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া,** সেইহেতু সত্যকারের সার্থক চিন্তা সর্বদাই একই থাকবে এবং পরিবর্তিত হবে শুধু ক্রমে ক্রমে বিকাশের পরিপক্কতা অনুসারে, চিন্তা করার দেহাঙ্গটির বিকাশ সমেত। বাকী সবকিছুই অর্থহীন প্রলাপ।

স্থূল অর্থনীতিবিদদের এ সম্পর্কে ক্ষীণতম ধারণাও নেই যে, বাস্তব প্রাত্যহিক বিনিময়-সম্পর্কগুলি সরাসরি মূল্যের পরিমাণের **সঙ্গে সোজাসুজি এক** হতে পারে **না।** বুর্জোয়া সমাজের আসল ব্যাপারই হচ্ছে ঠিক এই যে, সেখানে আগে থেকে (a priori) উৎপাদনের কোনো সচেতন সামাজিক নিয়ন্ত্রণ নেই। যা যুক্তিসিদ্ধ এবং স্বাভাবিকভাবে আবশ্যিক তা শুধু অন্ধভাবে কার্যকর একটা গড় হিসাবেই নিজেকে জাহির করে। আর, স্থূল অর্থনীতিবিদ মনে করেন, তিনি মস্ত বড় আবিষ্কার করছেন, যখন আভ্যন্তরীণ অন্তঃসম্পর্ক উদ্ঘাটনের বিপরীতে গর্বভরে দাবি করেন যে দৃশ্যত ব্যাপার অন্যরূপ। আসলে তাঁর গর্বটা এই যে, তিনি দৃশ্য রূপকে আঁকড়ে থাকেন এবং তাকেই তিনি চরম বলে মনে করেন। তাহলে আদৌ বিজ্ঞানের দরকার কী?

কিন্তু বিষয়টির আর একটি পটভূমিকাও আছে। একবার যদি অন্তঃসম্পর্কটি বুঝতে পারা যায়, তাহলে বিদ্যমান অবস্থার চিরস্থায়ী প্রয়োজন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ধ্বসে পড়ার আগেই, তার সমস্ত তত্ত্বগত বিশ্বাস ধ্বসে পড়ে। তাই, এই চিন্তাহীন বিভ্রান্তিকে জীইয়ে রাখা হচ্ছে একান্তভাবেই শাসক-শ্রেণীর স্বার্থ। অর্থনীতিবিজ্ঞানে একেবারেই কোনো চিন্তা

করা উচিত নয়, এই কথা বলা ছাড়া আর যাদের হাতে কোনো বৈজ্ঞানিক তুরুপের তাস নেই, সেই সব চাটুকার বাচালদের পয়সা দিয়ে পোষার আর কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে ?

কিন্তু আর না, যথেষ্ট ('satis superque)। অন্তত এটুকু দেখা যাচ্ছে, বুর্জোয়াদের এই পুরোহিতরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছেন: শ্রমিকেরা, এমনকি শিল্পপতিরা ও ব্যবসায়ীরাও যখন আমার বই বুঝতে পারেন এবং অসুবিধা হয় না, তখন এই **'পণ্ডিত** কেরাণীরা'(!) অভিযোগ করছেন যে, আমি তাঁদের বোধশক্তির কাছে অত্যধিক দাবি করছি ...

ল. কুগেলমান সমীপে মার্ক্স

লণ্ডন, ১২ই এপ্রিল, ১৮৭১

... গতকাল আমরা সংবাদ পেলাম, লাফার্গ (লরা নয়) এখন প্যারিসে। সংবাদটি মোটেই সুস্থির হবার মতো নয়।

আমার 'আঠারোই ব্রুমেয়ারের' শেষ অধ্যায়ে দেখতে পাবে যে, আমি বলেছি, আর আগের মতো আমলাতান্ত্রিক সামরিক যন্ত্রটিকে এক হাত থেকে আর এক হাতে তুলে দেওয়া ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী প্রচেষ্টা হবে না, হবে ঐ যন্ত্রটিকে **চূর্ণ করা** এবং এই হচ্ছে মহাদেশে প্রত্যেক সত্যকার গণবিপ্লবের প্রাথমিক শর্ত। আর প্যারিসে আমাদের বীর পার্টি কমরেডরা ঠিক এরই চেষ্টা করছেন। এই প্যারিসবাসীদের কী স্থিতিস্থাপকতা, কী ঐতিহাসিক উদ্যোগ, কী স্বার্থত্যাগেব ক্ষমতা! বহিঃশত্রুর চেয়েও বরং আভ্যন্তরীণ বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই সংঘটিত ছয়মাসব্যাপী অনাহার ও ধ্বংসের পর প্রুশীয় সঙ্গীনের তলায় তাঁরা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন, যেন ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে কখনও যুদ্ধই হয়নি এবং শত্রু যেন প্যারিসের প্রবেশ দ্বারে আর বসে নেই! ইতিহাসে অনুরূপ মহত্বের দৃষ্টান্ত আর নেই! যদি তাঁরা পরাজিত হন, তবে দোষ শুধু তাঁদের 'উদার স্বভাবের'। প্রথমে ভিনয় এবং পরে প্যারিস জাতীয় রক্ষিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীল অংশটা পিছু হটে যাবার পরই তাঁদের উচিত ছিল সঙ্গে সঙ্গে অভিযান চালিয়ে ভার্সাইয়ে আসা। বিবেকের দ্বিধার জন্যই তাঁরা সুযোগ হারালেন। তাঁরা **গৃহযুদ্ধ শুরু করতে** চাননি, যেন প্যারিসকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করে পাপিষ্ঠ গর্ভস্রাব তিয়েরের আগেই গৃহযুদ্ধ শুরু করে দেননি! দ্বিতীয় ভুল: কমিউনকে পথ ছেড়ে দেবার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি খুব তাড়াতাড়ি তাঁদের ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছিলেন। এটাও সেই অতিরিক্ত রকমের সততার কুণ্ঠা থেকে! সে যাই হোক না কেন, পুরানো সমাজের নেকড়ে, শুয়োর ও কুত্তাগুলো যদি প্যারিসের এই বর্তমান অভ্যুত্থানকে চূর্ণ করে দেয়ও, তবুও জুন অভ্যুত্থানের পর

এই অভ্যুত্থানই হল আমাদের পার্টির সবচেয়ে গৌরবময় কাজ। স্বর্গাভিযানী এই প্যারিসবাসীদের তুলনা করুন সেই জার্মান-প্রুশীয় পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের দাসদের সঙ্গে, যে সাম্রাজ্যের মান্ধাতার আমলের ছদ্মবেশনৃত্য ভরে উঠেছে ফৌজী ব্যারাক, গির্জা, য়ুঙ্কারতন্ত্র এবং সর্বোপরি কূপমণ্ডূকতার দুর্গন্ধে।

প্রসঙ্গত একটা কথা বলি। লুই বোনাপার্টের কোষাগার থেকে প্রত্যক্ষ সাহায্যপ্রাপ্তদের নামের যে তালিকা **সরকারীভাবে প্রকাশিত** হয়েছে তাতে লেখা আছে ১৮৫৯ সালের আগস্ট মাসে **ফগ্‌ত** ৪০,০০০ ফ্রাঁ পেয়েছেন! পরে ব্যবহারের জন্য তথ্যটা আমি লিবক্লেখতকে জানিয়েছি।

তুমি আমাকে হাকস্তহাউজেন পাঠাতে পারো, কারণ সম্প্রতি আমি শুধু জার্মানি থেকে নয়, এমনকি সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকেও অক্ষত অবস্থায় নানাধরনের পুস্তিকাদি পাচ্ছি।

যেসব সংবাদপত্র পাঠিয়েছ তজ্জন্য ধন্যবাদ (অনুগ্রহ করে আরো পাঠাবে, কারণ জার্মানি, রাইখস্টাগ ইত্যাদি সম্পর্কে আমি কিছু লিখতে চাই) ...

ল. কুগেলমান সমীপে মার্ক্স

লণ্ডন, ১৭ই এপ্রিল, ১৮৭১

তোমার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি। ঠিক এই মুহূর্তে আমার হাতভর্তি কাজ। তাই, মাত্র দুয়েক কথা লিখব। তুমি কেমন করে ১৮৪৯-এর* ১৩ই জুনের পেটি বুর্জোয়া মিছিল ইত্যাদির সঙ্গে প্যারিসের বর্তমান সংগ্রামের তুলনা করতে পারো তা মোটেই বোধগম্য নয়!

শুধু অব্যর্থ অনুকূল সুযোগের শর্তেই যদি সংগ্রাম শুরু করা যেত, তাহলে তো দুনিয়ার ইতিহাস সৃষ্টি করা সত্যই খুব সোজা হয়ে যেত। ওদিকে আবার 'আকস্মিকতার' যদি কোনো ভূমিকা না থাকত তাহলে ইতিহাস অত্যন্ত অতীন্দ্রীয় প্রকৃতির হয়ে উঠত। এই আকস্মিকতা স্বভাবতই সাধারণ বিকাশধারারই অংশ এবং অন্যান্য আকস্মিক ঘটনা দিয়ে তাদের পরিপূরণ হয়ে যায়। কিন্তু বিকাশধারার ত্বরান্বয়ণ অথবা বিলম্বন খুব বেশী পরিমাণে নির্ভর করে এই ধরনের 'আকস্মিকতার' উপর। যাঁরা গোড়াতেই আন্দোলন পরিচালনা করেন তাঁদের চরিত্রও এই 'আকস্মিকতার' অন্তর্ভুক্ত।

---

* ১৮ পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

এবারের স্পষ্টতই প্রতিকূল 'আকস্মিকতাটা' কিন্তু কোনোক্রমেই ফরাসী সমাজের সাধারণ অবস্থার মধ্যে নয়, ফ্রান্সে প্রুশীয়দের উপস্থিতি এবং প্যারিসের ঠিক সম্মুখেই তাদের অবস্থানের মধ্যে। প্যারিসবাসীরা একথা ভালভাবেই জানত। ভার্সাইয়ের বুর্জোয়া ইতরগুলিও সেকথা ভালভাবেই জানত। ঠিক সেইজন্যেই তারা প্যারিসবাসীদের সম্মুখে হয় লড়াই অথবা বিনা লড়াইয়ে আত্মসমর্পণ এই গত্যন্তরই খোলা রেখেছিল। শেষোক্ত ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর যে হতাশা আসত তা যে-কোনো সংখ্যক 'নেতার' মৃত্যুর চেয়ে অনেক বেশী দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হত। প্যারিস কমিউনের কল্যাণে পুঁজিপতি শ্রেণী ও তার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম এক নূতন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। এর আশু পরিণাম যাই হোক না কেন, বিশ্ব ঐতিহাসিক গুরুত্বের একটা নতুন যাত্রা-বিন্দু লাভ করা গেছে।

ফ. বল্‌তে সমীপে মার্কস

লণ্ডন, ২৩শে নভেম্বর, ১৮৭১

...সোশ্যালিস্ট বা আধা-সোশ্যালিস্ট গোষ্ঠীগুলির স্থলে সংগ্রামের জন্য শ্রমিক শ্রেণীর একটি সত্যকার সংগঠন গড়াই ছিল **আন্তর্জাতিক** প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। আদি নিয়মাবলী ও উদ্বোধনী ভাষণের দিকে একবার তাকালেই একথা বোঝা যায়। ওদিকে আবার, যদি ইতিহাসের গতিপথ ইতিমধ্যেই গোষ্ঠীবাদের চূর্ণ করে না দিত, তাহলে আন্তর্জাতিক নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারত না। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীবাদ আর সত্যকার শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশ চলে সর্বদাই পরস্পরের বিপরীত অনুপাতে। যতদিন শ্রমিক শ্রেণী স্বাধীন ঐতিহাসিক আন্দোলনের উপযোগী পরিপক্বতা লাভ না করে, ততদিন পর্যন্ত গোষ্ঠীগুলির অস্তিত্বের (ঐতিহাসিকভাবে) সার্থকতা থাকে। এই পরিপক্বতা এলেই, সমস্ত গোষ্ঠীই মূলত প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে। কিন্তু ইতিহাসে সর্বত্র যা ঘটেছে, আন্তর্জাতিকের ইতিহাসের বেলাতেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটল। অচল চায় নবার্জিত রূপের মধ্যে নিজের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব।

শ্রমিক শ্রেণীর সত্যকার আন্দোলনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিকেরই মধ্যে যেসব গোষ্ঠী ও অপেশাদারী পরীক্ষা-নিরীক্ষাকারীর দল নিজেদের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে **সাধারণ পরিষদের অবিশ্রাম সংগ্রামের** ইতিহাসই হচ্ছে আন্তর্জাতিকের ইতিহাস। এই সংগ্রাম চলেছিল **কংগ্রেসগুলিতে,** কিন্তু অনেকবেশী সংগ্রাম চলেছিল বিভিন্ন শাখার সঙ্গে সাধারণ পরিষদের পৃথক পৃথক বৈঠকের মাধ্যমে।

প্যারিসে প্রুধোঁপন্থীরা (মিউচুয়ালিস্ট*) সমিতির সহ-প্রতিষ্ঠাতা ছিল বলে স্বভাবতই সেখানে প্রথম কয়েক বছর লাগামটা তাদের হাতেই ছিল। পরে অবশ্য সেখানে তাদের বিরুদ্ধে যৌথবাদী, পজিটিভিস্ট ইত্যাদি গোষ্ঠী গঠিত হয়।

জার্মানিতে ছিল লাসালপন্থীদের চক্র। কুখ্যাত শ্‌ভাইৎসারের সঙ্গে আমি নিজে দু বছর ধরে পত্রালাপ চালিয়েছিলাম এবং তাঁর কাছে তর্কাতীতভাবে প্রমাণ করেছিলাম যে, লাসালীয় সংগঠন গোষ্ঠীগত সংগঠন ছাড়া কিছুই নয়, এবং সেইজন্যই আন্তর্জাতিক যে **প্রকৃত** শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে, তা এই সংগঠনের প্রতিকূল। না বোঝার মতো বিশেষ 'কারণ' তাঁর ছিল।

আন্তর্জাতিকের অভ্যন্তরে **নিজেকে নেতা করে Alliance de la Démocratie Sociale** নামে একটি **দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক** গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৬৮ সালের শেষভাগে রুশদেশবাসী বাকুনিন **আন্তর্জাতিকে** যোগ দেন। সর্বপ্রকারের তাত্ত্বিক জ্ঞান বিবর্জিত এই ব্যক্তিটি দাবি করেন যে, এই পৃথক সংস্থাটিই নাকি আন্তর্জাতিকের **বৈজ্ঞানিক** প্রচারের প্রতিনিধি এবং এইটেই হচ্ছে নাকি **আন্তর্জাতিকের অভ্যন্তরে** এই দ্বিতীয় **আন্তর্জাতিকের** বৈশিষ্ট্য।

তাঁর কর্মসূচিটি হচ্ছে যথেচ্ছ যোগাড় করা ভাসা ভাসা এক খিচুড়ি— **শ্রেণীসমূহের সাম্য** (!), সামাজিক আন্দোলনের **সূচনাবিন্দু** হিসাবে **উত্তরাধিকার লাভের অধিকারের** বিলোপসাধন (সাঁ-সিমোঁ মার্কা গাঁজাখোরি), **আপ্তবাক্য** হিসাবে আন্তর্জাতিকের সভ্যদের অবশ্য গ্রহণীয় **নিরীশ্বরবাদ** ইত্যাদি, এবং প্রধান আপ্তবাক্য হিসাবে **(প্রুধোঁপন্থীদের মতো) — রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে বিরত থাকা।**

এই ছেলেভোলানো আষাঢ়ে গল্পটা সমর্থন পেয়েছিল (এবং এখনো কিছুটা সমর্থন পাচ্ছে) ইতালিতে এবং স্পেনে, যেখানে শ্রমিক আন্দোলনের বাস্তব পূর্বশর্ত খুব অল্পই বিকশিত, এবং ল্যাতিন সুইজারল্যান্ড ও বেলজিয়মের মুষ্টিমেয় দাম্ভিক, উচ্চাভিলাষী ও অন্তঃসারশূন্য মতবাগীশদের মধ্যে।

বাকুনিনের কাছে তাঁর মতবাদটা (প্রুধোঁ, সাঁ-সিমোঁ প্রমুখের কাছ থেকে সংগ্রহ করা আবর্জনা) আগেও এবং এখনও একটি গৌণ ব্যাপার, তাঁর ব্যক্তিগত আত্মপ্রতিষ্ঠার একটা উপায় মাত্র। তাত্ত্বিক হিসাবে কিছু-না হলেও কুচক্রী হিসাবেই কিন্তু তিনি ওস্তাদ।

সাধারণ পরিষদকে কয়েকবছর ধরে লড়াই চালাতে হয়েছে এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে (এই ষড়যন্ত্রকে ফরাসী প্রুধোঁপন্থীরা, বিশেষ করে **ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলে,** কিছুটা পর্যন্ত

* প্রুধোঁপন্থীরা নিজেদের 'মিউচুয়ালিস্ট' বলত, কারণ তারা 'mutuel' বা 'পারস্পরিক' সাহায্যের স্লোগান দিয়েছিল। — সম্পাঃ

সমর্থন করেছিল)। অবশেষে, সম্মেলনের ১, ২ এবং ৩, নবম, ষোড়শ ও সপ্তদশ* প্রস্তাবের সাহায্যে পরিষদ তার দীর্ঘ-প্রস্তুত আঘাত হানল।

স্পষ্টতই সাধারণ পরিষদ ইউরোপে যার বিরুদ্ধে লড়েছে আমেরিকায় তাকে সমর্থন করবে না। ১, ২, ৩ এবং নবম প্রস্তাব এখন নিউ ইয়র্ক কমিটির হাতে এমন একটা বৈধ হাতিয়ার তুলে দিল যার সাহায্যে সে সমস্ত গোষ্ঠীবাদ ও সৌখীন উপদলের অবসান ঘটাতে পারবে এবং প্রয়োজন হলে তাদের বহিষ্কৃত করতে পারবে ...

... শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলনের চরম লক্ষ্য, অবশ্য, শ্রমিক শ্রেণীর জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় এবং তার জন্য স্বভাবতই প্রয়োজন শ্রমিক শ্রেণীর এমন একটি প্রাথমিক সংগঠন যা তার অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত হয়ে কিছুটা পর্যন্ত বিকশিত হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে অবশ্য, যে আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণী শাসক-শ্রেণীসমূহের বিরুদ্ধে **শ্রেণী** হিসাবে এগিয়ে আসে এবং 'বাইরে থেকে চাপ সৃষ্টির' দ্বারা তাদের বাধ্য করার চেষ্টা করে এমন প্রত্যেকটি আন্দোলনই রাজনৈতিক আন্দোলন। যেমন, কোনো একটি বিশেষ কারখানায়, এমনকি কোনো একটি বিশেষ শিল্পে ধর্মঘট ইত্যাদির দ্বারা ব্যক্তিগত পুঁজিপতিদের কাজের ঘণ্টা কমাতে বাধ্য করার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক আন্দোলন। কিন্তু, দিনে আটঘণ্টা কাজ ইত্যাদির **আইন** প্রণয়নে বাধ্য করার আন্দোলন **রাজনৈতিক** আন্দোলন। এইভাবে, শ্রমিকদের পৃথক পৃথক অর্থনৈতিক আন্দোলনের মধ্য থেকে সর্বত্র গড়ে ওঠে **রাজনৈতিক** আন্দোলন, অর্থাৎ **শ্রেণীর** আন্দোলন যার উদ্দেশ্য হল সাধারণরূপে অর্থাৎ সমগ্রভাবে সমাজের পক্ষে বাধ্যতামূলক আকারে সে শ্রেণীর স্বার্থসাধন। এই আন্দোলনগুলির জন্য যদি আগে থেকেই কিছুটা পরিমাণ সংগঠন থাকার প্রয়োজন থাকে, তাহলে এই আন্দোলনগুলিও আবার একইভাবে এই সংগঠনকে বিকশিত করে তোলার উপায়ও বটে।

যৌথশক্তির অর্থাৎ শাসক-শ্রেণীর রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে কোনো চূড়ান্ত অভিযানে নামার মতো যথেষ্ট অগ্রসর সংগঠন যদি শ্রমিক শ্রেণীর না থাকে তাহলে শাসক-শ্রেণীগুলির শক্তির বিরুদ্ধে অবিরাম আন্দোলন চালিয়ে এবং এই শ্রেণীগুলির নীতির প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব অবলম্বন করে শ্রমিক শ্রেণীকে অন্তত সেজন্য শিক্ষিত করে তুলতে হবে। নতুবা, শ্রমিক শ্রেণী তাদের হাতের পুতুল হয়ে থাকবে, যেমনটি

* এখানে মার্কস যে প্রস্তাবগুলির কথা বলছেন তা প্রথম আন্তর্জাতিকের লন্ডন সম্মেলনে (সেপ্টেম্বর, ১৮৭১) গৃহীত হয়েছিল। প্রস্তাবগুলি ছিল এই সম্পর্কে — আন্তর্জাতিকের সংহতিসাধন, কেন্দ্রিকতাকে এবং সাধারণ পরিষদের নেতৃ-ভূমিকাকে শক্তিশালী করা; প্রলেতারিয়েতের একটি স্বাধীন রাজনৈতিক পার্টির এবং অর্থনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে রাজনৈতিক সংগ্রামের অচ্ছেদ্য সম্মেলনের আবশ্যকতা; বাকুনিনপন্থী উপদলীয় চক্রের বিলোপসাধন। — সম্পাঃ

দেখা গিয়েছিল ফ্রান্সের সেপ্টেম্বর বিপ্লবে* এবং যেমনটি কিছুটা পরিমাণে প্রমাণিত হয়েছে ইংলণ্ডে শ্রীযুক্ত গ্ল্যাডস্টোন কোম্পানি আজো পর্যন্ত সফলভাবে যে খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন তা থেকে।

ত. কুনো সমীপে এঙ্গেলস

লণ্ডন, ২৪শে জানুয়ারি, ১৮৭২

... ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত বাকুনিন আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন এবং বার্ন শান্তি কংগ্রেসে** ফেঁসে যাবার পর আন্তর্জাতিকে যোগদান করেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি **তার অভ্যন্তরে** সাধারণ পরিষদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে আরম্ভ করেন। প্রুধোঁবাদ ও কমিউনিজমের খিচুড়ি পাকিয়ে বাকুনিনের নিজস্ব এক অদ্ভুত তত্ত্ব আছে, যার মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, তিনি মনে করেন যে-প্রধান অভিশাপটাকে উচ্ছেদ করতে হবে তা পুঁজি এবং সেইহেতু সমাজ বিকাশের ফলে উদ্ভূত পুঁজিপতিদের ও মজুরি-শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী-বিরোধ নয়, তা হচ্ছে **রাষ্ট্র**। ব্যাপক সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক মজুরেরা যে ক্ষেত্রে আমাদের মতো এই মতই পোষণ করেন যে, নিজেদের সামাজিক বিশেষ সুবিধাগুলি রক্ষার উদ্দেশ্যে শাসক-শ্রেণীসমূহের, জমিদারদের ও পুঁজিপতিদের, হাতের সংগঠন ছাড়া রাষ্ট্রশক্তি আর কিছুই নয়, সে ক্ষেত্রে বাকুনিনের মত হচ্ছে এই যে, **রাষ্ট্রই** পুঁজি সৃষ্টি করেছে এবং পুঁজিপতিরা পুঁজি পেয়েছে **রাষ্ট্রেরই কৃপায়**। অতএব রাষ্ট্রই হচ্ছে প্রধান অভিশাপ, তাই সর্বোপরি রাষ্ট্রকেই উচ্ছেদ করতে হবে, তাহলে পুঁজি আপনা থেকেই ধ্বংস হয়ে যাবে। ওদিকে আমরা বলি: পুঁজিকে শেষ করো, মুষ্টিমেয়ের হাতে উৎপাদনের সমস্ত উপকরণের কেন্দ্রীকরণ শেষ করো, তাহলে রাষ্ট্রের পতন হবে আপনা থেকেই। পার্থক্যটি মৌলিক: আগে একটা সমাজবিপ্লব ছাড়া রাষ্ট্রের উচ্ছেদ অর্থহীন প্রলাপ; পুঁজির উচ্ছেদই **হচ্ছে** সমাজবিপ্লব এবং এর ফলে সমস্ত উৎপাদন-পদ্ধতিরই পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু বাকুনিনের কাছে যেহেতু রাষ্ট্রই হচ্ছে প্রধান অভিশাপ তাই রাষ্ট্রের, — সে প্রজাতন্ত্রই হোক, রাজতন্ত্রই হোক বা অন্য যাকিছু হোক, — যে-কোনো রাষ্ট্রেরই অস্তিত্ব বজায় রাখে এমন কিছুই করা চলবে না। অতএব, **সমস্ত রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ বিরতি**। কোনো রাজনৈতিক কাজ করা, বিশেষত নির্বাচনে

---

* ১৮৭০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বরের প্যারিসে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে, এ বিপ্লবে দ্বিতীয় সাম্রাজ্য লোপ করে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্রের (তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের) গোড়া পত্তন করা হয়। -- সম্পাঃ

** বুর্জোয়া শান্তি ও স্বাধীনতা লীগে ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত বাকুনিন একজন নেতা ছিলেন, এই লীগের বার্ন কংগ্রেসের কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

অংশ গ্রহণ করা হবে নীতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। কর্তব্য হল প্রচার চালানো, রাষ্ট্রকে এলোপাতাড়ি গালাগালি দিয়ে যাওয়া, সংগঠিত করা এবং **যখন সমস্ত** শ্রমিক পক্ষে এসে গেছে অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠকে টানা হয়ে গেছে, তখন ভেঙে দাও সমস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানকে, উচ্ছেদ করো রাষ্ট্রকে এবং তার জায়গায় বসাও আন্তর্জাতিকের সংগঠনকে। স্বর্ণযুগের সূচনাকারী এই মহাকীর্তিটিকে বলা হয়েছে **সামাজিক বিলোপ।**

এসব কিছুই অত্যন্ত র‍্যাডিকেল শোনায় এবং এতই সহজ যে, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মুখস্থ হয়ে যায়। এইজন্যই বাকুনিনের তত্ত্ব এত দ্রুত ইতালি ও স্পেনের তরুণ আইনজীবী, ডাক্তার ও অন্যান্য মতবাগীশদের মধ্যে সাড়া পেয়েছে। কিন্তু শ্রমিকেরা কখনও নিজেদের এ কথায় ভোলাতে দেবে না যে, তাদের দেশের সামাজিক ব্যাপারটা তাদেরও ব্যাপার নয়। শ্রমিকেরা প্রকৃতিগতভাবেই **রাজনৈতিক** এবং যে তাদের বুঝানোর চেষ্টা করবে যে, রাজনীতি তাদের পরিত্যাগ করা উচিত, তাকেই তারা শেষে পরিত্যাগ করবে। শ্রমিকদের সর্ব অবস্থাতেই রাজনীতি থেকে বিরত থাকা উচিত, শ্রমিকদের কাছে এই কথা প্রচার করার অর্থ পুরুতপাণ্ডাদের বা বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের কবলে তাদের ঠেলে দেওয়া।

বাকুনিনের মত অনুসারে যেহেতু রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্য আন্তর্জাতিক গঠিত হয়নি, গঠিত হয়েছে যাতে সামাজিক বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন রাষ্ট্র সংগঠনের স্থান নিতে পারে, তাই তাকে ভবিষ্যৎ সমাজের বাকুনিনবাদী আদর্শের যথাসম্ভব কাছাকাছি আসতে হবে। এই সমাজে সর্বোপরি কোনো **কর্তৃত্ব** থাকবে না, কারণ কর্তৃত্ব=রাষ্ট্র=পরম অভিশাপ। (একটি নির্ধারক ইচ্ছা ছাড়া, একটি একক ব্যবস্থাপনা ছাড়া একটা কারখানা কি রেল কিম্বা একটি জাহাজ কী ভাবে চালানো যাবে তা' অবশ্য এ'রা জানাননি।) সংখ্যালঘিষ্ঠের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের কর্তৃত্বও আর থাকবে না। প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক গোষ্ঠী হবে স্বায়ত্তশাসক, কিন্তু প্রত্যেকে যদি নিজের স্বায়ত্তশাসনাধিকার কিছুটা ছেড়ে না দেয়, তাহলে সমাজ, এমনকি মাত্র দুজন মানুষেরও সমাজ কী করে সম্ভব, সে সম্পর্কেও বাকুনিন পুনরপি নীরব।

অতএব, এই আন্তর্জাতিককেও এই আদর্শ অনুসারে গঠিত করে নিতে হবে। তার প্রত্যেক শাখা এবং প্রত্যেক শাখায় প্রত্যেক ব্যক্তি হবে স্বায়ত্তশাসক। দূর হোক **বাসলে-প্রস্তাবাবলী***, সাধারণ পরিষদকে তা এমন এক অনিষ্টকর কর্তৃত্ব অর্পণ করেছে, যেটা তার নিজের পক্ষেই হীনতাসূচক! যদি এই কর্তৃত্ব **স্বেচ্ছামূলকভাবেও** অর্পিত হয়ে থাকে, তথাপি এর অবসান ঘটাতেই হবে **এই কারণে** যে, সেটা কর্তৃত্ব!

---

* ১৮৬৯ সালের ৬—১২ই সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিকের বাসল কংগ্রেসের প্রস্তাবাবলীর কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

সংক্ষেপে এই হল বুজরুকিটার আসল কথা। কিন্তু, বাসলে-প্রস্তাবাবলীর উদ্ভাবক কারা? **স্বয়ং শ্রী বাকুনিন** এবং তাঁর দলবল!

বাসলে কংগ্রেসে যখন এই ভদ্রলোকেরা দেখতে পেলেন যে, সাধারণ পরিষদকে জেনেভায় সরিয়ে নিয়ে যাবার অর্থাৎ পরিষদকে নিজেদের হাতে আনবার পরিকল্পনাটিকে গৃহীত করাতে তাঁরা পারবেন না, তখন তাঁরা এক ভিন্ন পথ ধরলেন। মহান আন্তর্জাতিকের **অভ্যন্তরেই** তাঁরা Alliance de la Démocratie Sociale নামে এক আন্তর্জাতিক সমিতি স্থাপন করলেন যে অজুহাতে, সেটা বাকুনিনপন্থী ইতালীয় পত্রপত্রিকায়, যেমন *Proletario* ও *Gazzettino Rosa* পত্রিকায় আজকাল ফের দেখা যাচ্ছে: বলা হচ্ছে শীতল ও মন্থরগতি উত্তরের অধিবাসীদের চেয়ে নাকি মাথাগরম ল্যাতিন জাতিদের জন্য আরও উজ্জ্বল কর্মসূচির প্রয়োজন। সাধারণ পরিষদের বাধার ফলে এই খাসা পরিকল্পনাটি নস্যাৎ হয়ে যায়। আন্তর্জাতিকের **ভেতর** একটি স্বতন্ত্র **আন্তর্জাতিক** সংগঠনের অস্তিত্ব সাধারণ পরিষদ অবশ্যই বরদাস্ত করতে পারেন না। তারপর থেকে বাকুনিন ও তাঁর অনুগামীদের আন্তর্জাতিকের কর্মসূচির পরিবর্তে বাকুনিনের কর্মসূচিকে প্রতিষ্ঠা করার গোপন চেষ্টার জন্য নানাভাবে ও নানারূপে এই পরিকল্পনা পুনরাবির্ভূত হয়েছে। ওদিকে আবার আন্তর্জাতিককে আক্রমণ করার প্রয়োজন হলে জুল ফাভ্র ও বিসমার্ক থেকে শুরু করে মাৎসিনি পর্যন্ত সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলরাই বরাবর বাকুনিনপন্থীদের ঠিক এই শূন্যগর্ভ বাগাড়ম্বরের বিরুদ্ধেই কামান তাগ করেছেন। তাই মাৎসিনি ও বাকুনিনের বিরুদ্ধে ৫ই ডিসেম্বরের বিবৃতিটির প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। বিবৃতিটি *Gazzettino Rosa*-ও প্রকাশিত করেছিল।

বাকুনিন দঙ্গলের কেন্দ্র হচ্ছে কয়েক দশক জুরাবাসী* যাদের মোট অনুগামীর সংখ্যা বড় জোর দু-শো মজুর হতে পারে। ইতালির তরুণ আইনজীবী, ডাক্তার ও সাংবাদিকদের নিয়েই এদের অগ্রগামী অংশ গঠিত। এরা সর্বত্রই নিজেদের ইতালীয় শ্রমিকদের মুখপাত্র বলে চালায়। এদের কিছু আছে বার্সেলোনায় ও মাদ্রিদে এবং লিয়োঁ ও ব্রাসেলসে এদের দু একজনের সাক্ষাৎ মিলবে, কিন্তু তারা প্রায় কেউ শ্রমিক নয়। আমাদের এখানেও এদের একটিমাত্র নমুনা আছে, রবিন।

কংগ্রেস অসম্ভব হয়ে পড়াতে তার পরিবর্তে পরিস্থিতির চাপে সম্মেলন** আহ্বান করতে হয়েছিল বলে এদের একটা অছিলা জুটে যায়। সুইজারল্যান্ডের ফরাসী দেশান্তরীদের অধিকাংশই এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, কেননা তাদের মধ্যে এরা (প্রুধোঁপন্থীরা) আত্মীয়ের সন্ধান পায় এবং ব্যক্তিগত কারণও ছিল। তাই তারা আক্রমণ

* সুইজারল্যান্ডে জুরা পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা। — সম্পাঃ

** ১৮৭১ সালের ১৭—২৩শে সেপ্টেম্বরের প্রথম আন্তর্জাতিকের লণ্ডন সম্মেলনের কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

শুরু করেছিল। অবশ্য আন্তর্জাতিকের মধ্যে সর্বত্রই অসন্তুষ্ট সংখ্যালঘুদের ও অস্বীকৃত প্রতিভাধরদের সাক্ষাৎ মেলে, ভরসা রাখা হয়েছিল এদেরই ওপর এবং সেটা অকারণে নয়। বর্তমানে তাদের সংগ্রামী শক্তি হচ্ছে এরূপ:

১। বাকুনিন নিজে — এই অভিযানের নেপোলিয়ন।

২। ২০০ জন জুরাবাসী এবং ফরাসী শাখাগুলোর (জেনেভায় দেশান্তরী) ৪০—৫০ জন।

৩। ব্রাসেলসে *Liberté*-র সম্পাদক হিন্স, ইনি অবশ্য **প্রকাশ্যে** তাদের সমর্থন করেন **না**।

৪। এখানে '১৮৭১ সালের ফরাসী শাখার' অবশিষ্ট, এদের আমরা কখনো স্বীকার করে নিইনি এবং তারা ইতিমধ্যেই পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। তারপর আছে হের ফন শ্‌ভাইৎসারের ধরনের ২০ জন লাসালপন্থী, যাদের সকলকেই জার্মান শাখা থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে (**আন্তর্জাতিক থেকে** একযোগে **বেরিয়ে আসার** প্রস্তাব করেছিল বলে) এবং যারা চরম কেন্দ্রীকরণ ও কঠোর সংগঠনের প্রবক্তা হিসাবে নৈরাজ্যবাদী ও স্বায়ত্তশাসনবাদীদের লীগের সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খেয়ে যায়;

৫। স্পেনে বাকুনিনের কিছু ব্যক্তিগত বন্ধু ও অনুগামী, শ্রমিকদের উপর, বিশেষত বার্সেলোনার শ্রমিকদের উপর যাদের প্রবল প্রভাব আছে অন্তত তত্ত্বগতভাবে। স্পেনীয়রা অবশ্য সংগঠন সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহী এবং অন্যদের ভেতর সংগঠনের অভাবটা চট করে তাদের চোখে পড়ে। এখানে বাকুনিন কতখানি সাফল্যের আশা করতে পারেন তা এপ্রিল মাসের স্প্যানিশ কংগ্রেস না হওয়া পর্যন্ত বুঝা যাবে না এবং যেহেতু শ্রমিকরাই সেখানে প্রাধান্য লাভ করবে, সেইহেতু আমি কোনো দুশ্চিন্তার কারণ দেখি না।

৬। সর্বশেষে, যতদূর জানি ইতালিতে তুরিন, বোলোন ও জিরগেন্তি শাখা **নির্দিষ্ট সময়ের আগেই** কংগ্রেস আহ্বান করার পক্ষে অভিমত ঘোষণা করেছে। বাকুনিনপন্থী পত্রপত্রিকায় দাবি করা হয়েছে যে, ২০টি ইতালীয় শাখা তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, আমি তাদের জানি না। অন্তত প্রায় সর্বত্রই নেতৃত্ব বাকুনিনের বন্ধুদের ও অনুগামীদের হাতে এবং তারা খুব হৈচৈ শুরু করেছে। কিন্তু একটু ভালভাবে খুঁটিয়ে দেখলে খুব সম্ভব দেখা যাবে, এদের অনুগামীদের সংখ্যা খুব বেশী নয়, কারণ শেষপর্যন্ত ইতালীয় শ্রমিকদের অধিকাংশটা এখনো মাৎসিনির পক্ষপাতী এবং যতদিন রাজনীতি থেকে বিরত থাকার সঙ্গে সেখানে আন্তর্জাতিককে এক করে দেখা হবে ততদিন তাই থাকবে।

যেভাবেই হোক, ইতালিতে আপাতত বাকুনিনপন্থীরাই আন্তর্জাতিকের কর্তা। এ নিয়ে অভিযোগ করার বাসনা সাধারণ পরিষদের নেই; নিজেদের খেয়াল অনুসারে যতখুসি আজগুবি কাণ্ড করার অধিকার ইতালীয়দের আছে, সাধারণ পরিষদ তার

প্রতিবন্ধকতা করবে শুধু শান্তিপূর্ণ বিতর্ক মারফত। জুরাবাসীরা যে অর্থে কংগ্রেসের কথা বলছে, সেই অর্থে কংগ্রেস দাবি করার অধিকার এদের আছে বটে, কিন্তু আন্তর্জাতিকের যেসব শাখা সবেমাত্র যোগ দিয়েছে এবং কোনো বিষয়ে কোনো খবর পায়নি, তারাও এই ধরনের একটি ব্যাপারে সঙ্গে সঙ্গেই, বিশেষ করে বিবদমান দুই পক্ষের বক্তব্য না শুনেই, পক্ষ অবলম্বন করে বসছে, সেটা অন্তত খুবই তাজ্জব। এ ব্যাপারে আমার সাদামাটা অভিমত আমি তুরিনের লোকদের বলে দিয়েছি এবং আর যেসব শাখা অনুরূপ মতপ্রকাশ করেছে তাদেরও বলব। কারণ, সার্কুলারে সাধারণ পরিষদের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা ও দুরভিসন্ধিপ্রসূত অভিযোগ করা হয়েছে, এই ধরনের প্রতিটি ঘোষণা পরোক্ষে তারই অনুমোদন। প্রসঙ্গত, সাধারণ পরিষদ এ বিষয় সম্পর্কে শীঘ্রই তাদের নিজস্ব সার্কুলার প্রচার করবেন। এই সার্কুলার **প্রচারিত না হওয়া পর্যন্ত** মিলানের লোকদের যদি আপনি অনুরূপ ঘোষণা থেকে নিরস্ত করতে পারেন, তাহলে আমাদের বাঞ্ছাই পূর্ণ হয়।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার, যে তুরিনের লোকেরা জুরাবাসীদের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছে, কাজে কাজেই আমাদেরও স্বৈরতান্ত্রিকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে, ঠিক তারাই আবার হঠাৎ সাধারণ পরিষদের কাছে দাবি করেছে যে, তুরিনে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী *Federazione Operaia**-র বিরুদ্ধে সাধারণ পরিষদকে এমন স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যা আগে কখনো করা হয়নি, *Ficcanaso*-র বেগহেলিকে বহিষ্কৃত করে দিতে হবে, যদিও সংস্থাটি আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত নয়, ইত্যাদি। আবার এ সবকিছুই করতে হবে *Federazione Operaia*-র এ বিষয়ে কী বক্তব্য আছে তা শোনার আগেই।

গত সোমবার আপনাকে পাঠিয়েছি জুরা সার্কুলার সহ *Révolution Sociale*, জেনেভার *Égalité*-র একটি সংখ্যা (দুর্ভাগ্যক্রমে জেনেভার ফেডেরাল কমিটির জবাব আছে যে সংখ্যায় তার আর একটি কপিও আমার কাছে নেই; এই সংস্থাটি জুরাবাসীদের চেয়ে বিশগুণ বেশী শ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব করে) এবং এককপি *Volksstaat*, যা থেকে আপনি জানতে পারবেন, জার্মানির লোকেরা ব্যাপারটি সম্পর্কে কী ভাবছে। স্যাক্সন আঞ্চলিক সভা — ৬০টি এলাকা থেকে ১২০ জনপ্রতিনিধি — **সর্বসম্মতিক্রমে** সাধারণ পরিষদের স্বপক্ষে মত দিয়েছে।

বেলজিয়ান কংগ্রেস (ডিসেম্বর, ২৫—২৬) নিয়মাবলীর পুনর্বিচার দাবি করেছে, কিন্তু **নিয়মিত** কংগ্রেসেই (সেপ্টেম্বরে)। ফ্রান্স থেকে আমরা প্রতিদিন অনুমোদন বিবৃতি পাচ্ছি। এখানে, ইংলন্ডে অবশ্য এইসব ঘোঁটের জন্য কোনো সমর্থন নেই। সাধারণ

* শ্রমিক ফেডারেশান। — সম্পাঃ

পরিষদ নিশ্চয়ই কয়েকজন আত্মম্ভরী ঘোঁটপাকিয়েকে খুশি করার জন্য অতিরিক্ত কংগ্রেস আহ্বান করবেন না। যতদিন এই ভদ্রলোকেরা নিয়মের চৌহদ্দির মধ্যে থাকবেন, ততদিন সাধারণ পরিষদ সানন্দে তাদের খুশিমতো কাজ করতে দেবেন — অতি বিভিন্নতম কতকগুলি লোকের এই জোট শীঘ্রই ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু নিয়মাবলী অথবা কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর বিরুদ্ধে তারা কিছু করতে শুরু করলেই সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ পরিষদ তার কর্তব্য করবে।

যদি লক্ষ্য করে থাকেন যে, লোকগুলি ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেছে ঠিক সেই সময়টিতে যখন আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে একটা সাধারণ হৈচৈ শুরু হয়েছে, তাহলে মনে না হয়ে পারে না যে, এ খেলায় নিশ্চয়ই আন্তর্জাতিক পুলিশের হাত আছে। এবং ঠিক তাই। বেজিয়ার্সে জেনেভা বাকুনিনপন্থীরা প্রধান পুলিশ কমিশনারকে তাদের সংবাদদাতা ঠিক করেছে। দুজন নামকরা বাকুনিনপন্থী, লিয়োঁ-র আলবের্ত রিচার্ড ও লেবলাঁ এখানে এসেছিলেন। সল নামক লিয়োঁ-র একজন শ্রমিকের সঙ্গে তাঁরা কথা বলেন। তাঁকে তাঁরা বলেন, তিয়েরকে উচ্ছেদ করার একমাত্র পন্থা হচ্ছে আবার বোনাপার্টকে সিংহাসনে বসানো এবং **বোনাপার্ট পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে** দেশান্তরীদের মধ্যে **প্রচার** চালানোর জন্যই তাঁরা **বোনাপার্টের টাকায়** সফরে বেরিয়েছেন! এই ভদ্রলোকেরা যাকে বলেন রাজনীতি থেকে বিরত থাকা, এই হল তার নমুনা! বার্লিনে বিসমার্কের অর্থপুষ্ট *Neuer Social-Demokrat*ও ঠিক এই সুরেই পোঁ ধরেছে। এ ব্যাপারে রুশ পুলিশ কতটা জড়িত সে প্রশ্নের কোনো জবাব আমি আপাতত দিচ্ছি না, কিন্তু নেচায়েভের ব্যাপারে বাকুনিন ওতপ্রোতভাবেই জড়িত ছিলেন (তিনি অবশ্য, একথা অস্বীকার করেন, কিন্তু এখানে আমাদের হাতে মূল রুশ রিপোর্ট আছে এবং যেহেতু মার্কস ও আমি রুশ ভাষা বুঝি, সেইহেতু তিনি আমাদের ফাঁকি দিতে পারবেন না)। নেচায়েভ হয় একজন রুশ গুপ্তচর, না হয় সে সেই রকমই কাজ করেছে। তাছাড়া বাকুনিনের রুশ বন্ধুদের মধ্যে নানারকমের সব সন্দেহজনক লোক রয়েছে।

আপনার চাকুরিটি গেছে শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলাম! আমি তো আপনাকে স্পষ্টই লিখেছিলাম এমন কিছু না করতে যাতে এই ঘটনা ঘটতে পারে। **প্রকাশ্য কাজের** দ্বারা যে সামান্য ফল হবে তার তুলনায় মিলানে আপনার উপস্থিতি আন্তর্জাতিকের পক্ষে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ: গুপ্তভাবেও অনেক কিছু করা যেতে পারে ইত্যাদি। অনুবাদ ইত্যাদির কাজ পাওয়ার ব্যাপারে যদি আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারি, তাহলে সানন্দে তা করব। কোন কোন ভাষা **থেকে** কোন কোন **ভাষায়** আপনি তর্জমা করতে পারেন এবং **কী ভাবে** আপনাকে সাহায্য করতে পারি জানাবেন।

পুলিশ হারামজাদারা দেখছি আমার ফটোটিকেও আটকে দিয়েছে। আমি আপনার জন্য এইসঙ্গে আর একখানি ফটো পাঠাচ্ছি। আপনি আমাকে আপনার দুখানা ফটো

পাঠাবেন। ওর একখানা দিয়ে মিস মার্কসের কাছ থেকে ওঁর বাবার একখানা ফটো আদায় করা যাবে (দুয়েকখানা ভাল ফটো এখনো একমাত্র তাঁরই কাছে আছে)।

আর একবার বলি, বাকুনিনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট **সমস্ত** লোক সম্পর্কেই একটু সতর্ক থাকবেন। জোট পাকিয়ে থাকা ও চক্রান্ত করা সমস্ত গোষ্ঠীরই স্বভাব। এবিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, **আপনার যে-কোনো খবর** সঙ্গে সঙ্গে বাকুনিনের কাছে চলে যাবে। তাঁর একটি মূল নীতিই হচ্ছে, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ইত্যাদি ধরনের কাজ হচ্ছে বুর্জোয়া কুসংস্কার মাত্র, লক্ষ্য লাভের উদ্দেশ্যে প্রকৃত বিপ্লবীর কাছে তা অবশ্য অশ্রদ্ধেয়। রাশিয়ায় একথা তিনি খোলাখুলিই বলে থাকেন; পশ্চিম ইউরোপে সেটা গোপন তত্ত্ব।

খুব তাড়াতাড়ি চিঠির জবাব দেবেন। অন্য ইতালীয় শাখাগুলির সঙ্গে সুর মেলাতে যদি মিলান শাখাকে আমরা নিরস্ত করতে পারি, তাহলে সত্যিই একটা ভাল কাজ করা হবে।...

আ. বেবেল সমীপে এঙ্গেলস

লন্ডন, ২০শে জুন, ১৮৭৩

আমি প্রথমে আপনার চিঠির উত্তর দিচ্ছি, কারণ লিবক্লেখতের চিঠি এখনো মার্কসের কাছে রয়েছে এবং তিনি ঠিক এই মুহূর্তে তার খোঁজ পাচ্ছেন না।

হেপনার নয়, কমিটির স্বাক্ষরিত যে চিঠি ইয়র্ক তাঁকে লিখেছিলেন সেই চিঠিতেই আমাদের ভয় হয়েছিল যে, পার্টি কর্তৃপক্ষ যারা দুর্ভাগ্যক্রমে পুরোপুরিই লাসালপন্থী — তারা *Volksstaat*-কে একখানি 'সৎ' *Neuer Social-Demokrat*-এ পরিণত করার জন্য আপনার কারাবাসের সুযোগ গ্রহণ করবেন। ইয়র্ক স্পষ্টই এ ধরনের অভিপ্রায়ের কথা স্বীকার করেছিলেন এবং কমিটি সম্পাদকদের নিয়োগ ও অপসারিত করার অধিকার দাবি করেছিলেন বলেই বিপদটা নিশ্চিতই বেশ গুরুতর মনে হয়েছিল। হেপনারের আসন্ন বহিষ্কার এই পরিকল্পনাগুলিকে আরও জোরদার করে তুলেছিল। এই অবস্থায় পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত থাকা আমাদের পক্ষে একান্তভাবেই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তাই এই পত্রালাপ...

... লাসালবাদের প্রতি পার্টির মনোভাবের কথায় বলি, কী কৌশল অবলম্বন করতে হবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, তা অবশ্য আমাদের চেয়ে আপনিই ভাল বুঝবেন। কিন্তু এই কথাটিও বিবেচনা করতে হবে। আপনার মতো যখন কেউ কিছুটা পরিমাণে নিখিল জার্মান শ্রমিক সঙ্ঘের প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়ায়, তখন সে সহজেই তার প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি একটু বেশী মনোযোগী হয়ে পড়ে এবং সর্বদা প্রথমে তারই কথা ভাবতে অভ্যস্ত হয়। কিন্তু নিখিল জার্মান শ্রমিক সঙ্ঘ এবং সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি — উভয়কে একত্রে ধরলে তারা এখনও জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু

অংশ। সুদীর্ঘ বাস্তব অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত আমাদের মত হল এই যে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানের এখান ওখান থেকে কিছু ব্যক্তি ও সদস্যদলকে ফুসলিয়ে আনাটাই প্রচার কার্যের সঠিক কৌশল নয়, সঠিক কৌশল হচ্ছে, যে-বিরাট জনসংখ্যা এখনও নিষ্ক্রিয় রয়েছে তাদের মধ্যে কাজ করা। কাঁচা অবস্থা থেকে টেনে আনা হয়েছে এমন একটিমাত্র লোকের তাজা শক্তির মূল্য দশটি লাসালপন্থী দলত্যাগীর চেয়েও বেশী, কারণ তারা সর্বদাই পার্টির মধ্যে মিথ্যা ঝোঁকের বীজ বহন করে আনে। আর যদি স্থানীয় নেতাদের বাদ দিয়ে শুধু জনসাধারণকে টানতে পারা যায়, তাহলেও চলে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, টানতে গেলে সব সময় এই ধরনের নেতাদের পুরো দলটিকে জড়িয়েই টানতে হয়। এরা নিজেদের আগেকার মতামতের দ্বারা না হলেও আগেকার প্রকাশ্য বিবৃতিগুলির দায়ে আবদ্ধ থাকে এবং তখন তাদের সর্বোপরি প্রমাণ করার চেষ্টা করতে হয় যে, তারা তাদের নীতি ছাড়েনি, বরং সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টিই প্রকৃত লাসালবাদ প্রচার করছে। আইজেনাখে* তখন এই দুর্ঘটনাই ঘটেছিল — তখন হয়তো তা এড়ানো যেত না, -- কিন্তু এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, এরা পার্টির ক্ষতি করেছে এবং তাদের অন্তর্ভুক্তি ছাড়াও পার্টি অন্তত আজকের মতো এতটা শক্তিশালী হত না এমন কথা নিশ্চয় করে বলতে পারি না। যাই হোক, এসব লোকের যদি সংখ্যাবৃদ্ধি হয় তাহলে তাকে আমি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা বলেই মনে করব।

'ঐক্যের' চীৎকারে নিজেকে ভুলালে চলবে না। যাদের মুখে এই কথাটি সবচেয়ে বেশি লেগেই আছে প্রধানত তারাই বিভেদের বীজ বপন করে। ঠিক যেমন এখন সুইজারল্যাণ্ডে জুরার বাকুনিনপন্থীরা করছে। সব বিভেদগুলি তারাই উস্কিয়ে তুলেছে, অথচ ঐক্যের জন্য চীৎকার করছে তারাই সবচেয়ে বেশী। এই ঐক্যপাগলদের হয় বুদ্ধি কম, যারা সবকিছু মিশিয়ে ঘুঁটে ঘুঁটে এমন এক অদ্ভুত খিচুড়ি বানাতে চাইছে যা ঠান্ডা হতে দেওয়া মাত্রই পার্থক্যগুলো আবার ভেসে উঠবে এবং একপাত্রে রয়েছে বলে সেগুলি ভেসে উঠবে আগের চেয়ে স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে (জার্মানিতে এর চমৎকার দৃষ্টান্ত মিলবে সেই সব লোকেদের মধ্যে যারা শ্রমিকদের সঙ্গে পেটি বুর্জোয়ার মিলনের কথা প্রচার করছে) — না হয়, তারা নিজেদের অজ্ঞাতসারে (যেমন, মুলবের্গার) অথবা সচেতনভাবেই আন্দোলনকে কলুষিত করতে চাইছে। সেইজন্যই, যারা সবচেয়ে বেশি গোষ্ঠীপন্থী এবং যারা সবচেয়ে ঝগড়াটে ও বদমাইস তারাই এক এক সময় ঐক্যের জন্য সবচেয়ে বেশী চীৎকার করে। ঐক্য-চীৎকারকদের জন্য আমাদের জীবনে সবচেয়ে বেশী দুর্ভোগ ও সবচেয়ে বেশী বেইমানি সইতে হয়েছে।

স্বভাবত প্রত্যেক পার্টি নেতৃত্বই সাফল্য চায়, এবং এটা খুবই ভাল কথা। কিন্তু এমন

* এঙ্গেলস এখানে ১৮৬৯ সালের আইজেনাখ কংগ্রেসের কথা বলছেন। এই কংগ্রেসে জার্মানির সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি সরকারীভাবে গঠিত হয়। — সম্পাঃ

পরিস্থিতি আসে যখন আরও গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর জন্য **আশু** সাফল্যকে বিসর্জন দেবার সাহস থাকা চাই। বিশেষত, আমাদের পার্টির মতো পার্টির পক্ষে, শেষ পর্যন্ত যার সাফল্য একান্তভাবেই সুনিশ্চিত এবং যে পার্টি আমাদের জীবদ্দশাতেই এবং আমাদের চোখের উপরই এত বিপুলভাবে বেড়ে উঠেছে — সেই পার্টির পক্ষে আশু সাফল্য কোনোক্রমেই সব সময়ে এবং একান্তভাবেই প্রয়োজনীয় নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আন্তর্জাতিকের কথাই ধরা যাক। কমিউনের ঘটনার পর আন্তর্জাতিক বিরাট সাফল্য অর্জন করে। বুর্জোয়ারা সাংঘাতিক ভয় পেয়ে একে সর্বশক্তিমান বলে মনে করতে থাকে। এর বিপুল সংখ্যক সদস্যের বিশ্বাস ছিল অনন্তকাল বুঝি এইভাবেই চলবে। আমরা কিন্তু ভালভাবেই জানতাম, এ বুদ্বুদ ফেটে **যাবেই**। যত আজেবাজে লোক এসে এতে যোগ দিয়েছিল। আন্তর্জাতিকের মধ্যের গোষ্ঠীবাদীরা বেশ ফেঁপে উঠতে থাকে এবং নিজেদের হীনতম ও নির্বোধতম কাজকর্মের অনুমোদন লাভের আশা নিয়ে আন্তর্জাতিকের অপব্যবহার করতে থাকে। আমরা তা করতে দিইনি। এ বুদ্বুদ একদিন ফেটে যাবেই তা ভাল করে জানতাম বলে বিপর্যয়কে বিলম্বিত করার দিকে আমাদের মনোযোগ ছিল না, আমরা সতর্ক ছিলাম যাতে আন্তর্জাতিক এই বিপর্যয় থেকে বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল হয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। হেগে এই বুদ্বুদ ফেটে যায় এবং আপনি তো জানেন, কংগ্রেসের* অধিকাংশ সভ্যই হতাশা নিয়ে ঘরে ফিরে যান। কিন্তু এই যে হতাশ ব্যক্তিরা ভেবেছিলেন আন্তর্জাতিকের মধ্যে তাঁরা সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও পুনর্মিলনের আদর্শ দেখতে পাবেন, তাঁদের প্রায় সকলেই নিজ নিজ দেশে যে কলহ করছিলেন সেটা হেগের চেয়ে তীব্রতর! এখন এই গোষ্ঠীবাদী কোন্দলকারীরা পুনর্মিলনের কথা প্রচার করছেন এবং বদমেজাজী ও ডিক্টেটর বলে আমাদের গালাগালি দিচ্ছেন। আর হেগে যদি আমরা আপোসের পথ ধরতাম, যদি আমরা সেখানে ভাঙনের প্রকাশকে চাপা দিয়ে দিতাম তাহলে ফল দাঁড়াত কী? গোষ্ঠীবাদীরা, অর্থাৎ বাকুনিনপন্থীরা, আর একটি পুরো বছর হাতে পেত আন্তর্জাতিকের নামে আরও অনেক বেশী নির্বোধ ও কলঙ্কজনক কাজ করার; সবচেয়ে উন্নত দেশগুলির শ্রমিকেরা তিক্ত বিরক্ত হয়ে সরে যেত, বুদ্বুদ ফাটত না, খোঁচায় খোঁচায় ক্রমশ চুপসে যেত; এবং পরবর্তী কংগ্রেসে যখন অনিবার্যভাবেই সঙ্কট দেখা দিত, তখন সে কংগ্রেস হীনতম ব্যক্তিগত কলহে পরিণত হত, কেননা ইতিপূর্বে হেগেই **নীতির** বিসর্জন হয়ে গেছে! তখন আন্তর্জাতিক সত্যই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেত — টুকরো টুকরো হয়ে যেত 'ঐক্যেরই' মাধ্যমে! তার পরিবর্তে যা কিছু পচা ছিল তা থেকে আমরা আজ নিজেদের সসম্মানে মুক্ত করতে

---

* ১৮৭২ সালের ১লা থেকে ৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হেগে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিকের কংগ্রেস। — সম্পাঃ

পেরেছি — কমিউনের যেসব সদস্য শেষ ও চূড়ান্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা বলেছেন, কমিউনের কোনো বৈঠকই তাঁদের মনে এতখানি প্রবল দাগ কাটতে পারেনি যতখানি দাগ কেটেছিল বিচারকমণ্ডলীর এই বৈঠক, যেখান থেকে ইউরোপের প্রলেতারিয়েতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করা হয়; — দশমাস পর্যন্ত তাঁদের আমরা মিথ্যা, কুৎসা ও চক্রান্তে সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করতে দিয়েছিলাম আর আজ তাঁরা কোথায় ? আন্তর্জাতিকের বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রতিনিধি বলে কথিত এই ব্যক্তিরা আজ নিজেরাই ঘোষণা করছেন যে, পরবর্তী কংগ্রেসে আসার সাহস তাঁদের নেই। (এই পত্রের সঙ্গে *Volksstaat*-এর জন্য যে প্রবন্ধ পাঠাচ্ছি তাতে ব্যাপারটি আরও বিশদভাবে আছে।) যদি আমাদের আবার একাজে নামতে হত, তাহলে সমগ্রভাবে ধরলে আমাদের পদ্ধতি অন্যরকম হত না —কৌশলগত ভুল অবশ্য সব সময়ই সম্ভব।

সে যাই হোক, আমার মনে হয়, লাসালপন্থীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যথাসময়ে আপনাদের কাছে এসে পড়বে, অতএব ফল পাকার আগে ফল পাড়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, যেটি ঐক্যওয়ালারা চাইছে।

তাছাড়া, বৃদ্ধ হেগেল তো ইতিপূর্বেই বলে দিয়েছেন, পার্টির মধ্যে **ভাঙন** ধরা এবং এই ভাঙন সহ্য করতে পারার দ্বারাই একটি পার্টি নিজেকে বিজয়ী পার্টি বলে প্রমাণ করে। প্রলেতারীয় আন্দোলন অবশ্যম্ভাবীরূপেই বিকাশের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে যায় এবং প্রতি স্তরেই কিছু লোক আটকে যায় এবং আর অগ্রগতিতে যোগ দেয় না। একমাত্র এই থেকেই বোঝা যায় কেন 'প্রলেতারিয়েতের সংহতি'ই আসলে সর্বত্র রূপ পরিগ্রহ করছে বিভিন্ন পার্টি গোষ্ঠীর মধ্যে, যারা রোমক সাম্রাজ্যে ভীষণতম নিপীড়ন কালের খ্রীষ্টান গোষ্ঠীগুলির মতোই পরস্পরের সঙ্গে জীবনমরণ সংঘর্ষ চালিয়ে যাচ্ছে।

একথাও ভুলবেন না যে, *Volksstaat*-এর চেয়ে *Neuer Social Demokrat*-এর গ্রাহক সংখ্য যদি বেশী হয়ে থাকে তবে তার কারণ **গোষ্ঠী** মাত্রেই অনিবার্যভাবেই মতান্ধ এবং এই মতান্ধতার জোরে বিশেষ করে যে এলাকায় সে নতুন সেখানে (যেমন, শ্লেজভিগ-হলষ্টাইনে নিখিল জার্মান শ্রমিক সংঘ) — সে অনেক বেশী আশু সাফল্য অর্জন করে সেই পার্টির তুলনায়, যে পার্টি সব রকম গোষ্ঠীগত খামখেয়াল বর্জন করে শুধু প্রকৃত আন্দোলনেরই প্রতিনিধিত্ব করে। তবু মতান্ধতা ক্ষণকালের জিনিস।

ডাক যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে বলে চিঠি এখানেই শেষ করতে হল। শুধু তাড়াতাড়ি এইটুকু বলে দিই: ফরাসী তর্জমা শেষ না হওয়া পর্যন্ত* (মোটামুটি জুলাই-এর শেষাশেষি) মার্কস লাসাল হাতে নিতে পারবেন না; তারপর আবার তাঁর একান্তভাবেই বিশ্রামের প্রয়োজন হবে, কারণ অত্যন্ত অতিরিক্ত পরিশ্রম করেছেন তিনি...

* 'পুঁজি' গ্রন্থের ফরাসী ভাষায় তর্জমার কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

ফ. আ. জরগে সমীপে এঙ্গেলস

লণ্ডন, ১২—১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪

... আপনার পদত্যাগে **পুরাতন** আন্তর্জাতিক একদম উঠে গেল, শেষ হয়ে গেল। ভালই হল। এ ছিল দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সেই পর্বের বস্তু, যখন সারা ইউরোপব্যাপী নিপীড়নের ফলে সদ্য পুনরুদীয়মান শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে ঐক্য রক্ষা এবং সমস্ত প্রকারের আভ্যন্তরীণ বিতর্ক থেকে বিরত থাকাই ছিল অবশ্যপালনীয় কাজ। সময়টা প্রলেতারিয়েতের সাধারণ এবং সার্বজাতিক স্বার্থকে সামনে তুলে ধরার উপযোগী। জার্মানি, স্পেন, ইতালি, ডেনমার্ক সবে আন্দোলনের মধ্যে এসেছে অথবা আসছে। প্রকৃতপক্ষে, ১৮৬৪ সালে ইউরোপের সর্বত্র, অর্থাৎ জনসাধারণের মধ্যে, আন্দোলনের তত্ত্বগত প্রকৃতিটিই ছিল অত্যন্ত অস্পষ্ট, শ্রমিক পার্টি হিসাবে জার্মান কমিউনিজমের তখনও কোনো অস্তিত্ব ছিল না, নিজের বিশেষ মর্জির ঘোড়া ছুটাবার মতো শক্তি তখনো প্রুধোঁবাদ অর্জন করতে পারেনি, বাকুনিনের নয়া প্রলাপ তখনো তার নিজের মগজেই আসেনি, এমনকি ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নগুলোর নেতারাও ভাবতেন, নিয়মাবলীর মুখবন্ধে সন্নিবিষ্ট কর্মসূচির মধ্যে আন্দোলনে যোগদানের মতো ভিত্তি তাঁরা পাচ্ছেন। প্রথম বিরাট সাফল্যের ফলে সমস্ত উপদলের এই অতি সরল সম্মিলনটি ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে বাধ্য ছিল। এই সাফল্যই হল কমিউন। কমিউন সৃষ্টির ব্যাপারে আন্তর্জাতিক একটি অঙ্গুলিও উত্তোলন না করলেও চিন্তাধারার দিক থেকে কমিউন যে আন্তর্জাতিকেরই সন্তান তাতে কোনো সন্দেহ নেই, এবং কমিউনের জন্য যে আন্তর্জাতিককে দায়ী করা হল তা কিছুটা পরিমাণে খুবই সঙ্গত। কিন্তু কমিউনের কল্যাণে যখন আন্তর্জাতিক ইউরোপে একটি নৈতিক শক্তি হয়ে দাঁড়াল, অমনি হৈচৈ শুরু হয়ে গেল। প্রত্যেকটি ধারাই এই সাফল্যকে নিজ নিজ স্বার্থে কাজে লাগাতে চেষ্টা করতে লাগল। অনিবার্য ভাঙন শুরু হল। একমাত্র যারা পুরাতন ব্যাপক কর্মসূচির ভিত্তিতে কাজ করে যেতে সত্যই প্রস্তুত ছিল, সেই জার্মান কমিউনিস্টদের ক্রমাগত শক্তিবৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে বেলজিয়ান প্রুধোঁপন্থীরা গিয়ে পড়ল বাকুনিনপন্থী হটকারীদের কবলে। আসলে হেগ কংগ্রেসেই সব শেষ হয়ে গেল, — উভয় পার্টির পক্ষেই। একমাত্র দেশ যেখানে আন্তর্জাতিকের নামে তখনও কিছু করা চলত, সে হল আমেরিকা এবং এক শুভ সহজবোধে সর্বোচ্চ পরিচালনা সেখানে স্থানান্তরিত করা হল। বর্তমানে সেখানেও তার মর্যাদা ফুরিয়ে এসেছে এবং তাকে পুনরুজ্জীবিত করার যে-কোনো চেষ্টা হবে নিছক নির্বুদ্ধিতা ও শক্তির অপচয়। দশ বছর ধরে আন্তর্জাতিক ইউরোপীয় ইতিহাসের একটি দিকের উপর, যে দিকটায় ভবিষ্যৎ সেই দিকের উপর আধিপত্য করেছে এবং

নিজের কৃত কর্মের জন্য সে গর্ববোধ করতে পারে। কিন্তু পুরাতন রূপে এ আন্তর্জাতিকতার উপযোগিতা ফুরিয়ে গেছে। পুরাতন কায়দায় আবার একটি নূতন আন্তর্জাতিক, সমস্ত দেশের সমস্ত প্রলেতারীয় পার্টির ঐক্য, তা গঠন করতে হলে প্রয়োজন ১৮৪৯ সাল থেকে ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত যেরূপ নিপীড়ন চলেছিল শ্রমিক আন্দোলনের সেইরূপ সার্বিক নিপীড়ন। কিন্তু তার জন্যে প্রলেতারীয় দুনিয়া অনেক বড়, অনেক বিস্তৃত হয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস, কয়েক বছর ধরে মার্কসের রচনাবলীর ফল ফলবার পর, যে নূতন আন্তর্জাতিক গঠিত হবে তা হবে সরাসরি কমিউনিস্ট এবং তা ঘোষণা করবে ঠিক আমাদের নীতিগুলিকেই ...

আ. বেবেল, ভ. লিবক্লেখত, ভ. ব্রাকে প্রমুখের প্রতি মার্কস ও এঙ্গেলস

('সার্কুলার পত্র')

লণ্ডন, ১৭—১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯

... **জুরিখ-ত্রয়ীর ইস্তেহার**

ইতিমধ্যে হোখবের্গের *Jahrbuch* আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। তাতে 'পশ্চাৎপ্রেক্ষিতে জার্মানির সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন'* শীর্ষক প্রবন্ধটি রয়েছে। হোখবের্গে নিজে আমাকে বলেছেন প্রবন্ধটি জুরিখ কমিশনের তিনজন সদস্যেরই লেখা। তাই এটা হল তাঁদের এযাবৎকার আন্দোলনের প্রামাণ্য সমালোচনা এবং ঐসঙ্গে তাঁদের নিজেদের উপর যতখানি নির্ভর করে সেই পরিমাণে নূতন মুখপত্রের কর্মপন্থার প্রামাণ্য কর্মসূচিও বটে।

একেবারে শুরুতেই রয়েছে:

'যে-আন্দোলনকে লাসাল প্রধানত রাজনৈতিক বলে মনে করতেন, যাতে যোগদানের জন্য শুধু শ্রমিকদের নয়, সমস্ত সৎ গণতন্ত্রীদেরও তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং **যার নেতৃত্বে** থাকার কথা ছিল বিজ্ঞানের স্বাধীন প্রতিনিধিদের ও **প্রকৃত মানবপ্রেমে**

---

* হোখবের্গে, বের্নস্টাইন ও শ্রাম লিখিত এই প্রবন্ধটি সোশ্যাল রিফর্মিস্ট পত্রিকা *Jahrbuch für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik* (সমাজবিজ্ঞান ও সামাজিক নীতির বার্ষিক পত্র) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। — সম্পাঃ

উদ্বুদ্ধ সমস্ত লোকেদের, সেই আন্দোলন ইয়োহান বাপ্তিস্ত শ্‌ভাইৎসারের নেতৃত্বে সংকুচিত হয়ে **শিল্প-শ্রমিকদের নিজেদের স্বার্থের একপেশে সংগ্রামে** পরিণত হয়।'

একথা ইতিহাসের দিক থেকে সঠিক কিনা অথবা কতখানি সঠিক সে বিচার আমি করব না। শ্‌ভাইৎসারকে এখানে নিন্দা করা হয়েছে এইজন্য যে, এখানে যাকে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক-মানবপ্রেমিক আন্দোলন বলে ধরা হয়েছে, সেই লাসালবাদকে তিনি শিল্প-শ্রমিকদের স্বার্থে একপেশে সংগ্রামে সংকুচিত করেছেন, যেখানে আসলে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে শিল্প-শ্রমিকদর শ্রেণী-সংগ্রাম রূপে তিনি আন্দোলকে **গাঢ়তরই করে তুলেছেন।** তাঁকে আরও নিন্দা করা হয়েছে 'বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে' তিনি 'পরিহার করেছেন' বলে। কিন্তু সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির মধ্যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রয়োজনটা কিসের ? যদি 'সৎ লোকদের' নিয়েই বুর্জোয়া গণতন্ত্র হয়, তাহলে তা প্রবেশাধিকার চাইতেই পারে না, কিন্তু তবু যদি চায় তাহলে তা শুধু হৈচৈ শুরু করার জন্যই।

লাসালবাদী পার্টি **'চূড়ান্ত একপেশেভাবে শ্রমিক পার্টি** হিসাবে চলতে চেয়েছে।' যে ভদ্রলোকেরা এই কথা লিখছেন তাঁরা নিজেরাই সেই পার্টির সভ্য, যে পার্টি শ্রমিকদের পার্টি হিসাবে চূড়ান্ত একপেশেভাবে চলছে ; আর তাঁরা এই পার্টিরই সরকারী আসনে অধিষ্ঠিত। এটা একেবারে চলে না। যা তাঁরা লিখছেন সত্যি যদি তাই তাঁরা বিশ্বাস করেন, তাহলে তাঁদের ঐ পার্টি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, অন্তত‌পক্ষে নিজের পদ থেকে ইস্তাফা দিতে হবে। যদি একাজ তাঁরা না করেন তাহলে তাতে করে তাঁরা স্বীকার করে নেবেন যে, পার্টির প্রলেতারীয় চরিত্রের বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে তাঁরা তাঁদের সরকারী পদের সুযোগ নিতে চান। অতএব পার্টি যদি তাঁদের পদে অধিষ্ঠিত রাখে, তবে সে নিজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

তাহলে, দেখা যাচ্ছে, এই ভদ্রলোকদের মত অনুযায়ী, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিকে একপেশে শ্রমিকদের পার্টি হলে চলবে **না,** তাকে 'প্রকৃত মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সমস্ত লোকদের' সবপেশে পার্টি হতে হবে। সর্বোপরি শ্রমিকদের অমার্জিত আবেগকে সরিয়ে ফেলে এবং 'সুরুচি চর্চা' ও 'সদাচার শেখার' জন্য নিজেকে শিক্ষিত, মানবপ্রেমিক বুর্জোয়াদের পরিচালনাধীনে এনে তাকে এর প্রমাণ দিতে হবে (পৃঃ ৮৫)। তখন কিছু নেতার 'অভদ্র আচরণের' পরিবর্তে আসবে একান্ত ভদ্র 'বুর্জোয়া আচরণ'। (যেন এ নয় যে, এখানে যাঁদের কথা বলা হচ্ছে তাঁদের নিন্দা করার দিক থেকে বাহ্যিক অভদ্র আচরণটা সবচেয়ে তুচ্ছ ব্যাপার!) তাহলে **'শিক্ষিত ও সম্পত্তিবান** শ্রেণীর মহল থেকেও **বহু অনুগামী** এসে যাবে। কিন্তু আন্দোলনকে যদি **সুস্পষ্ট সাফল্য** লাভ করতে হয়, তাহলে . আগে **এ'দেরই** পক্ষে টেনে আনতে হবে।' জার্মান সমাজতন্ত্র **'জনসাধারণকে** টেনে আনার উপর **অত্যাধিক গুরুত্ব অর্পণ করেছে এবং করতে গিয়ে** সমাজের তথাকথিত উপরি স্তরে জোরালো(!) প্রচারকার্যে **অবহেলা করেছে।' কারণ**

'রাইখস্টাগে প্রতিনিধিত্ব করার মতো লোক এখনও পার্টির নেই।' তবে 'সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সম্পর্কে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল করার সময় ও সুযোগ আছে এমন লোকেদের উপরই ম্যান্ডেট অর্পণ করা বাঞ্ছনীয়, এমনকি প্রয়োজন। সাধারণ শ্রমিক বা ছোটো কারিগরের পক্ষে... এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অবসর মেলে কেবল অতি বিরল ও ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে।' অতএব, বুর্জোয়াকে নির্বাচিত কর!

সংক্ষেপে: নিজের জোরে নিজেকে মুক্ত করার ক্ষমতা শ্রমিক শ্রেণীর নেই। এর জন্য তাকে 'শিক্ষিত ও সম্পত্তিবান' বুর্জোয়াদের নেতৃত্বাধীন হতে হবে, কিসে শ্রমিকদের কল্যাণ হয় সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবার মতো 'সময় ও সুযোগ' কেবলমাত্র তাদেরই আছে। দ্বিতীয়ত, বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে কোনক্রমেই লড়াই করা চলবে না, বরং জোরালো প্রচারকার্যের দ্বারা তাদের **পক্ষে টেনে আনতে** হবে।

কিন্তু, সমাজের উচ্চ স্তরের কিম্বা ঐ স্তরের মাত্র সদিচ্ছাপ্রণোদিত ব্যক্তিদের পক্ষে টেনে আনতে হলে, কোনোক্রমেই তাদের ভীত করা চলবে না। এবং এ ব্যাপারে জুরিখ-ত্রয়ী মনে করেন যে, তাঁরা আশ্বস্ত করার মতো একটি আবিষ্কার করেছেন:

'ঠিক আজকের দিনেই, সমাজতন্ত্রী বিরোধী আইনের চাপে পড়ে পার্টি দেখিয়ে দিচ্ছে যে, সে আর হিংসাত্মক রক্তাক্ত বিপ্লবের পথ অনুসরণ করতে **চায় না,** বরং সে... আইনসম্মত পথ, অর্থাৎ **সংস্কারের** পথ গ্রহণেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।' অতএব, যদি ৫,০০,০০০ থেকে ৬,০০,০০০ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ভোটার যারা সমগ্র নির্বাচকমণ্ডলীর এক দশমাংশ থেকে এক অষ্টমাংশের মতো এবং তাছাড়া সারা দেশে বিক্ষিপ্ত, তাঁদের যদি দেয়ালে মাথা না ভাঙবার ও দশের বিরুদ্ধে একের 'রক্তাক্ত বিপ্লবের' চেষ্টা না করবার সুবুদ্ধি থাকে, তাহলেই যেন প্রমাণ হয়ে গেল যে, বৈদেশিক নীতির কোনো প্রচণ্ড ঘটনা, সেই ঘটনা থেকে উদ্ভূত কোনো আকস্মিক বৈপ্লবিক গণজাগরণ অথবা এমনকি ঐ ঘটনাসঞ্জাত কোনো সংঘর্ষে জনগণের **বিজয়** লাভটা পর্যন্ত ব্যবহার করার নীতি তাঁরা চিরদিনের মতো **বর্জন করছেন!** আবার কখনো আর একটি ১৮ই মার্চ ঘটানোর মতো* অশিক্ষিত মনোভাব যদি বার্লিন দেখায়, তাহলে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা তখন 'ব্যারিকেডের বাতিকগ্রস্ত ছোটো লোক' হিসাবে (পৃঃ৮৮) লড়াইয়ে অংশগ্রহণের পরিবর্তে 'আইনসম্মত পথ অনুসরণ করবেন', ব্রেক কষে দেবেন, ব্যারিকেড পরিষ্কার করবেন এবং প্রয়োজন হলে গৌরবময় সেনাবাহিনীর সঙ্গে অভিযান করবেন একপেশে, অমার্জিত ও অশিক্ষিত জনগণের বিরুদ্ধে। ভদ্রলোকেরা যদি জোর গলায় বলেন যে, না, একথা তাঁরা বলতে চান না, তাহলে কী তাঁরা বলতে চান?

* ১৮৪৮ সালে ১৮ই—১৯শে মার্চে বার্লিনে বিপ্লবী ব্যারিকেড যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

কিন্তু এর পরে আরও চমৎকার জিনিস আছে।

'অতএব, বর্তমান অবস্থার সমালোচনা এবং এই অবস্থা পরিবর্তনের প্রস্তাবে পার্টি যত বেশী শান্ত, বিষয়নিষ্ঠ ও চিন্তাশীল হবে, ততই যে অভিযানের দ্বারা সচেতন প্রতিক্রিয়াশীলেরা লাল জুজুর ভয় দেখিয়ে বুর্জোয়াদের নত করিয়েছিল, বর্তমানের সাফল্যমণ্ডিত সেই অভিযানের (যখন সমাজতন্ত্রী বিরোধী আইন প্রবর্তিত হয়েছিল) পুনরাবৃত্তি করার সম্ভাবনা কম হবে' (পৃঃ ৮৮)।

বুর্জোয়াদের মনে যাতে বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা না থাকে, তজ্জন্য তাদের কাছে স্পষ্টভাবে এবং সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করতে হবে যে, লাল জুজু সত্যই জুজু মাত্র, তার কোনো অস্তিত্বই নেই। কিন্তু প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে অনিবার্য জীবনমরণ সংগ্রামের যে আতঙ্ক বুর্জোয়ার রয়েছে সেই আতঙ্ক ছাড়া এই লাল জুজু বস্তুটির রহস্য আর কী, আধুনিক শ্রেণী-সংগ্রামের অনিবার্য পরিণতির আতঙ্ক ছাড়া আর কী? উঠিয়ে দাও শ্রেণী-সংগ্রাম, তাহলে বুর্জোয়া ও 'সমস্ত স্বাধীন লোক' 'প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে হাতে হাতে মিলিয়ে এগিয়ে যেতে আর ভয় পাবে না'। তবে ঠকবে ঠিক ঐ প্রলেতারীয়রা।

অতএব দীনতা ও হীনতা দ্বারা পার্টি প্রমাণ দিক যে, সমাজতন্ত্রী বিরোধী আইন প্রবর্তিত হয়েছে যে 'অবিমৃষ্যকারিতা ও অনাচারকে' উপলক্ষ্য করে, তাকে সে চিরদিনের মতো বর্জন করেছে। স্বেচ্ছায় সে যদি প্রতিশ্রুতি দেয় যে, এই আইনের চৌহদ্দির মধ্যে থেকেই সে কাজ করতে চায়, তখন নিশ্চয়ই বিসমার্ক ও বুর্জোয়ারা দয়া করে আইনটি তুলে নেবেন, কারণ আইনটি তখন হবে অপ্রয়োজনীয় বাহুল্যমাত্র!

'আমাদের কেউ যেন ভুল না বোঝেন,' 'আমাদের পার্টি ও আমাদের কর্মসূচি' আমরা 'পরিত্যাগ করতে' চাই না, 'তবে একথা আমরা মনে করি যে, অধিকতর দূরপ্রসারী আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার কথা চিন্তা করার আগে যে কয়েকটি আশু সম্ভাব্য লক্ষ্য আমাদের যে কোনো ক্ষেত্রেই লাভ করতেই হবে, সেইগুলির উপর যদি আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা নিয়োগ করি, তাহলে এখন থেকে বহুবৎসর পর্যন্ত আমাদের হাতে যথেষ্ট কাজ থাকবে।' 'অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী দাবিগুলি দেখে... বর্তমানে ভয় পেয়ে দূরে রয়েছে' যেসব বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া ও শ্রমিক, তারা তখন দলে দলে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে।

কর্মসূচি **বর্জন করা** চলবে না, **স্থগিত রাখা** হবে মাত্র... অনির্দিষ্ট কালের জন্য। এই কর্মসূচিকে গ্রহণ করা হচ্ছে, সত্যিই তো আর নিজের জন্য নয়, নিজের জীবদ্দশার জন্য নয়, মৃত্যুপরবর্তীকালের জন্য, পুত্রপৌত্রাদিক্রমে হস্তান্তরিত উত্তরাধিকাররূপে। ইতিমধ্যে 'সমগ্র শক্তি ও ক্ষমতা' নিয়োগ করতে হবে যতসব তুচ্ছ বাজে ব্যাপারে এবং পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে জোড়াতালি দেওয়ার কাজে, যাতে অন্তত একটা কিছু ঘটছে

বলে মনে হয় অথচ বুর্জোয়াও ভয় না পায়। সে দিক থেকে তাহলে 'কমিউনিস্ট' মিকেলকে প্রশংসা করতে হয়। আগামী কয়েক শত বৎসরের মধ্যে পুঁজিবাদী সমাজের অনিবার্য উচ্ছেদে দৃঢ়নিশ্চিত হয়ে তিনি যথাসাধ্য জাল জয়াচুরির দ্বারা ১৮৭৩* সালের ধস্ আনায় যথাশক্তি সাহায্য করেন এবং **সত্যই** এইভাবে বর্তমান ব্যবস্থার পতন ঘটাতে কিছুটা সহায়তা করেন।

সুনীতি লংঘনের আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে 'Gründer-দের বিরুদ্ধে অতিরঞ্জিত আক্রমণ'। এরা তাদের 'যুগের সন্তান' বৈতো কিছু নয়। অতএব, 'স্ট্রুসবের্গ প্রমুখ লোকদের গালাগালি দেওয়া থেকে বিরত থাকাই... উচিত ছিল'। দুর্ভাগ্যক্রমে সকলেই 'তার যুগের সন্তান'। আর এই কৈফিয়ত যদি যথেষ্ট হয়, তবে আর কাউকেই আক্রমণ করা উচিত নয় এবং আমাদের সমস্ত তর্কবিতর্ক, সমস্ত সংগ্রাম শেষ করে দিতে হয় এবং নিঃশব্দে শত্রুদের পদাঘাত সহ্য করতে হয়; কারণ আমরা মহাবিজ্ঞ, তাই আমরা জানি যে, যেহেতু আমাদের শত্রুরা 'তাদের যুগের সন্তান' মাত্র, সেইহেতু অন্য কিছু করা তাদের সম্ভব নয়। সুদসমেত সে লাথি ফিরিয়ে না দিয়ে আমাদের উচিত এই হতভাগ্যদের করুণা করা।

তাছাড়া কমিউন সমর্থন করায় এই একটা অসুবিধাও ছিল যে, 'অনেকেই যাঁরা আমাদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন তাঁরা বিরূপ হয়ে যান এবং আমাদের প্রতি **বুর্জোয়াদের** ঘৃণা সাধারণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে'। তাছাড়া 'অক্টোবর আইন** পাশ হওয়াতে' পার্টির 'কোনো দোষ নেই এমন নয়,' কাবণ পার্টি একেবারে অকারণে **বুর্জোয়াদের ঘৃণা** বাড়িয়ে তুলেছে।

এই হচ্ছে জুরিখের তিন সেন্সরের কর্মসূচি। এতটুকু অস্পষ্টতা নেই কোথাও, বিশেষত আমাদের কাছে, যারা ১৯৪৮ সালের আমল থেকেই এই সমস্ত বুলির সঙ্গে সুপরিচিত। বৈপ্লবিক অবস্থার চাপে প্রলেতারিয়েত 'বড় বেশীদূর এগিয়ে' যেতে পারে, এই দুশ্চিন্তায় উদ্বিগ্ন পেটি বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিরা এখানে হাজির হয়েছেন। দৃঢ় রাজনৈতিক বিরোধিতার পরিবর্তে একটা সাধারণ সালিশি; সরকার ও বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরিবর্তে তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করানো ও নিজেদের দিকে টেনে আনার চেষ্টা; উপরিয়ালাদের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে নির্ভীক প্রতিরোধের

* ১৮৭৩ সালের ধসে শেষ হয় তথাকথিত Gründertaumel-এর যুগ। ১৮৭০-৭১ সালের ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধের পর যে বেপরোয়া ফাটকাবাজী ও শেয়ারবাজারী জুয়াড়ীপনার যুগ আসে, তাকেই বলা হয় *Gründertaumel*। — সম্পাঃ

** ১৮৭৮ সালের অক্টোবর মাসে বিসমার্ক কর্তৃক প্রবর্তিত সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে জরুরী আইনের উল্লেখ করা হচ্ছে। — সম্পাঃ

পরিবর্তে দীনহীন নতিস্বীকার এবং শাস্তি ন্যায্য হয়েছে বলে কবুলতি। ঐতিহাসিকভাবে আবশ্যক সমস্ত সংঘর্ষগুলিকে ভুলবুঝাবুঝি বলে ব্যাখ্যাদান এবং আসল ব্যাপারে আমরা সকলেই একমত, এই আশ্বাস দিয়ে সমস্ত আলোচনার পরিসমাপ্তি। ১৮৪৮ সালে যাঁরা বুর্জোয়া গণতন্ত্রী বলে নিজেদের প্রচার করেছিলেন, আজ তাঁরা অনায়াসেই নিজেদের সোশ্যাল-ডেমোক্রাট বলে ঘোষণা করতে পারেন: প্রথমোক্তদের কাছে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র যেমন দুর্লভ সুদূরের বস্তু ছিল, শেষোক্তদের কাছে পুঁজিবাদের উচ্ছেদও ঠিক তেমনই, অতএব, বর্তমান রাজনীতিতে তার মোটেই কোনো গুরুত্ব নেই, যতখুশি আপোস, মীমাংসা ও জনহিতৈষা চালানো যায়। প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রামের বেলাতেও ঠিক একই ব্যাপার। এই সংগ্রামকে কাগজপত্রে স্বীকার করা হচ্ছে, কারণ এর অস্তিত্ব আর অস্বীকার করার উপায় নেই; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে একে চেপে যাওয়া হচ্ছে, জোলো করে দেওয়া হচ্ছে, পাতলা করে দেওয়া হচ্ছে। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির পক্ষে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি হওয়া **চলবে না,** বুর্জোয়াদের অথবা অন্য কারও ঘৃণা অর্জন করা তার চলবে না; তার কাজ হবে সর্বোপরি বুর্জোয়াদের মধ্যে জোরালো প্রচার চালানো। যে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যগুলি দেখে বুর্জোয়ারা ভয় পায় এবং যেগুলি হাজার হোক আমাদের জীবদ্দশায় তো আর লাভ করা যাবে না, সেগুলির উপর জোর না দিয়ে বরং জোর দেওয়া উচিত পেটি বুর্জোয়া জোড়াতালি দেওয়া সংস্কারের উপর, যা পুরাতন সমাজব্যবস্থার পেছনে নতুন ঠেকা দিয়ে হয়তো অন্তিম চূড়ান্ত বিপর্যয়কে ক্রমে ক্রমে একটু একটু করে যথাসম্ভব শান্তিপূর্ণ অবলুপ্তির পদ্ধতিতে পরিণত করতে পারবে। এঁরা হলেন ঠিক সেই সব লোক যাঁরা কাজের তাড়ায় ডুবে থাকার ভাব দেখিয়ে শুধু নিজেরাই যে কিছু করছেন না তাই নয়, বাগাড়ম্বর ছাড়া আদৌ আর কিছু ঘটতে না দেবার জন্য চেষ্টিত; সেই একই লোক যে-কোনো-প্রকার সংগ্রামেই যাঁদের ভয়, ১৮৪৮ ও ১৮৪৯ সালের আন্দোলনকে যাঁরা প্রতিপদে বাধা দেন ও শেষ পর্যন্ত তার পতন ঘটান; সেই একই লোক যাঁরা কখনো প্রতিক্রিয়াশক্তিকে দেখতে পান না এবং পরে হতচকিত হয়ে আবিষ্কার করেন যে শেষ পর্যন্ত নিজেরাই এখন এক অন্ধ গলিতে আটকা পড়েছেন যেখান থেকে প্রতিরোধও সম্ভব নয়, পলায়নও সম্ভব নয়; সেই একই লোক যাঁরা নিজেদের সংকীর্ণ কূপমণ্ডূক চক্রবালে ইতিহাসকে আটকে রাখতে চান আর এঁদের মাথার উপর দিয়ে অনিবার্যভাবেই ইতিহাস এগিয়ে যায় তার যাত্রা পথে।

এঁদের সমাজতান্ত্রিক মত-বিশ্বাসের যথেষ্ট সমালোচনা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারের' 'জার্মান অথবা "খাঁটি" সমাজতন্ত্র'* সম্পর্কিত

* বর্তমান সংস্করণের প্রথম খণ্ডের প্রথম অংশের পৃঃ ৪৯ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

অধ্যায়ে। শ্রেণী-সংগ্রামকে যেখানে অপ্রীতিকর 'অমার্জিত' ব্যাপার বলে সরিয়ে রাখা হয়, সেখানে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে 'প্রকৃত মানবপ্রেম' এবং 'ন্যায়' সম্পর্কে শূন্য বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কিছু থাকে না।

এযাবৎ যেসব শ্রেণী শাসক-শ্রেণী হয়ে এসেছে তাদের থেকে লোক এসে জঙ্গী প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে যোগ দেবে এবং তাদের শিক্ষাদানের কাজ করবে, এটা এমন এক অনিবার্য ঘটনা যার মূল বিকাশধারার মধ্যেই নিহিত। 'ইশতেহারে' একথা আমরা স্পষ্টভাবেই বলেছি। কিন্তু এখানে দুটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে।

প্রথমত, প্রলেতারীয় আন্দোলনের কাজে লাগতে হলে সত্যিকারের শিক্ষামূলক উপাদান এদের নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু জার্মান বুর্জোয়া নবদীক্ষিতদের সুবিপুল অধিকাংশের বেলাতেই ব্যাপারটা অন্যরূপ দাঁড়িয়েছে। *Zukunft* কিম্বা *Neue Gesellschaft** এদের কেউই এমন কোনো অবদান যোগ করেনি, যা আন্দোলনকে এক পাও এগিয়ে নিয়ে গেছে। সেখানে তথ্য ও তত্ত্ব উভয় দিক থেকেই প্রকৃত শিক্ষাদানের মালমসলার একান্ত অভাব। তার পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যত্র থেকে এই ভদ্রলোকেরা নানা বিভিন্ন ধরনের যেসব তাত্ত্বিক মত নিয়ে এসেছেন -- জার্মান দর্শনের হতাবশিষ্টের বর্তমান পচনের ফলে যেগুলি সবই সমান বিভ্রান্ত তার সঙ্গে চেষ্টা হচ্ছে ভাসাভাসাভাবে আয়ত্ত করা সমাজতান্ত্রিক ভাবধারাগুলিকে খাপ খাওয়ানোর। প্রথমে নিজেরা নূতন বিজ্ঞানটিকে গভীরভাবে অনুধাবন না করে তাঁদের প্রত্যেকেই সঙ্গে-করে-আনা নিজের মতের মতো করে একে ছেঁটে কেটে নিয়েছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গেই একটি নিজস্ব ব্যক্তিগত বিজ্ঞান তৈরি করে ফেলেছেন এবং কালবিলম্ব না করে এগিয়ে এসেছেন সেই বিজ্ঞান শিক্ষাদানের বড়াই করে। তাই এই ভদ্রলোকদের যতগুলি মাথা, ঠিক প্রায় ততগুলিই মতবাদ। একটি ক্ষেত্রেও স্বচ্ছতা সৃষ্টির পরিবর্তে তাঁরা শুধু উৎকট বিভ্রান্তিরই সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তা প্রায় একান্তভাবে তাঁদের নিজেদের মধ্যেই। যেসব শিক্ষাদাতার প্রথম নীতি হচ্ছে, তাঁরা নিজে যা শেখেননি তাই শেখানো, তাঁদেব বাদ দিয়ে পার্টি ভালোই চলতে পারে।

দ্বিতীয়ত, যদি অন্যান্য শ্রেণী থেকে এই ধরনের লোক প্রলেতারীয় আন্দোলনে যোগদান করেন, তবে তার প্রথম শর্ত হবে এই যে, বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া ইত্যাদি কুসংস্কারের অবশেষ তাঁরা সঙ্গে করে আনতে পারবেন না এবং মনে প্রাণে তাঁদের

---

* *Zukunft* (ভবিষ্যৎ) এবং *Neue Gesellschaft* (নতুন সমাজ) — সমাজতন্ত্রী-সংস্কারপন্থী দুখানি পত্রিকা। প্রথমটি ১৮৭৭-৮০ সালে জুরিখে এবং দ্বিতীয়টি ১৮৭৭-৭৮ সালে বার্লিনে প্রকাশিত হয়েছিল। — সম্পাঃ

প্রলেতারীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতেই হবে। কিন্তু, দেখা গেল যে, এই ভদ্রলোকেরা বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া ভাবধারায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। জার্মানির মতো পেটি-বুর্জোয়া দেশে এই ভাবধারাগুলির নিশ্চয়ই যৌক্তিকতা আছে, কিন্তু সে কেবল সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির **বাইরে**। নিজেদের নিয়ে একটি সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পেটি-বুর্জোয়া পার্টি গঠন করার সম্পূর্ণ অধিকার এই ভদ্রলোকদের আছে। তখন তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা যেতে পারে, অবস্থা অনুযায়ী জোট গঠন করাও যেতে পারে ইত্যাদি। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিতে এঁরা হলেন ভেজাল বস্তু। যদি আপাতত তাঁদের বরদাস্ত করার কোনো কারণ থাকে, তবে কর্তব্য **শুধু** বরদাস্তই করা, পার্টি নেতৃত্বে তাঁদের কোনো প্রভাব থাকতে না দেওয়া এবং অবহিত থাকা যে, একসময় তাঁদের সঙ্গে বিচ্ছেদ অবধারিত। তাছাড়া, সেই সময় মনে হয় এসে গেছে। এই প্রবন্ধের লেখকদের পার্টির অভ্যন্তরে থাকা পার্টি এখনো কী ভাবে সহ্য করে যেতে পারে সেটা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু পার্টি-নেতৃত্বও যদি কমবেশী এই ধরনের লোকের হাতে পড়ে, তাহলে পার্টি সোজাসুজি নপুংসক হয়ে যাবে, তার প্রলেতারীয় পৌরুষ একেবারেই যাবে।

আমাদের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, আমাদের সমগ্র অতীত বিবেচনা করে আমাদের সম্মুখে একটি পথই খোলা রয়েছে। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে আমরা এই জোর দিয়ে আসছি যে, শ্রেণী-সংগ্রামই ইতিহাসের আশু চালিকাশক্তি এবং বিশেষ করে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যকার শ্রেণী-সংগ্রাম আধুনিক সমাজবিপ্লবের বিশাল চালক-দণ্ডস্বরূপ। অতএব, যাঁরা আন্দোলন থেকে এই শ্রেণী-সংগ্রামকে বর্জন করতে চান তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আন্তর্জাতিক যখন গঠিত হয়েছিল, তখন পরিষ্কার করেই আমরা এই রণধ্বনি সূত্রবদ্ধ করেছিলাম: শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তিসাধন হওয়া চাই শ্রমিক শ্রেণীর নিজের কাজ। অতএব, যাঁরা খোলাখুলিই বলেন, নিজেদের মুক্ত করার মতো শিক্ষাদীক্ষা শ্রমিকদের নেই, উপর থেকে, মানবদরদী বড় বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়াদের সাহায্যে তাদের মুক্ত করতে হবে, তাঁদের সঙ্গে আমরা সহযোগিতা করতে পারি না। যদি পার্টির নূতন মুখপত্র এই ভদ্রলোকদের মতামতের অনুরূপ একটা ধারা গ্রহণ করে, যদি তা প্রলেতারীয় না হয়ে বুর্জোয়া হয়, তাহলে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে হলেও এর সঙ্গে আমাদের বিরোধিতা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা এবং এযাবৎ আমরা বিদেশে জার্মান পার্টির প্রতিনিধিত্ব করেছি যে সংহতি নিয়ে, আপনাদের সঙ্গে সে সংহতি ভেঙ্গে দেওয়া ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর থাকবে না। তবে আশা করি ব্যাপারটা **অতদূর** গড়াবে না...

ক. শ্মিদ সমীপে এঙ্গেলস

লণ্ডন, ৫ই আগস্ট, ১৮৯০

...মরিৎস ভির্থ নামক সেই অশুভ জীবটির লেখা পাউল বার্তের বইয়ের* একটি সমালোচনা ভিয়েনার *Deutsche Worte* পত্রিকায় পড়লাম এবং **এই** সমালোচনা পড়ে বইটি সম্পর্কেও আমার মনে একটা খারাপ ধারণা হয়ে গেল। বইখানি আমায় দেখতে হবে, কিন্তু ক্ষুদে মরিৎস একথা যদি বার্ত থেকে সঠিকভাবেই উদ্ধৃত করে থাকেন যে, মার্কসের রচনাবলীতে বৈষয়িক অবস্থার উপর দর্শন ইত্যাদির নির্ভরশীলতার একমাত্র দৃষ্টান্ত তিনি যা পেয়েছেন সেটা এই যে, ডেকার্টেস প্রাণীদের যন্ত্র বলে ঘোষণা করেছেন, তাহলে এই ধরনের কথা যে লোক লিখতে পারে তার জন্য আমি দুঃখিত। এই ব্যক্তি যদি এখনো দেখতে পেয়ে না থাকেন যে, অস্তিত্বের বৈষয়িক শর্ত আদিকারণ হলেও, তাতে তার উপর ভাবাদর্শগত ক্ষেত্রগুলির প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে আটকায় না, যদিও সে প্রতিক্রিয়ার ফলটা গৌণ, তাহলে তিনি যা নিয়ে লিখছেন সেই বিষয়টিই কিছু বুঝতে পারেননি। অবশ্য, আমি পূর্বেই বলেছি এটা হল আমার পরের মুখে ঝাল খাওয়া, এবং ক্ষুদে মরিৎস এক বিপজ্জনক বন্ধু। ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার এ রকম বন্ধু আজকাল অনেক, যাদের কাছে এটা ইতিহাস **না** পড়ার একটা অজুহাত সৃষ্টি করে দিয়েছে। ঠিক যেমন অষ্টম দশকের শেষদিকের ফরাসী 'মার্কসবাদীদের' সম্পর্কে মার্কস বলতেন, 'আমি যতটুকু জানি তা হল এই যে, আমি মার্কসবাদী নই।'

ভবিষ্যৎ সমাজে উৎপন্ন দ্রব্যের বণ্টন কী রূপ হবে, সম্পন্ন কাজের পরিমাণ অনুযায়ী হবে, না অন্য কোনরূপ হবে, এ নিয়ে *Volks-Tribüne* পত্রিকায় একটি আলোচনা হয়েছে। ন্যায় সম্পর্কিত কতকগুলি ভাবাদর্শগত বুলির পাল্টা হিসাবে অত্যন্ত 'বস্তুবাদীভাবেই' প্রশ্নটি আলোচিত হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, একথা কারও মনে হয়নি যে, শেষ পর্যন্ত তো বণ্টনের পদ্ধতি মূলত নির্ভর করে বণ্টন করার মতো জিনিস **কী পরিমাণ** আছে তার উপর এবং উৎপাদনের ও সামাজিক সংগঠনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই পরিমাণেরও অবশ্যই পরিবর্তন হয়, যার ফলে বণ্টনের পদ্ধতিরও পরিবর্তন হবে। কিন্তু যাঁরা এই আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের কারো মনে হয়নি যে, 'সমাজতান্ত্রিক সমাজ' অবিরাম পরিবর্তনশীল ও অগ্রগতিশীল, মনে হয়েছে যেন তা চিরকালের মতো স্থির নির্দিষ্ট একটি ব্যাপার এবং সেইজন্যই সেখানে চিরদিনের

* পাউল বার্তের লেখা *Die Geschichtsphilosophie Hegels und der Hegelianer bis auf Marx und Hartmann* (হেগেলের ও মার্কস ও হার্টমান পর্যন্ত হেগেলপন্থীদের ইতিহাসের দর্শন) বইয়ের কথা হচ্ছে। — সম্পাঃ

মতো স্থির নির্দিষ্ট একটি বণ্টন-ব্যবস্থা থাকবে। অবশ্য, যেটুকু যুক্তিযুক্তভাবে করা যায় তা হচ্ছে এই যে, ১) **শুরুতে** বণ্টনের পদ্ধতি কী হবে তা নির্ধারণের চেষ্টা এবং ২) পরবর্তী বিকাশ কী ভাবে চলবে তার সাধারণ **ঝোঁকটি** নির্ধারণের চেষ্টা। কিন্তু এ সম্পর্কে একটি কথাও সারা বিতর্কের মধ্যে চোখে পড়ল না।

সাধারণভাবে 'বস্তুবাদী' কথাটি জার্মানির বহু তরুণ লেখকের কাছে এমন একটা 'বুলিতে' পর্যবসিত হয়েছে যে, আর কিছু অধ্যয়ন না করেই যা খুশী তাইতে তাঁরা এই লেবেল এ'টে দিচ্ছেন, অর্থাৎ এই লেবেল এ'টে দিয়ে ভাবছেন সমস্যা মিটে গেল। কিন্তু ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা সেটা হল সর্বোপরি অধ্যয়নের দিকদর্শন মাত্র, হেগেলপন্থা ধরনে ছক নির্মাণের হাতল নয়। সমস্ত ইতিহাসকে নূতনভাবে অধ্যয়ন করতে হবে, সমাজের বিভিন্ন গঠনরূপ থেকে তাদের অনুযায়ী রাজনৈতিক, আইনগত, নন্দনতাত্ত্বিক, দার্শনিক, ধর্মীয় ইত্যাদি ধ্যানধারণা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসার আগে, ঐ গঠনরূপগুলির অস্তিত্বের অবস্থা বিশদরূপে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এ পর্যন্ত এ ব্যাপারে এখানে বিশেষ কিছু করা হয়নি, কারণ খুব কম লোকই গুরুত্বসহকারে এ কাজে হাত দিয়েছেন। এক্ষেত্রে প্রভূত পরিমাণ সাহায্য আমাদের দরকার, ক্ষেত্র বিশাল, এবং যদি কেউ গুরুত্বসহকারে কাজ করেন তাহলে তিনি প্রচুর সাফল্য লাভ করতে পারেন ও খ্যাতিমান হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু তা না করে বহু তরুণ জার্মান শুধু 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' কথাটি ব্যবহার করছেন (**সবকিছুই** তো কথায় পরিণত করা যায়) এই জন্য, যাতে ইতিহাস সম্পর্কে নিজেদের যে আপেক্ষিকভাবে সামান্য জ্ঞান আছে তা দিয়ে (অর্থনৈতিক ইতিহাসের ত এখনো শৈশবাবস্থা!) যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি একটি ফিটফাট ব্যবস্থা তৈরি করে এবং তারপর নিজেদের কেউকেটা বলে ভাবা যায়। তারপর বার্তের মতো কেউ এসে মূল বস্তুটিকেই আক্রমণ করে বসবে, যা তাঁর মহলে মাত্র একটা 'কথায়' পর্যবসিত করা হয়েছে।

এসবকিছুই অবশ্য ঠিক হয়ে যাবে। জার্মানিতে এখন অনেক কিছু সহ্য করার মতো যথেষ্ট শক্তি আমাদের আছে। সোশ্যালিস্ট বিরোধী আইন আমাদের পক্ষে অন্যতম একটা মস্ত কাজ করে দিয়েছে এই যে, সমাজতন্ত্রের ছোপ লাগা জার্মান 'ছাত্রের' অনধিকারচর্চার হাত থেকে তা আমাদের মুক্তি দিয়েছিল। জার্মান ছাত্রটি আবার নিজেকে বড় গলায় জাহির করছেন, কিন্তু তাঁকে হজম করার মতো শক্তি আমরা এখন রাখি। আপনারা যাঁরা সত্যিই কিছু করেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন, পার্টির মধ্যে এসেছেন এমন তরুণ লেখকদের ক'জনই বা অর্থনীতি, অর্থনীতির ইতিহাস, বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষির ইতিহাস, সমাজের গঠনের ইতিহাস অধ্যয়ন করার কষ্ট করেন! ক'জন বা মাউরারের নামটুকু ছাড়া আর কিছু জানেন? এখানে সাংবাদিকের ঔদ্ধত্যেই সবকিছু জয় করা চাই, এবং ফলও তেমনই ফলছে। প্রায়ই মনে হয়, এই

ভদ্রলোকদের ধারণা, শ্রমিকদের বেলায় সবকিছুই চলে। এই ভদ্রলোকেরা জানলে পারতেন কী ভাবে মার্কস তাঁর সবচেয়ে ভাল জিনিষও শ্রমিকদের পক্ষে যথেষ্ট ভাল বলে মনে করতেন না এবং সবচেয়ে ভাল ছাড়া অন্য কিছু শ্রমিকদের দেওয়াকে কী ভাবে মার্কস অপরাধ বলে মনে করতেন!.

ই. ব্লক সমীপে এঙ্গেলস

লণ্ডন, ২১—২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯০

...ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা অনুসারে বাস্তব জীবনের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনই হচ্ছে ইতিহাসে **শেষ পর্যন্ত** নির্ধারক বস্তু। এর বেশী কিছু মার্কস বা আমি কখনো বলিনি। অতএব, কেউ যদি তাকে বিকৃত করে এই দাঁড় করায় যে, অর্থনৈতিক ব্যাপারই হচ্ছে **একমাত্র** নির্ধারক বস্তু, তাহলে সে প্রতিপাদ্যটিকে একটি অর্থহীন, অমূর্ত, নির্বোধ উক্তিতে পরিণত করে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি হল ভিত্তি, কিন্তু উপরিকাঠামোর বিভিন্ন বস্তু যেমন, শ্রেণী-সংগ্রামের রাজনৈতিক রূপগুলি এবং তার ফলাফল: সাফল্যমণ্ডিত সংগ্রামের পর বিজয়ী শ্রেণী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংবিধান ইত্যাদি, বিচার ব্যবস্থা, এমনকি যোগদানকারীদের মস্তিষ্কে এই সমস্ত বাস্তব সংগ্রামের প্রতিফলন, রাজনৈতিক, আইনগত, দার্শনিক তত্ত্বাবলী, ধর্মীয় মতামত এবং ক্রমে সেগুলির আপ্তবাক্যে পরিণতি, এসবও ঐতিহাসিক সংগ্রামগুলির গতিকে প্রভাবিত করে এবং বহুক্ষেত্রে তাদের **রূপ** নির্ধারণে প্রধান হয়ে ওঠে। এদের সকলের একটি পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রয়েছে যেখানে অসংখ্য আকস্মিকতার মধ্যে (অর্থাৎ এমন সব বস্তু ও ঘটনার মধ্যে, যাদের অন্তঃসম্পর্ক এত ক্ষীণ কিম্বা এত প্রমাণাসাধ্য যে তা অবিদ্যমান অথবা উপেক্ষণীয় বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে) অর্থনৈতিক আন্দোলন শেষ পর্যন্ত আবশ্যিক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। অন্যথায়, পছন্দ মতো ইতিহাসের যে কোনো আমল সম্পর্কে তত্ত্ব প্রয়োগ করা প্রথম ডিগ্রীর সরল সমীকরণের সমাধানের চেয়েও সহজ হত।

আমরা নিজেরাই আমাদের ইতিহাস সৃষ্টি করি, কিন্তু সৃষ্টি করি সর্বাগ্রে অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট কতকগুলি পূর্বস্থিতি ও অবস্থার মধ্যে। এদের মধ্যে অর্থনৈতিক পূর্বস্থিতি ও অবস্থাই শেষ পর্যন্ত নির্ধারক হয়। কিন্তু রাজনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি, এমনকি মানবমনকে আচ্ছন্ন করে থাকে যে ঐতিহ্য, তাও একটা ভূমিকা গ্রহণ করে, যদিও সে ভূমিকা নির্ধারক নয়। প্রুশীয় রাষ্ট্রও ঐতিহাসিক ও শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক কারণ থেকেই উদ্ভূত হয়ে বিকশিত হয়েছিল। কিন্তু খামোকা পাণ্ডিত্য জাহির করার ইচ্ছা

না থাকলে একথা কিছুতেই বলা যায় না যে, উত্তর জার্মানির বহু ছোট ছোট রাষ্ট্রের মধ্যে ব্রান্দেনবুর্গই যে উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের অর্থনীতিগত, ভাষাগত এবং এমনকি রিফর্মেশনের পর, ধর্মগত পার্থক্যের প্রতীকরূপ একটি বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়েছিল তা অর্থনৈতিক প্রয়োজনের দ্বারাই বিশেষভাবে নির্ধারিত হয়েছিল, এবং তার পেছনে আর কোনো উপাদান ছিল না (যথা, সর্বোপরি, প্রাশিয়া দখলে থাকায় পোল্যান্ডের সঙ্গে ব্রান্দেনবুর্গের জড়িয়ে পড়া এবং কাজে কাজেই আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সম্পর্কের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া, যা অস্ট্রীয় রাজবংশগত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায়ও চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছিল)। জার্মানির অতীতের ও বর্তমানের প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অস্তিত্ব অথবা সেই উত্তর জার্মানির ব্যঞ্জনধ্বনির অভিশ্রুতির উদ্ভব যা সুদোতিক পর্বতমালা থেকে তাউনাস পর্যন্ত বিস্তৃত পাহাড় দ্বারা গঠিত ভৌগোলিক বিভাগপ্রাচীরকে আরও বিস্তৃত করে তুলে সারা জার্মানিব্যাপী একটি রীতিমতো ফাটল সৃষ্টি করেছিল, নিজেকে হাস্যকর করে না তুলে অর্থনীতি দ্বারা এসবের ব্যাখ্যা করতে যাওয়া খুবই মুশকিল।

দ্বিতীয়ত, ইতিহাস এমনভাবেই সৃষ্টি হয় যাতে চূড়ান্ত ফলাফল সর্বদা বহু ব্যক্তিগত ইচ্ছার সংঘাত থেকে উদ্ভূত হয় এবং এই ইচ্ছার প্রত্যেকটি আবার জীবনের বেশ কতকগুলি বিশেষ অবস্থার দ্বারা গঠিত। এইভাবে অসংখ্য পরস্পর ছেদনকারী শক্তি রয়েছে, রয়েছে শক্তির অসংখ্য সামন্তরিক ক্ষেত্রের ধারা এবং এদেরই মধ্যে থেকেই উদ্ভূত হয় একটি সাধারণ ফল — ঐতিহাসিক ঘটনা। একে আবার এমন একক একটি শক্তির সঞ্জাত ফল বলেও ধরে নেওয়া যেতে পারে, যা সামগ্রিক হিসাবে **অচেতন** ও ইচ্ছাশক্তিহীনভাবে কাজ করে। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তি যা চায় অপর প্রত্যেক ব্যক্তি তাতে বাধা দেয় এবং ফলাফল দাঁড়ায় এমন কিছু, যা কেউই চায়নি। এইভাবে অতীত ইতিহাস একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ারূপেই চলে এবং মূলত একই গতির নিয়মাবলীর অধীন। যদিও ব্যক্তিগত ইচ্ছা প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শারীরিক গঠন এবং বাহিরের, শেষ পর্যন্ত, অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা (নিজের ব্যক্তিগত অবস্থা বা সাধারণভাবে সমাজের অবস্থা) প্রণোদিত হয় এবং নিজ নিজ ঈপ্সিত বস্তু লাভ করতে পারে না বরং একটি যৌথ গড়ে একটি সাধারণ লব্ধিতে পরিণত হয়, তাই বলে কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কিছুতেই করা চলে না যে, তাদের মূল্য শূন্য। বরঞ্চ লব্ধ ফলে প্রত্যেকটি ইচ্ছারই অবদান রয়েছে এবং সেই পরিমাণে সেগুলি তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

এই তত্ত্বটিকে অপরের মুখ থেকে না শুনে মূল উৎস থেকে অনুশীলন করার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করছি। সত্যই সেটা অনেক বেশী সোজা। মার্কস এমন কিছুই লেখেননি, যার মধ্যে এ তত্ত্বের ভূমিকা নেই। কিন্তু, বিশেষ করে 'লুই বোনাপার্টের

আঠারোই ব্রুমেয়ার'* এই তত্ত্বপ্রয়োগের সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। 'পুঁজি' গ্রন্থের মধ্যেও এর বহু নিদর্শন রয়েছে। আমি আপনাকে আমার এই লেখাগুলিও পড়তে বলব: 'শ্রী ও ডুরিং-এর বিজ্ঞানে বিপ্লব' ও 'লুদভিগ ফয়েরবাখ এবং চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান'।** সেখানে আমি ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিশদতম বিবরণ যতটা বর্তমান বলে আমি জানি তা উল্লেখ করেছি।

তরুণেরা যে অনেক সময় অর্থনৈতিক দিকের উপর যতখানি উচিত তার চেয়ে বেশী জোর দিয়ে থাকেন, তজ্জন্য মার্কস ও আমি, আমরা নিজেরাই কিছুটা দায়ী। আমাদের প্রতিপক্ষীয়েরা অস্বীকার করতেন বলেই তাঁদের বিপরীতে অর্থনৈতিক দিকটির উপর আমাদের জোর দিতে হয়েছিল। পারস্পরিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দিকগুলিকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়ার মতো সময়, স্থান বা সুযোগ আমরা পাইনি। কিন্তু ইতিহাসের কোনো যুগকে উপস্থিত করার প্রশ্ন যখন এসেছে, অর্থাৎ বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রশ্ন যখন এসেছে, তখন অন্যকথা, এবং কোনো ভুল হবার সম্ভাবনা থাকেনি। দুর্ভাগ্যক্রমে, অবশ্য, প্রায়ই দেখা যায় যে, লোকে ভাবে, তারা একটি নতুন তত্ত্ব বুঝে ফেলেছে এবং ঐ তত্ত্বের প্রধান প্রধান নীতিগুলি আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই, এমনকি অনেকসময় ভুলভাবে আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই, বিনাদ্বিধাসংকোচে তত্ত্বটিকে প্রয়োগ করতে তারা সক্ষম। হালে যাঁরা 'মার্কসবাদী' হয়েছেন তাঁদের অনেককেই আমি এই সমালোচনা থেকে রেহাই দিতে পারি না, কারণ এর দৌলতেও অতি আশ্চর্য রকমের আবর্জনা সৃষ্টি হয়েছে ...

ক. শ্মিদ সমীপে এঙ্গেলস

লণ্ডন, ২৭শে অক্টোবর, ১৮৯০

অবসর পাওয়ামাত্রই আপনার চিঠির জবাব দিতে বসেছি। আমার মনে হয়, *Züricher Post*-এ চাকুরি নেওয়াটাই আপনার পক্ষে খুব ভাল হবে। আপনি সেখানে অর্থনীতি সম্পর্কে অনেক কিছুই শিখতে পারবেন, বিশেষত যদি একথা মনে রাখেন যে, জুরিখ একটি তৃতীয় শ্রেণীর টাকার বাজার ও ফাটকাবাজার, অতএব এখানে যেসব ধারণা জন্মায় সেগুলি আবার দু দফা বা তিন দফা প্রতিফলনে ক্ষীণ কিম্বা ইচ্ছা করে বিকৃত। কিন্তু ব্যাপারটা কী ভাবে চলে সে সম্পর্কে আপনি ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ

* এই সংস্করণের প্রথম খণ্ডের প্রথম অংশের পৃঃ ২৩৬-৩৩৯ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

** এই অংশের পৃঃ ৪১-৮৫ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

করবেন এবং লন্ডন, নিউ ইয়র্ক, প্যারিস, বার্লিন, ভিয়েনা ইত্যাদির শেয়ার বাজারের আনকোরা রিপোর্ট লক্ষ্য করে যেতে বাধ্য হবেন। এতে করে টাকা ও শেয়ার-বাজার-রূপ প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে বিশ্ববাজার আপনার কাছে প্রকট হবে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রতিফলন ঠিক মানুষের চোখের প্রতিফলনের মতো — কনডেন্সিং-লেন্সের মধ্য দিয়ে যায় বলে প্রতিফলনগুলিকে সেখানে ঠিক উল্টা, অর্থাৎ মাথার উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় দেখা যায়। অভাব কেবলমাত্র স্নায়ুযন্ত্রটিরই, যা প্রতিফলনটিকে আবার সোজা করে পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে দেবে। টাকার বাজারের মানুষ শিল্পের গতি ও বিশ্ববাজারকে শুধুমাত্র টাকার বাজার ও শেয়ার বাজারের উল্টা প্রতিফলন রূপেই দেখতে পায়, তাই কার্য তার কাছে কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পঞ্চম দশকেই ম্যাঞ্চেস্টারে আমি এ ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলাম; শিল্পের গতি এবং তার পর্যায়িক সর্বোচ্চতা ও সর্বনিম্নতা বুঝবার পক্ষে লন্ডনের শেয়ার বাজারের রিপোর্টগুলি কোনো কাজেই আসত না, কারণ এই ভদ্রলোকেরা সবকিছুই টাকার বাজারের সংকট দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করতেন, অথচ সেগুলি সাধারণত হল তার লক্ষণ মাত্র। তখন লক্ষ্য ছিল শিল্পসংকটগুলির মূল কারণ যে সাময়িক অতিউৎপাদন নয়, এইটেই প্রমাণ করা। ফলে একটা পক্ষপাতমূলক ঝোঁকও দেখা দিত, যা থেকে আসত বিকৃতিসাধনের প্ররোচনা। এই লক্ষ্য এখন আর নেই, অন্তত আমাদের কাছে চিরদিনের মতো বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তার উপর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, টাকার বাজারেরও নিজস্ব সংকট থাকতে পারে, যাতে শিল্পের প্রত্যক্ষ বিশৃঙ্খলার ভূমিকা গৌণ মাত্র অথবা তার কোনো ভূমিকাই নেই। এখানে, বিশেষ করে গত বিশ বছরের ইতিহাসে এখনও প্রতিষ্ঠিত ও পরীক্ষিত করার মতো অনেক কিছু আছে।

শ্রমবিভাগ যেখানে সামাজিক ভিত্তিতে আছে সেখানে বিভিন্ন শ্রমপ্রক্রিয়া পরস্পরের থেকে স্বাধীন হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত উৎপাদনই নির্ধারক বস্তু। কিন্তু যে মুহূর্তে খাস উৎপাদন থেকে উৎপন্নের বাণিজ্যটা স্বতন্ত্র হয়ে যায়, সেই মুহূর্ত থেকে সে তার নিজস্ব গতি অনুসরণ করে চলে এবং সেই গতি সমগ্রভাবে উৎপাদনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এবং এই সাধারণ নিয়ন্ত্রণের চৌহদ্দির মধ্যে তা নিজস্ব কতকগুলি নিয়ম মেনে চলে, যা নতুন উপাদানটির চরিত্রের মধ্যেই নিহিত। এই গতির কতকগুলি নিজস্ব পর্যায় আছে, তা আবার উৎপাদনের গতির উপরও পাল্টা প্রতিক্রিয়া ঘটায়। আমেরিকা আবিষ্কারের কারণ স্বর্ণলোভ, যা ইতিপূর্বেই পর্তুগীজদের আফ্রিকায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল (স্যেতবের লিখিত 'মহার্ঘ ধাতুর উৎপাদন' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য), কারণ ১৪৫০ সাল থেকে ১৫৫০ সাল রৌপ্যের বিপুল দেশ জার্মানি চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকের বিপুলভাবে বিকশিত ইউরোপীয় শিল্প ও তদনুযায়ী বাণিজ্যের বিনিময়-মাধ্যম জোগাতে পারেনি। ১৫০০ থেকে ১৮০০ সাল

অবধি পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজরা যে ভারত জয় করে তার লক্ষ্য ছিল ভারত **থেকে আমদানি** — সেখানে কিছু রপ্তানি করার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। অথচ একমাত্র বাণিজ্যের স্বার্থে ঘটিত এই সব আবিষ্কার ও বিজয়ের কী বিপুল প্রতিক্রিয়াই না ঘটে শিল্পের উপর: বৃহদায়তন শিল্পের সৃষ্টি ও বিকাশ হয় কেবল এই সব দেশে **রপ্তানির** প্রয়োজন থেকে।

টাকার বাজারের বেলাতেও তাই। টাকার বাণিজ্য যেই পণ্যের বাণিজ্য থেকে পৃথক হয়ে যায়, তখন থেকেই উৎপাদন ও পণ্যবাণিজ্য কর্তৃক আরোপিত কতকগুলি শর্তাধীনে এবং সেই চৌহদ্দির মধ্যে, টাকার বাণিজ্যের একটা নিজস্ব বিকাশ ঘটতে থাকে, তার নিজস্ব প্রকৃতি কর্তৃক নির্দিষ্ট বিশেষ নিয়মাবলী ও পর্যায় দেখা দেয়। এর সঙ্গে যদি আরো যোগ করা যায় যে, টাকার বাণিজ্য কিছুটা বিকাশ লাভ করার পর সিকিউরিটির বাণিজ্যও তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে এবং সে সিকিউরিটিগুলো শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় বন্ড নয় শিল্প ও পরিবহণের স্টকও বটে, ফলে উৎপাদনের একাংশের উপর টাকার বাণিজ্য প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ লাভ করে, যদিও সামগ্রিক বিচারে উৎপাদনের দ্বারা সে নিজেই নিয়ন্ত্রিত, -- তাহলে উৎপাদনের উপর টাকার বাণিজ্যের প্রতিক্রিয়া আরও জোরালো ও আরও জটিল হয়ে ওঠে। টাকার কারবারীরা রেলপথ, খনি ইত্যাদির মালিক। এই উৎপাদন-উপায়গুলির দুইটি দিক দেখা দেয়: তাদের কাজ চালাতে হয় কখনো কখনো প্রত্যক্ষ উৎপাদনের স্বার্থে, কখনো কখনো আবার টাকার কারবারীরূপে শেয়ার হোল্ডারদের প্রয়োজনে। এর সবচেয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে উত্তর আমেরিকার রেলপথগুলি। জনৈক জেই গুল্ড, অথবা ভান্দেরবিল্ট-এর মতো ব্যক্তির শেয়ার বাজারী ক্রিয়াকলাপের উপর এদের পরিচালনার কাজ নির্ভর করে; আর সংশ্লিষ্ট রেলপথটি এবং যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে তার স্বার্থের সঙ্গে এই সব ক্রিয়াকলাপের কোনো সংশ্রবই নেই। এমনকি, এখানে ইংলন্ডেও আমরা দশকের পর দশক ধরে বিভিন্ন রেল কোম্পানীর মধ্যে নিজ নিজ এলাকার সীমানা নিয়ে সংঘর্ষ চলতে দেখেছি — যাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছে উৎপাদন ও পরিবহণ ব্যবস্থার স্বার্থে নয়, নিতান্তই সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য, টাকার কারবারী শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার-বাজারী ক্রিয়াকলাপে সাহায্য করাই যার একমাত্র উদ্দেশ্য।

উৎপাদনের সঙ্গে পণ্যবাণিজ্যের সম্পর্ক এবং টাকার বাণিজ্যের সঙ্গে উভয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমার ধারণার এই যে কিছু ইঙ্গিত দিলাম, এর মধ্যেই সাধারণভাবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে আপনার প্রশ্নগুলিরও মূলত জবাব দেওয়া হয়ে গেল। শ্রমবিভাগের দিক থেকে বিষয়টিকে বোঝা সবচেয়ে সহজ। সমাজে এমন কতকগুলি সাধারণ কাজের উদ্ভব হয়, যা ছাড়া তার চলে না। এই উদ্দেশ্যে যেসব লোক নিয়োগ করা হয় তারা **সমাজের অভ্যন্তরে** শ্রমবিভাগের একটি নূতন শাখা হয়ে দাঁড়ায়। এতে

তাদের বিশেষ স্বার্থের সৃষ্টি হয়, যে স্বার্থ যাদের নিকট থেকে তারা ভারপ্রাপ্ত হয়েছে তাদের স্বার্থ থেকেও স্বতন্ত্র; তারা শেষোক্তদের অধীনতা থেকে নিজেদের স্বাধীন করে নেয় — এবং এইভাবে রাষ্ট্র গড়ে উঠতে থাকে। তখন, পণ্যবাণিজ্যে ও পরে টাকার বাণিজ্যে যে প্রক্রিয়া চলে, অনুরূপ প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। নূতন স্বাধীন শক্তিকে প্রধানত উৎপাদনের গতি প্রকৃতিকে অনুসরণ করতে হয় বটে, তথাপি সে আবার তার অন্তর্নিহিত আপেক্ষিক স্বাধীনতা বলে অর্থাৎ একবার প্রদত্ত ও পরে ক্রমশ বর্ধিত এই আপেক্ষিক স্বাধীনতা বলে উৎপাদনের অবস্থা ও গতিপ্রকৃতির উপর ক্রিয়া করে। এ হচ্ছে দুটি অসম শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া: একদিকে অর্থনৈতিক গতি এবং অপরদিকে নূতন রাজনৈতিক শক্তি, যা যতখানি সম্ভব স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করে এবং একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে যা নিজস্ব একটা গতিও লাভ করে। সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক গতিটা পথ করে নেয় বটে, কিন্তু তাকেও সইতে হয় সেই রাজনৈতিক গতির প্রতিক্রিয়া, যা সে নিজেই প্রতিষ্ঠিত ও আপেক্ষিক স্বাধীনতায় ভূষিত করেছে, সইতে হয় একদিকে রাষ্ট্রশক্তির এবং অন্যদিকে যুগপৎ-সঞ্জাত বিরোধিতার প্রতিক্রিয়া। যেমন শিল্পের বাজারের গতিপ্রকৃতি প্রধানত এবং পূর্বোল্লিখিত সীমার মধ্যে টাকার বাজারে প্রতিফলিত হয়, অবশ্য **উল্টাভাবে** প্রতিফলিত হয়, ঠিক তেমনই বিভিন্ন যেসব শ্রেণী ইতিমধ্যেই বর্তমান ও ইতিমধ্যেই পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত, তাদের সংগ্রামটা সরকার ও বিরোধীশক্তির সংগ্রামের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, কিন্তু হয় তেমনি উল্টাভাবে, আর প্রত্যক্ষভাবে নয়, পরোক্ষভাবে, শ্রেণী-সংগ্রাম রূপে নয়, রাজনৈতিক নীতির জন্য সংগ্রাম রূপে এবং এতটা বিকৃত রূপে যে তাকে ধরতে আমাদের লেগেছে কয়েক হাজার বছর।

অর্থনৈতিক বিকাশের উপর রাষ্ট্রশক্তির প্রতিক্রিয়া তিন প্রকারের হতে পারে। রাষ্ট্রশক্তি একই অভিমুখে যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে বিকাশ হয় আরও দ্রুত; অর্থনৈতিক বিকাশধারার বিপরীত দিকে যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে আজকাল প্রত্যেক বৃহৎ জাতির মধ্যে রাষ্ট্রশক্তি শেষ পর্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে; অথবা সেটা অর্থনৈতিক বিকাশের কয়েকটি পথ বন্ধ করে অন্য কয়েকটি পথে ঠেলে দিতে পারে। এই ক্ষেত্রে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত আগের দুটির একটিতে পর্যবসিত হয়। কিন্তু স্পষ্টই বুঝা যায়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্থনৈতিক বিকাশের প্রচণ্ড ক্ষতিসাধন করতে পারে এবং বিপুল পরিমাণ শক্তি ও বৈষয়িক সম্পদের অপচয় ঘটাতে পারে।

এছাড়াও রয়েছে দেশজয় এবং অর্থনৈতিক সম্পদের পাশবিক ধ্বংসসাধন, যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটা সমগ্র স্থানীয় বা জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশকে আগে

ধ্বংস করে দিতে পারত। আজকাল, এই ধরনের ঘটনায় সাধারণত বিপরীত ফলই হয়ে থাকে, অন্তত বড় বড় জাতির মধ্যে। শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক দিক থেকে বিজিতই কখনো কখনো বিজেতা অপেক্ষা বেশী লাভবান হয়।

আইনের বেলাতেও ঠিক এই। যে মুহূর্তে বৃত্তিধারী আইনজীবী সৃষ্টি করার মতো নূতন শ্রমবিভাগের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, অমনি আরেকটি নূতন ও স্বাধীন ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়, যা সাধারণভাবে উৎপাদন ও আদানপ্রদানের উপর নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও এই দুটো ক্ষেত্রের উপর পাল্টা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির বিশেষ ক্ষমতা ধারণ করে। কোনো আধুনিক রাষ্ট্রে আইনকে যে কেবলমাত্র সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থার উপযোগী এবং তার অভিব্যক্তি হতে হবে তাই নয়, তাকে **আভ্যন্তরীণভাবে সুসঙ্গতিপূর্ণ** একটা অভিব্যক্তিও হতে হবে, যা অন্তর্বিরোধের ফলে নাকচ হয়ে যাচ্ছে না। এই লক্ষ্য লাভ করতে গিয়ে অর্থনৈতিক অবস্থার হুবহু প্রতিফলন ক্রমেই বেশী করে ক্ষুণ্ণ হতে থাকে। সেটা আরো বেশি করে ঘটতে থাকে এই জন্য যে, আইনের বিধিব্যবস্থায় কোনো শ্রেণীর আধিপত্যের স্থূল, অবিমিশ্র ও নির্ভেজাল অভিব্যক্তি ঘটে কদাচিত, ঘটলে তাতে 'অধিকারের ধারণা'ই ক্ষুণ্ণ হত। এমনকি নেপোলিয়ন সংহিতাতেও ১৭৯২-৯৬ সালের বিপ্লবী বুর্জোয়া শ্রেণীর বিশুদ্ধ ও পূর্বাপর সঙ্গতিযুক্ত অধিকারসম্পর্কিত ধারণা ইতিমধ্যেই নানাভাবে ভেজাল মিশ্রিত হয়েছে এবং যেটুকু বা প্রকাশ পেয়েছে তাও প্রলেতারিয়েতের উদীয়মান শক্তির জন্য প্রতিদিনই নানাভাবে নরম করে তুলতে হয়েছে। এতে কিন্তু 'নেপোলিয়নের সংহিতার' পক্ষে সেইরকম সংবিধিবদ্ধ ব্যবস্থা হতে বাধছে না, যা দুনিয়ার প্রত্যেক অঞ্চলের প্রতিটি নূতন আইনবিধির ভিত্তিস্বরূপ। এইভাবে, 'অধিকারের বিকাশ' ধারা বহু পরিমাণে চলেছে কেবল এইভাবে যে, প্রথমে, অর্থনৈতিক সম্পর্কাবলীকে আইনের নীতিতে প্রত্যক্ষ তর্জমার ফলে উদ্ভূত অন্তর্বিরোধগুলিকে দূর করে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ আইনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস হচ্ছে এবং পরে পরবর্তী অর্থনৈতিক বিকাশের প্রভাবে ও চাপে এই ব্যবস্থার মধ্যে বারম্বার ভাঙ্গন ও নতুন স্ববিরোধের সৃষ্টি হচ্ছে। (এখানে আপাতত আমি শুধু নাগরিক আইনের কথাই বলছি।)

আইনের নীতিরূপে অর্থনৈতিক সম্পর্কাবলীর প্রতিফলনটাও উল্টা-পাল্টা হতে বাধ্য। ক্রিয়ারত মানুষের অজ্ঞাতসারেই এই প্রক্রিয়া চলে; আইনবিদ মনে করেন, তিনি পূর্বানুমিত প্রতিপাদ্যগুলি নিয়ে কাজ করছেন, আসলে কিন্তু সেগুলি অর্থনৈতিক প্রতিফলন ছাড়া আর কিছু নয়। সেইজন্যই সবকিছুই একদম উল্টা হয়ে দাঁড়ায়। এবং আমার মনে হয় এটা খুবই স্পষ্ট যে, এই উল্টা অবস্থাটা যতদিন বোধগম্য না হচ্ছে ততদিন, তথাকথিত **মতাদর্শগত ধারণা** গড়ে তুলে নিজেই সে আবার অর্থনৈতিক

ভিত্তির উপর পাল্টা ক্রিয়া করে এবং কতকগুলি সীমাবদ্ধতার মধ্যে তাকে সংশোধিতও করতে পারে। পরিবারের বিকাশের যদি একই পর্যায় ধরে নেওয়া হয়, তাহলে উত্তরাধিকার আইনের ভিত্তিটা অর্থনৈতিক। কিন্তু তাসত্ত্বেও একথা প্রমাণ করা শক্ত হবে যে, ইচ্ছাপত্র ইংলণ্ডে যে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ভোগ করে এবং ফ্রান্সে তার উপর যে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপিত রয়েছে, তার কারণ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক। দুইই অবশ্য আবার উল্টে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, কারণ এতে সম্পত্তি বণ্টন প্রভাবিত হয়।

ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি আরো ঊর্ধ্বচারী মতাদর্শগত ক্ষেত্রগুলির প্রসঙ্গে বলা চলে, এদের একটা প্রাগৈতিহাসিক অন্তর্বস্তু রয়েছে, আজকাল আমরা যাকে আজগুবি বলে থাকি, ঐতিহাসিক যুগ তাকে বিদ্যমান অবস্থায় পায় এবং আত্মসাৎ করে। প্রকৃতি বিষয়ে, মানুষের নিজের অস্তিত্ব বিষয়ে, ভূতপ্রেত, জাদুশক্তি ইত্যাদি সম্পর্কে নানাপ্রকারের মিথ্যা এইসব ধারণার অর্থনৈতিক ভিত্তি অধিকাংশক্ষেত্রেই নেতিবাচক। প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিম্ন অর্থনৈতিক বিকাশের পরিপূরণ ঘটেছে, এবং সেইসঙ্গে তার সর্ত এমনকি কারণও মিলেছে প্রকৃতি বিষয়ক এই মিথ্যা ধারণায়। এবং যদিও প্রকৃতি সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের প্রধান চালিকা শক্তি ছিল এবং ক্রমেই বেশি করে হয়ে উঠছে অর্থনৈতিক প্রয়োজন, তথাপি এইসবকিছু আদিম আজগুবি ধারণার মূলে অর্থনৈতিক কারণ খুঁজতে যাওয়া হবে পণ্ডিতমূর্খের কাজ। বিজ্ঞানের ইতিহাস হচ্ছে ক্রমাগত এই আজগুবির অপসারণ বা তার স্থানে নূতন এবং পূর্বাপেক্ষা কম আজগুবিকে স্থাপন করার ইতিহাস। যাঁরা এই কাজ করেন তাঁরা শ্রমবিভাগের বিশেষ ক্ষেত্রের লোক এবং তাঁদের ধারণা তাঁরা একটি স্বাধীন ক্ষেত্রে কাজ করছেন। যে পরিমাণে তাঁরা সামাজিক শ্রমবিভাগের অভ্যন্তরে একটি স্বাধীন গোষ্ঠী রূপে থাকেন, সেই পরিমাণে ভুলভ্রান্তিসহ তাঁদের কীর্তি সমাজের সমগ্র বিকাশের উপর, এমনকি তার অর্থনৈতিক বিকাশের উপরও প্রভাব হিসাবে পাল্টা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কিন্তু তাহলেও তাঁরা নিজেরাই আবার অর্থনৈতিক বিকাশের প্রধান প্রভাবের অধীন। যেমন, দর্শনে, বুর্জোয়া যুগের ক্ষেত্রে একথা খুব সহজেই প্রমাণ করা যায়। হব্‌স ছিলেন প্রথম আধুনিক বস্তুবাদী (অষ্টাদশ শতকের অর্থে), কিন্তু যে যুগে সারা ইউরোপ জুড়ে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের আধিপত্য, এবং যে যুগে ইংলণ্ডে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র বনাম জনসাধারণের লড়াই শুরু হচ্ছে, সেই যুগে তিনি ছিলেন নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের অনুগামী। লক ছিলেন ধর্ম ও রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রেই ১৬৮৮ সালের শ্রেণী-আপোষের সন্তান। ব্রিটিশ ডিইস্টরা এবং তাঁদের আরও সুসঙ্গতিপূর্ণ উত্তরসাধক ফরাসী বস্তুবাদীরা ছিলেন বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রকৃত দার্শনিক; ফরাসী বস্তুবাদীরা এমনকি বুর্জোয়া বিপ্লবেরও দার্শনিক ছিলেন। ক্যাণ্ট থেকে হেগেল পর্যন্ত সারা জার্মান দর্শন

জুড়ে উঁকি দেয় জার্মান কূপমণ্ডূক, কখনো ইতিবাচকরূপে কখনো নেতিবাচকরূপে। কিন্তু যেহেতু প্রত্যেক যুগের দর্শন শ্রমবিভাগের একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র, সেইহেতু সে তার পূর্বগামীদের নিকট থেকে পাওয়া কতকগুলি নির্দিষ্ট চিন্তাবস্তুকে পূর্বস্থিত রূপে গ্রহণ করে যাত্রা শুরু করে। এইজন্যই অর্থনীতির দিক থেকে পশ্চাৎপদ দেশগুলিও দর্শনের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে: যেমন ইংলণ্ডের সঙ্গে তুলনায় প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্স — ইংলণ্ডের দর্শনের উপরই ফরাসীরা নিজেদের দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করেছিল, পরে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড উভয়ের তুলনায় জার্মানি। কিন্তু ফ্রান্স ও জার্মানি উভয় দেশেই তখন দর্শন ও সাহিত্যের সাধারণ স্ফুরণের মূলে ছিল একটা অর্থনৈতিক জোয়ার। শেষ পর্যন্ত এসব ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক বিকাশের আধিপত্য আমার কাছে সন্দেহাতীত: কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিশেষ ক্ষেত্রের দ্বারা আরোপিত অবস্থার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ: যেমন দর্শনের বেলায় পূর্বগামীদের হাত থেকে পাওয়া যেসকল দার্শনিক মালমসলা বিদ্যমান তার উপর অর্থনৈতিক প্রভাবগুলির (যা আবার সাধারণত রাজনীতি ইত্যাদির ছদ্মবেশেই মাত্র কাজ করে) প্রক্রিয়ার মধ্যে। এখানে অর্থনীতি নূতন কিছু সৃষ্টি করে না, হাতের বিদ্যমান চিন্তা বস্তুটা কী ভাবে পরিবর্তিত ও আরও বিকশিত হবে তার পথ নির্দিষ্ট করে, এবং তাও করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরোক্ষভাবে, কারণ রাজনৈতিক, আইনগত ও নৈতিক প্রতিফলনগুলিই দর্শনের উপর প্রধানতম প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে।

ধর্ম সম্পর্কে সবচেয়ে যেটা প্রয়োজনীয় তা আমি ফয়েরবাখ সম্পর্কিত শেষ অধ্যায়ে বলেছি।

অতএব, বার্ত যদি ধরে নিয়ে থাকেন যে, অর্থনৈতিক আন্দোলনের উপর ঐ আন্দোলনের রাজনৈতিক এবং অন্যান্য যে-কোনো প্রতিফলনের প্রতিক্রিয়া আমরা অস্বীকার করি, তাহলে তিনি বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। তিনি যদি শুধু একবার মার্কসের **'আঠারোই ব্রুমেয়ার'** বইখানার পাতায় চোখ বোলান তাহলেই বুঝতে পারবেন, রাজনৈতিক সংগ্রাম ও ঘটনাবলী কী **বিশেষ** ভূমিকা পালন করেছে বইখানিতে প্রায় একান্তভাবে তাই আলোচিত হয়েছে, অবশ্য অর্থনৈতিক অবস্থার উপর তাদের **সাধারণ** নির্ভরশীলতার সীমার মধ্যে। কিম্বা দেখতে পারেন 'পুঁজি' গ্রন্থখানি, দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রমদিন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যে অংশে, সেই অংশ। সেখানে দেখা যাবে আইনপ্রণয়নের প্রতিক্রিয়া কত প্রভাবশালী, এবং আইনপ্রণয়ন নিশ্চয়ই একটি রাজনৈতিক কাজ। অথবা, বুর্জোয়ার ইতিহাস সংক্রান্ত অংশ (চতুর্বিংশ অধ্যায়)। রাজনৈতিক ক্ষমতা যদি অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিহীন হয়, তবে কেন আমরা প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক একনায়কত্বের জন্য লড়াই করছি? বলও (অর্থাৎ রাষ্ট্রশক্তি) একটি অর্থনৈতিক শক্তি!

কিন্তু বইখানিকে সমালোচনা করার মতো সময় এখন আমার নেই। প্রথমে আমাকে তৃতীয় খণ্ডটিকে* প্রকাশ করতে হবে। তাছাড়া আমার ধারণা বের্নস্তাইনও বেশ ভালভাবেই এর মোকাবিলা করতে পারবেন।

এই ভদ্রলোকদের যে বস্তুটির অভাব তা হচ্ছে দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁরা সর্বদাই শুধু এখানে কারণ ও ওখানে কার্য দেখতে পান। এ যে একটা শূন্যগর্ভ বিমূর্ততা, এই ধরনের অধিবিদ্যক প্রান্তিক বৈপরীত্য যে বাস্তব জগতে দেখা যায় কেবল বড় জোর সংকটকালেই এবং সমগ্র বিপুল প্রক্রিয়া যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রূপেই চলে — যদিও অত্যন্ত অসম শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, কারণ অর্থনৈতিক গতিটাই সর্বাধিক শক্তিশালী, সর্বাধিক আদিম, সর্বাধিক নির্ধারক — এখানে যে সবকিছুই আপেক্ষিক এবং কিছুই পরম নয়, একথা তাঁরা বুঝতে পারেন না। তাঁদের কাছে হেগেল বলে কেউ যেন কখনো ছিলেন না।

ফ. মেরিং সমীপে এঙ্গেলস

লণ্ডন, ১৪ই জুলাই, ১৮৯৩

'লেসিং কিংবদন্তী' বইখানি দয়া করে আমাকে পাঠানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর এই প্রথম সুযোগ আজ আমার হল। বইখানির মাত্র একটা আনুষ্ঠানিক প্রাপ্তিস্বীকার জানাতে চাইনি, ঐ সঙ্গে বইখানি সম্বন্ধে, বইখানির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলার ইচ্ছা ছিল। তাই দেরী হল।

আমি শুরু করব শেষ থেকে, অর্থাৎ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে লিখিত পরিশিষ্ট** থেকে, যেখানে আপনি প্রধান প্রধান তথ্যগুলি চমৎকারভাবে এবং যে-কোনো সংস্কারমুক্ত মানুষকে নিঃসংশয় করার মতো করে সাজিয়ে দিয়েছেন। আপত্তি করার যেটুকু চোখে পড়ল তা এই যে, আপনি আমাকে আমার প্রাপ্যের বেশী কৃতিত্ব দিয়েছেন; এমনকি কালক্রমে আমি নিজেও যে সব কথা আবিষ্কার করতে পারতাম বলে ধরে নিই, তাহলেও মার্কস তাঁর দ্রুততর উপলব্ধি ও ব্যাপকতর দৃষ্টির সাহায্যে সে সবই অনেক আগে আবিষ্কার করেছিলেন। মার্কসের মতো ব্যক্তির সঙ্গে চল্লিশ বছর কাজ করার সৌভাগ্য যার হয়, তার যে স্বীকৃতি প্রাপ্য বলে মনে হতে পারে তা সাধারণত

* মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থ। — সম্পাঃ

** মেরিং-এর লেখা *Über den historischen Materialismus* (ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে) প্রবন্ধটি ১৮৯৩ সালে *Die Lessing Legende* (লেসিং কিংবদন্তী) নামক তাঁর বইয়ের পরিশিষ্ট রূপে ছাপা হয়। — সম্পাঃ

সে ঐ ব্যক্তির জীবদ্দশায় লাভ করে না। তারপর বৃহতের মৃত্যু হলে ক্ষুদ্র সহজেই প্রাপ্যের অতিরিক্ত পায়; আমার মনে হয় বর্তমানে আমার বেলাতেও ঠিক এই হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ইতিহাস এ সবকিছুই শুধরে দেবে, কিন্তু ততদিন আমি নিঃশব্দে পরপারে চলে যাব এবং কোনো কিছু সম্পর্কেই কিছু জানব না।

এছাড়া, আপনার লেখায় একটি মাত্র জিনিসের অভাব, যার উপর অবশ্য মার্কস ও আমি আমাদের লেখায় কখনো যথেষ্ট জোর দিইনি এবং সে ব্যাপারে আমরা উভয়েই সমানভাবে দোষী। অর্থাৎ, প্রথমে আমরা প্রধানত এই জোর দিয়েছিলাম এবং **বাধ্য হয়েই দিয়েছিলাম** যে, রাজনৈতিক, আইনগত ও অন্যান্য মতাদর্শগত ধারণা এবং এইসব ধারণার মাধ্যমে সংঘটিত কার্যাবলীর **উদ্ভব হয়েছে** মূল অর্থনৈতিক ঘটনাবলী থেকে। এই কাজ করতে গিয়ে বিষয়বস্তুর স্বার্থে আমরা রূপের দিকটা, অর্থাৎ যেভাবে ও যে কায়দায় এইসব ধারণা ইত্যাদি আবির্ভূত হয় সেই দিকটা অবহেলা করেছিলাম। এতে আমাদের শত্রুদের পক্ষে ভুল বুঝানোর ও বিকৃতি সাধনের খুব একটা সুযোগ জুটে যায়। পল বার্তে তারই একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

ভাবাদর্শ এমন একটি প্রক্রিয়া যা তথাকথিত মনীষী যে সচেতনভাবে সম্পাদন করেন সেকথা ঠিক, কিন্তু এ সচেতনতা ভ্রান্ত সচেতনতা। তাঁকে চালিত করে যে প্রকৃত প্রেরণাশক্তি তা তাঁর কাছে অজ্ঞাত থেকে যায়, অন্যথায় তা ভাবাদর্শগত প্রক্রিয়াই হত না। তাই, তিনি মিথ্যা কিম্বা আপাত প্রতীয়মান প্রেরণাশক্তিরই অস্তিত্ব কল্পনা করেন। যেহেতু এই প্রক্রিয়া হচ্ছে চিন্তার প্রক্রিয়া, সেইহেতু তিনি এর রূপ ও বিষয়বস্তু দুইই হয় নিজের নয় পূর্বগামীদের বিশুদ্ধ চিন্তা থেকে আহরণ করেন। তিনি কেবলমাত্র চিন্তা-বস্তু নিয়েই কাজ করেন, যা তিনি পরীক্ষা না করেই চিন্তাফল বলে গ্রহণ করেন এবং চিন্তা থেকে স্বাধীন কোনো দূরতর উৎস আর অনুসন্ধান করে দেখেন না। প্রকৃতপক্ষে একে তিনি স্বাভাবিক বলেই ধরে নেন, কারণ সমস্ত কর্ম চিন্তার **মাধ্যমে** সম্পন্ন হয় বলে তিনি ধরে নেন সেটা শেষ পর্যন্ত চিন্তার **ভিত্তিতেই** ঘটছে।

যে ভাবপ্রবক্তা ইতিহাস নিয়ে কারবার করেন (ইতিহাস বলতে এখানে সোজাসুজি শুধু প্রকৃতির নয়, **সমাজের** সমস্ত ক্ষেত্রকেই বুঝাচ্ছে যেমন, রাজনৈতিক, আইনগত, দার্শনিক, ধর্মশাস্ত্রীয়), তিনি বিজ্ঞানের প্রতি ক্ষেত্রে এমন সব মালমশলা হাতে পান, যা পূর্বপুরুষদের চিন্তা থেকে স্বাধীনভাবে উদ্ভূত এবং যা একের পর এক এই সব পুরুষের মস্তিষ্কে নিজস্ব স্বাধীন বিকাশ ধারার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে এসেছে। একথা সত্য যে, কোনো একটি ক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহির্ঘটনাবলীও এই বিকাশের উপর সহ-নির্ধারক প্রভাব বিস্তার করতে পারে, কিন্তু না বলেও ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, এই ঘটনাগুলি নিজেরাও একটি চিন্তা প্রক্রিয়ার ফলমাত্র; অতএব আমরা শুধুমাত্র চিন্তার

জগতেই রয়ে যাই, যে চিন্তা যেন সবচেয়ে বেয়াড়া ঘটনাগুলিকে পর্যন্ত বেমালুম হজম করে ফেলে।

পৃথক পৃথক প্রতিটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-সংবিধান, আইনব্যবস্থা, ভাবাদর্শগত ধ্যানধারণার এক একটা স্বাধীন ইতিহাসের এই আপাতপ্রতীয়মানতাই সর্বোপরি অধিকাংশ মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। লুথার ও কালভাঁ যদি সরকারী ক্যাথলিক ধর্ম 'পরাহত করে থাকেন,' কিম্বা হেগেল যদি ক্যান্ট ও ফিখতেকে 'পরাহত করে থাকেন,' কিম্বা রুসো যদি তাঁর প্রজাতন্ত্রী 'সামাজিক চুক্তি' দিয়ে নিয়মতন্ত্রী মঁতেস্ক্যকে পরোক্ষে 'পরাহত করে থাকেন,' তাহলে সে যেন এক প্রক্রিয়া যা ধর্মতত্ত্ব, দর্শন বা রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের এলাকার অন্তর্ভুক্ত হয়েই থাকছে এবং এই বিশেষ বিশেষ চিন্তাক্ষেত্রগুলির ইতিহাসে এক একটি স্তরেরই পরিচায়ক, এবং কখনো চিন্তাক্ষেত্রের বাইরে যায় না। এর সঙ্গে আবার পুঁজিবাদী উৎপাদনের চিরন্তনতা ও চূড়ান্ততার বুর্জোয়া ভ্রান্তি যুক্ত হয়, ফলে ফিজিওক্রাট* ও অ্যাডাম স্মিথের হাতে বাণিজ্যপন্থীদের** 'পরাভব' একান্তভাবে চিন্তার জয় বলেই ধরে নেওয়া হয়, চিন্তার মধ্যে পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ঘটনাবলীর প্রতিফলনরূপে নয়, সর্বদা এবং সর্বত্র বিদ্যমান বাস্তব অবস্থার নির্ভুল ও চূড়ান্ত উপলব্ধিরূপে। বলতে কি সিংহহৃদয় রিচার্ড এবং ফিলিপ অগস্টাস যদি ক্রুসেড যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে স্বাধীন বাণিজ্য প্রবর্তন করতেন, তাহলে আমরা যেন পাঁচ শ বছরের দুর্দশা ও মূঢ়তা থেকে রেহাই পেতাম।

আমার মনে হয় বিষয়টির এই যে দিকটিকে এখানে মাত্র উল্লেখ করে যাওয়া সম্ভব হল, সেটাকে আমরা যতটা অবহেলা করেছি তা অনুচিত। এ সেই পুরাতন কাহিনী — আধেয়ের স্বার্থে আধার প্রথমে সর্বদাই অবহেলিত হয়। ফের বলি, আমি নিজেও

* ফিজিওক্রাট --- আঠারো শতকের পঞ্চাশের দশকে ফ্রান্সে উদ্ভূত বুর্জোয়া চিরায়ত অর্থশাস্ত্রের একটি ধারা। এরা ছিল বৃহৎ পুঁজিবাদী ভূমিকর্ষণ, সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের লোপ ও সংরক্ষণনীতির পক্ষপাতী। সামন্ত ব্যবস্থা উচ্ছেদের আবশ্যিকতা বুঝলেও ফিজিওক্রাটদের ইচ্ছা ছিল, সেটা ঘটুক শান্তির পথে, শাসক শ্রেণী ও স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্ষতি না করে। দার্শনিক মতামতের দিক থেকে এরা ছিল অষ্টাদশ শতকের ফরাসী বুর্জোয়া জ্ঞানপ্রচারকদের অন্তর্গত। ফিজিওক্রাটদের প্রস্তাবিত কতকগুলি অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সাধিত হয় ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের পর্বে। — সম্পাঃ

** বাণিজ্যপন্থা - ১৫—১৮শ শতাব্দীতে কতকগুলি ইউরোপীয় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অর্থশাস্ত্রীয় পদ্ধতি, এতে পুঁজির সঞ্চয় ও বাণিজ্যের বিকাশ সুগম হয়। বাণিজ্যপন্থীরা জাতির সমৃদ্ধিকে অর্থের সঙ্গে এক করে দেখতেন, ভাবতেন সামাজিক সম্পদ হল একমাত্র মহার্ঘ ধাতুরূপে মুদ্রায় সীমাবদ্ধ। বাণিজ্যপন্থার সমর্থক রাষ্ট্রেরা এমনভাবে বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত যাতে আমদানির চেয়ে রপ্তানি বেশি হয়। -- সম্পাঃ

তাই করেছি, এবং সর্বদাই ভুল বুঝতে পেরেছি কেবল পরে। অতএব, এর জন্য আপনাকে তিরস্কার মোটেই করছি না — বরং আপনার চেয়ে পুরাতন দোষী হিসাবে সে অধিকারও আমার নাই — তাহলেও আমি ভবিষ্যতের জন্য এই দিকটির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

সেই সঙ্গে রয়েছে ভাবাদর্শীদের এই আজগুবি ধারণা: ইতিহাসে যাদের ভূমিকা রয়েছে সেই সব বিভিন্ন মতাদর্শক্ষেত্রের স্বাধীন ঐতিহাসিক বিকাশকে আমরা অস্বীকার করি বলে **ইতিহাসের উপর** তাদের কোনরূপ **প্রতিক্রিয়াকেও** আমরা বুঝি অস্বীকার করি। এর মূলে রয়েছে কারণ ও কার্য সম্পর্কে মামুলী অ-দ্বান্দ্বিক ধারণা, যেন তারা একান্তভাবেই বিপরীত মেরুস্থিত, তাদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করা হয়। এই ভদ্রলোকেরা প্রায়ই ইচ্ছা করেই ভুলে যান যে, একবার যখন কোনো ঐতিহাসিক বস্তু অপরাপর এবং শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক কারণের ফলস্বরূপ সৃষ্ট হয়ে যায়, তখন সেই বস্তুটি তার নিজের পরিবেশের উপর এবং এমনকি যেসব কারণ থেকে তার জন্ম সেগুলিরও উপরও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আপনার বইয়ের ৪৭৫ পৃষ্ঠায় পুরোহিত সম্প্রদায় ও ধর্মসম্পর্কে বার্তের বক্তব্য। এমন আশাতীত রকমের মামুলী ব্যক্তির সঙ্গে যেভাবে আপনি মোকাবিলা করেছেন তাতে আমি খুব খুশি হয়েছি। একেই আবার তারা লাইপজিগে ইতিহাসের অধ্যাপক বানিয়েছে! আগে সেখানে থাকতেন বৃদ্ধ ভাক্সমুথ; সংকীর্ণমনা হলেও তথ্য সম্পর্কে তিনি খুব সজাগ ছিলেন, সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের লোক তিনি!

তাছাড়া, বইখানি সম্পর্কে আমার অভিমতরূপে আমি সেই কথারই পুনরুক্তি করতে পারি, যেকথা আমি *Neue Zeit* পত্রিকায় প্রবন্ধগুলি প্রকাশের সময় বলেছি: প্রুশীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে অন্য যে কোনো লেখার চেয়ে এ লেখা বহুগুণে ভাল। প্রকৃতপক্ষে একথাও বলতে পারি যে, বইখানি হচ্ছে একমাত্র ভাল বই যাতে সামান্যতম খুঁটিনাটি পর্যন্ত নিয়ে অধিকাংশ ব্যাপারের অন্তঃসম্পর্ককে নির্ভুলভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। একমাত্র দুঃখ, বিসমার্ক পর্যন্ত সমগ্র বিকাশ ধারাকে আপনি অন্তর্ভুক্ত করেননি এবং অজ্ঞাতসারেই আমার আশা হয় বারান্তরে আপনি এই কাজটি সম্পন্ন করবেন এবং ইলেক্টর ফ্রিদরিখ ভিলহেলম থেকে বৃদ্ধ ভিলহেলম পর্যন্ত একটি সম্পূর্ণ ও সুসঙ্গতিপূর্ণ চিত্র উপস্থিত করবেন। আপনি তো ইতিমধ্যেই আপনার প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষ করেছেন এবং প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে তা সমাপ্ত বলে ধরা যায়। পুরানো নড়বড়ে দালান ভেঙ্গে পড়ার আগেই যে-কোনো ভাবে হোক কাজটি সেরে ফেলতে হবে। রাজতন্ত্রী-দেশপ্রেমিক কিংবদন্তীগুলির ভাঙন যদিও শ্রেণীপ্রভুত্ব গোপনকারী রাজতন্ত্রের বিলোপসাধনের পক্ষে সরাসরি একটা প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত নয় (কেননা জার্মানিতে একটি **বিশুদ্ধ**, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র আবির্ভূত হবার আগেই ঘটনাস্রোত

তাকে পিছু ফেলে এগিয়ে গেছে), তথাপি সে ভাঙন রাজতন্ত্র উচ্ছেদের পক্ষে অত্যন্ত কার্যকর হয়ে দাঁড়াবে।

তখন, জার্মানিকে যে সাধারণ দুর্গতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তার অংশ হিসাবে প্রাশিয়ার স্থানীয় ইতিহাসকে বিবৃত করারও আপনি আরও স্থান ও সুযোগ পাবেন। এই বিষয়টিতে আপনার মতের সঙ্গে কোনো কোনো স্থানে আমার অমিল রয়েছে, বিশেষত জার্মানির অঙ্গচ্ছেদের এবং ষোড়শ শতকে জার্মানিতে বুর্জোয়া বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কিত ধারণার ক্ষেত্রে। আশা করছি আগামী শীতকালেই আমি আমার 'কৃষকযুদ্ধ' বইখানির ঐতিহাসিক ভূমিকা নূতন করে লিখব, তখন আমি এই বিষয়গুলি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব। আমি যে আপনার বক্তব্য ভুল মনে করছি তা নয়, আমি শুধু তাদের পাশাপাশি অন্য বক্তব্যও রাখছি এবং কিছুটা অন্যরকমভাবে তাদের সাজাচ্ছি।

জার্মানির ইতিহাস এক নিরবচ্ছিন্ন দীনতার কাহিনী। এই ইতিহাস অনুশীলন করতে গিয়ে আমি বরাবরই দেখেছি, কেবলমাত্র পাল্টা ফরাসী পর্বগুলির সঙ্গে তুলনার মাধ্যমেই একটি সঠিক মাত্রাজ্ঞান জন্মায়, কারণ সেখানে যা ঘটছে তা আমাদের দেশে যা ঘটছে তার ঠিক বিপরীত। যখন আমরা আমাদের চরম পতনের যুগের মধ্য দিয়ে চলেছি, ঠিক তখনই সেখানে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্ন অংশগুলি থেকে একটি জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সেখানে প্রক্রিয়াটির সমগ্র গতিতে একটি দুর্লভ বিষয়নিষ্ঠ যৌক্তিকতা বর্তমান, আর আমাদের ক্ষেত্রে বিষণ্ণ বিশৃঙ্খলা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। সেখানে মধ্য যুগে বিদেশীর হস্তক্ষেপ আসে ইংরাজ বিজেতাদের মধ্য দিয়ে, তারা হস্তক্ষেপ করে প্রভাঁস জাতিসত্তার স্বপক্ষে উত্তর ফরাসী জাতিসত্তার বিরুদ্ধে। ইংলন্ডের সঙ্গে যুদ্ধই একদিক দিয়ে ত্রিশ বছরের যুদ্ধ*, এবং সে যুদ্ধের অবসান হল বিদেশী হানাদারদের উৎসাদনে এবং উত্তর কর্তৃক দক্ষিণের উপর প্রভুত্ব স্থাপনে। তারপর এল কেন্দ্রীয় শক্তির সঙ্গে নিজের বৈদেশিক অধিকারগুলির সমর্থনপুষ্ট সামন্ত রাজ্য

* ত্রিশ বছরের যুদ্ধ — (১৬১৮—১৬৪৮) — প্রথম সর্বইউরোপীয় যুদ্ধ, শুরু হয় বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্রজোটের মধ্যে বিরোধিতা প্রখর হয়ে ওঠায় এবং প্রটেস্টান্ট বনাম ক্যাথলিক সংঘর্ষের রূপ নেয়। চেকদেশে হাবসবুর্গ রাজতন্ত্রের পীড়ন ও ক্যাথলিক প্রতিক্রিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে এ যুদ্ধ শুরু হয়। পরে যেসব ইউরোপীয় রাষ্ট্র এ যুদ্ধে নামে তারা দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়: পোপ, স্পেন ও অস্ট্রিয়ার হাবসবুর্গরা এবং জার্মানির ক্যাথলিক রাজারা ক্যাথলিক নিশানের নিচে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রটেস্টান্ট দেশ যথা চেক, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড, ওলন্দাজ প্রজাতন্ত্র এবং রিফর্মেশন গ্রহণকারী কয়েকটি জার্মান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে। হাবসবুর্গদের প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসী রাজা সমর্থন করে প্রটেস্টান্ট দেশগুলিকে। জার্মানি হয়ে দাঁড়ায় এ যুদ্ধের রণক্ষেত্র, যুধ্যমানদের লুণ্ঠন ও গ্রাসের লক্ষ্যবস্তু। যুদ্ধ শেষ হয় ১৬৪৮ সালে, ভেস্তফাল সন্ধিতে। এতে জার্মানির রাজনৈতিক বিখন্ডীকরণ পাকা হয়। — সম্পাঃ

বুরগাণ্ডির সংগ্রাম। সে গ্রহণ করল ব্রাণ্ডেনবুর্গ-প্রাশিয়ার ভূমিকা। এই সংগ্রামে অবশ্য কেন্দ্রীয় শক্তি জয়ী হল এবং সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হল জাতীয় রাষ্ট্র। ঠিক সেই সময়ই আমাদের দেশে জাতীয় রাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ল (পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে 'জার্মান রাজ্যকে' যতটা জাতীয় রাষ্ট্র বলা চলে) এবং শুরু হল জার্মান ভূমির ব্যাপক লুণ্ঠন। এই তুলনা জার্মানদের পক্ষে অত্যন্ত হীনতাসূচক এবং সেইজন্যই আরও বেশী শিক্ষাপ্রদ; এবং যেহেতু আমাদের শ্রমিকেরা জার্মানিকে আবার ঐতিহাসিক আন্দোলনের পুরোভাগে স্থাপন করেছে, সেইহেতু অতীতের এই কলঙ্ককে পরিপাক করা আমাদের পক্ষে কিছুটা সহজ হয়েছে।

জার্মানির বিকাশের আরেকটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিক হচ্ছে এই যে, সাম্রাজ্যের যে দুটো অংশ শেষ পর্যন্ত জার্মানিকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিল তাদের কোনোটিই পুরোপুরি জার্মান ছিল না — দুইই ছিল বিজিত স্লাভ এলাকায় উপনিবেশ: অস্ট্রিয়া হল ব্যাভেরিয়ান উপনিবেশ, ব্রাণ্ডেনবুর্গ হল স্যাকসন উপনিবেশ। বিদেশী অ-জার্মান অধিকারগুলির সমর্থনের উপর নির্ভর করেই তারা **আসল** জার্মানির অভ্যন্তরে ক্ষমতা অর্জন করেছিল: অস্ট্রিয়া নির্ভর করেছিল হাঙ্গেরীয় সমর্থনের উপর (বোহেমিয়ার কথা ছেড়েই দিচ্ছি) এবং ব্রাণ্ডেনবুর্গ নির্ভর করেছিল প্রাশিয়ার সমর্থনের উপর। যে পশ্চিম সীমান্ত ছিল দারুণ বিপদের মধ্যে, সেখানে এধরনের কিছু ঘটেনি; উত্তর সীমান্তে দিনেমারদের হাত থেকে জার্মানিকে রক্ষা করার ভার দিনেমারদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এবং দক্ষিণ দিকে রক্ষা করার মতো বিশেষ কিছু ছিল না বলেই সীমান্তরক্ষী সুইজারল্যান্ডবাসীরা এমনকি জার্মানি থেকে নিজেদের ছিন্ন করে নিতেও সক্ষম হয়েছিল!

কিন্তু আমি নানাধরনের অতিরিক্ত আলোচনার মধ্যে গিয়ে পড়েছি। আপনার বই আমার মনকে কী ভাবে নাড়া দিয়েছে, এই বাচালতা অন্তত তার প্রমাণ ...

ন. দানিয়েলসন সমীপে এঙ্গেলস

লণ্ডন, ১৭ই অক্টোবর, ১৮৯৩

... 'রেখাচিত্রের'* কপিগুলির জন্য ধন্যবাদ। তিনখানি কপি আমি সমজদার বন্ধুদের পাঠিয়ে দিয়েছি। দেখে খুশি হলাম, বইখানি খুবই চাঞ্চল্য এবং রীতিমতো উত্তেজনা

* *Николай — он, Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства* (আমাদের সংস্কারোত্তর সামাজিক অর্থনীতির রেখাচিত্র) С.-Петербург, 1893. — সম্পাঃ

সৃষ্টি করেছে — করাই উচিত। যেসব রুশীদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, বইখানি তাদের মধ্যে প্রধান আলোচ্য বিষয়। এইতো গতকালই তাঁদের একজন লিখেছেন: এখানে রাশিয়ায় 'রাশিয়ায় পুঁজিবাদের ভাগ্য' নিয়ে বিতর্ক চলেছে। বার্লিনের *Sozial-politisches Centralblatt** পত্রিকায় মিঃ পি স্ত্রুভে আপনার বই সম্পর্কে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন; এই একটি বিষয়ে আমি তাঁর সঙ্গে একমত যে, ক্রিমিয়া যুদ্ধ** কর্তৃক সৃষ্ট ঐতিহাসিক অবস্থা, যে পদ্ধতিতে কৃষি-সম্পর্কে ১৮৬১ সালের পরিবর্তন*** সাধিত হয়েছিল সেই পদ্ধতি এবং সাধারণভাবে ইউরোপের রাজনৈতিক অচলাবস্থা — রাশিয়ার পুঁজিবাদী বিকাশের বর্তমান স্তর এদেরই অনিবার্য পরিণতি। কিন্তু যাকে তিনি বলেছেন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার হতাশাব্যঞ্জক ধারণা, তা খণ্ডন করতে গিয়ে রাশিয়ার বর্তমান স্তরকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্তরের সঙ্গে তুলনা করায় তিনি সুনিশ্চিতভাবে ভুল করেছেন। তিনি বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো রাশিয়াতেও আধুনিক পুঁজিবাদের কুফলগুলিকে সমান সহজে দূর করা যাবে। তিনি একেবারেই ভুলে গেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জন্ম থেকেই আধুনিক, বুর্জোয়া; তিনি ভুলে গেছেন যে, পুরাপুরি বুর্জোয়া সমাজ স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের কবল থেকে পালিয়ে যাওয়া পেটি বুর্জোয়া ও চাষীরাই তাকে প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু রাশিয়ার আদিম সাম্যবাদী প্রকৃতির একটা ভিত রয়েছে, একটা সভ্যতাপূর্ব গোত্র-সংগঠন রয়েছে। এই ভিত ধ্বসে পড়ছে বটে, তবু এখনো পুঁজিবাদী বিপ্লব (যা প্রকৃত সমাজবিপ্লব) যার উপর দাঁড়িয়ে কাজ করছে, তার বনিয়াদ ও উপকরণ হয়ে রয়েছে তা। আমেরিকায় এক শতাব্দীরও বেশী হল মুদ্রা অর্থনীতি পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এদিকে রাশিয়ায় প্রায় পুরোপুরিই স্বভাব অর্থনীতি হল নিয়ম। অতএব, বোঝাই যায় যে, রাশিয়ার পরিবর্তন আমেরিকার চেয়ে অনেক বেশী হিংসাত্মক, অনেক বেশী তীক্ষ্ণধার হবে এবং অসংখ্যগুণ বেশী দুর্গতির মধ্য দিয়ে আসবে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমার মনে হয় আপনি যতটা হতাশাব্যঞ্জক চিত্র তুলে ধরেছেন, ঘটনাবলী তা সমর্থন করে না। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, সমাজের একটা ভয়ানক

---

* প্রকাশনের তৃতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১লা অক্টোবর, ১৮৯৩। (এঙ্গেলসের টীকা।)

** ক্রিমিয়া যুদ্ধ (১৮৫৩—১৮৫৬) — রাশিয়ার সঙ্গে ইঙ্গো-ফরাসী-তুর্কী ও সার্দিনিয়া জোটের যুদ্ধ, যা শুরু হয় নিকট প্রাচ্যে এই সব দেশগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সংঘাতের ফলে। যুদ্ধে রাশিয়ার হার হয় এবং প্যারিস সন্ধি শর্ত যায় রাশিয়ার প্রতিকূলে। যুদ্ধে পরাজয়ে রাশিয়ার মান নষ্ট হয়, তার বৈদেশিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং 'ভূমিদাস রাশিয়ার পচন ও অক্ষমতা' (লেনিন) উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে। — **সম্পাঃ**

*** ১৮৬১ সালে রাশিয়ায় ভূমিদাসপ্রথার অবসান হয়। — সম্পাঃ

তোলপাড় ছাড়া এবং গোটাগুটি এক একটা শ্রেণীর সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে অন্যান্য শ্রেণীতে রূপান্তর ছাড়া আদিম কৃষিভিত্তিক সাম্যবাদ থেকে পুঁজিবাদী শিল্পায়নে উত্তরণ সম্ভব নয়। এর ফলে অনিবার্যভাবেই কী বিপুল পরিমাণ দুর্গতি এবং মানবজীবন ও উৎপাদন-শক্তির অপচয় ঘটে, তা আমরা ক্ষুদ্রাকারে দেখেছি -- পশ্চিম ইউরোপে। কিন্তু তার ফলে মোটেই একটা মহান ও অতিপ্রতিভাধর জাতি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায় না। দ্রুত জনসংখ্যাবৃদ্ধি — যাতে আপনারা অভ্যস্ত — তা রুদ্ধ হতে পারে, বেপরোয়া অরণ্যবিনাশ ও সেই সঙ্গে জমিদার তথা কৃষকদের উচ্ছেদের ফলে উৎপাদন-শক্তির অপরিমেয় অপচয় ঘটাতে পারে, কিন্তু যাই হোক না কেন দশকোটির বেশি মানুষের একটি জাতি শেষ পর্যন্ত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ **বৃহৎ শিল্পের** একটা ভালো রকম আভ্যন্তরীণ বাজার হয়ে দাঁড়াবে এবং অন্যান্য স্থানের মতো আপনাদের বেলাতেও ভারসাম্য ঘটবে — অবশ্য যদি পুঁজিবাদ পশ্চিম ইউরোপে সুদীর্ঘকাল টিকে থাকে।

আপনি নিজেই স্বীকার করেছেন, 'ক্রিমিয়া যুদ্ধের পর রাশিয়ার সামাজিক অবস্থা, অতীত ইতিহাস থেকে যে উৎপাদন-রূপ আমরা লাভ করেছি তার বিকাশের পক্ষে অনুকূল ছিল না'। আমি আর একটু এগিয়ে গিয়ে বলব, আদিম কৃষিভিত্তিক সাম্যবাদ থেকে উন্নততর সামাজিক রূপে বিকাশলাভ অন্য যে কোনো দেশের মতো রাশিয়াতেও সম্ভব নয়, যদি না নিদর্শন জোগাবার মতো ঐ উন্নততর রূপটি অন্যকোনো দেশে **ইতিপূর্বেই বিদ্যমান** থাকে। যেখানে ঐতিহাসিক কারণে সম্ভব সেখানে এই উন্নততর রূপটি যেহেতু পুঁজিবাদী উৎপাদন-রূপ ও তার সৃষ্ট সামাজিক দ্বৈতবিরোধের অনিবার্য পরিণতি, সেইজন্যই, কৃষিভিত্তিক গোষ্ঠী থেকে সরাসরি তার উদ্ভব হতে পারে না, যদি ইতিমধ্যেই কোথাও তার অনুকরণযোগ্য দৃষ্টান্ত না থেকে থাকে। যদি ১৮৬০-৭০ সালে ইউরোপের পশ্চিমাংশ এই ধরনের রূপান্তরের পক্ষে পরিণত হয়ে থাকত, যদি ইংলন্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে তখনই এই রূপান্তরণের কাজ শুরু হয়ে যেত, তাহলে তখন রুশীদের কর্তব্য হত তাদের যে গোষ্ঠী কমবেশী অটুটই ছিল তাকে অবলম্বন করে কী করা যায় সেটা দেখানো। কিন্তু পশ্চিমে রইল অচল অবস্থা, এ ধরনের কোনো রূপান্তরণের চেষ্টা সেখানে হল না এবং পুঁজিবাদ দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে বিকাশ লাভ করতে লাগল। তখন যেহেতু রাশিয়ার পক্ষে কেবল এই গত্যন্তর ছিল: হয় গোষ্ঠীকে এমন এক উৎপাদন-রূপে গড়ে তোলা, যার সঙ্গে তার একাধিক ঐতিহাসিক স্তরের ব্যবধান এবং যার উপযোগী অবস্থা তখন এমনকি পশ্চিমেও পরিপক্ক নয়, — স্পষ্টতই এ কাজ অসম্ভব, — নয় পুঁজিবাদে বিকাশলাভ করা, তাই শেষোক্ত পথ গ্রহণ ছাড়া তার কীই বা করার ছিল ?

আর গোষ্ঠীর প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, তা ততদিনই সম্ভব যতদিন তার সদস্যদের মধ্যে ধনবৈষম্য নগণ্য থাকে। কিন্তু যে মুহূর্তে এই বৈষম্য বড় হয়ে ওঠে, যে মুহূর্তে সদস্যদের কেউ কেউ সমৃদ্ধতর সদস্যদের ঋণদাসে পরিণত হয়, সে মুহূর্ত থেকে গোষ্ঠী আর টিকতে পারে না। আপনাদের দেশের কুলাকেরা ও মিরয়েদরা* যে নির্মমতার সঙ্গে গোষ্ঠীকে ধ্বংস করছে, সোলোনের পূর্বে এথেন্সের কুলাকেরা ও মিরয়েদরাও ঠিক সেই নির্মমতার সঙ্গে এথেনীয় গোত্র-সংগঠনকে ধ্বংস করেছিল। এই প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস নিশ্চিত বলেই আমার আশঙ্কা। কিন্তু অন্যদিকে, পুঁজিবাদ নূতন পরিপ্রেক্ষিত ও নূতন আশার সৃষ্টি করছে। চেয়ে দেখুন, পশ্চিমে সে কী করেছে ও করছে। আপনাদের মতো মহান জাতি যে-কোনো সংকটই উত্তীর্ণ হবে। এমন কোনো বড় রকমের ঐতিহাসিক অকল্যাণ নেই যার ক্ষতিপূরণের মতো একটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া অনুপস্থিত। কেবলমাত্র কার্যপদ্ধতির পরিবর্তন হয়। Que les destinées s'accomplissent!**

২. স্টার্কেনবুর্গ সমীপে এঙ্গেলস

লণ্ডন, ২৫শে জানুয়ারী, ১৮৯৪

প্রিয় মহাশয়,

আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর এই:

১। যাকে আমরা সমাজেতিহাসের নির্ধারক ভিত্তি বলে মনে করি সেই অর্থনৈতিক সম্পর্কাবলী বলতে আমি বুঝি সেই পদ্ধতি, যাতে মানুষ কোনো নির্দিষ্ট সমাজে তাদের জীবনধারণের উপকরণ তৈরি করে এবং উৎপন্নগুলি (যে পরিমাণে শ্রমবিভাগ বিদ্যমান থাকে সেই পরিমাণে) নিজেদের মধ্যে বিনিময় করে। অতএব উৎপাদন ও পরিবহনের **সমগ্র টেকনিক** এর অন্তর্ভুক্ত। আমাদের ধারণা অনুসারে এই টেকনিক বিনিময়ের পদ্ধতিও নির্ধারণ করে এবং তাছাড়াও নির্ধারণ করে উৎপন্ন দ্রব্যের বণ্টন ও সেই সঙ্গে গোত্র-সমাজ ভেঙে যাবার পর, বিভিন্ন শ্রেণীতে সমাজের বিভাজনও, অতএব, প্রভুত্ব ও দাসত্বের সম্পর্ক এবং তার সঙ্গে রাষ্ট্র, রাজনীতি, আইন ইত্যাদি। তাছাড়া যে **ভৌগোলিক ভিত্তির** উপর অর্থনৈতিক সম্পর্কাবলী কাজ করে এবং অর্থনৈতিক বিকাশের পূর্বতন স্তরগুলির যে সকল অবশেষ প্রায়ই শুধু গতানুগতিকতা বা জাড্যের শক্তিতে বর্তমান স্তরে সঞ্চারিত হয় এবং তার মধ্যে টিকে থাকে, তারাও অর্থনৈতিক

---

* পরাশ্রয়ী। — সম্পাঃ

** ভবিতব্যই পূর্ণ হোক! — সম্পাঃ

সম্পর্কাবলীর অন্তর্ভুক্ত এবং, অবশ্য, যে বাহ্য পরিবেশ এই সামাজিক রূপকে ঘিরে থাকে তাও।

আপনি যা বলছেন, টেকনিক যদি সেইভাবে বহুলাংশে নির্ভর করে বিজ্ঞানের অবস্থার উপর, তবে বিজ্ঞান আরও বেশী নির্ভর করে টেকনিকের **অবস্থা** ও **প্রয়োজনের** উপর। সমাজের যদি একটা টেকনিকগত চাহিদা থাকে, তবে তা দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও বিজ্ঞানকে বেশী এগিয়ে নিয়ে যায়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ইতালিতে পার্বত্য ঝরণার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন থেকেই সমগ্র জলগতিবিজ্ঞানের (তরিচেলি প্রমুখ) উদ্ভব হয়েছিল। বিদ্যুৎশক্তির কারিগরী প্রয়োগ আবিষ্কৃত হবার পর থেকেই বিদ্যুৎশক্তি সম্পর্কে যুক্তিযুক্ত যা কিছু আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে, বিজ্ঞান যেন আকাশ থেকে পড়েছে এইভাবেই বিজ্ঞানের ইতিহাস লেখা জার্মানিতে রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২। আমরা মনে করি, অর্থনৈতিক অবস্থাই শেষ পর্যন্ত ঐতিহাসিক বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু জাতি (race) নিজেই একটি অর্থনৈতিক উপাদান। এখানে, অবশ্য, দুটি বিষয়কে উপেক্ষা করা চলবে না:

ক) রাজনৈতিক, আইনগত, দার্শনিক, ধর্মীয়, সাহিত্যিক, শিল্পগত ইত্যাদি বিকাশ ঘটে অর্থনৈতিক বিকাশকেই ভিত্তি করে। কিন্তু এদের সবগুলিই পরস্পরের উপর এবং অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরও ক্রিয়া করে। অর্থনৈতিক ভিত্তিই হল **একমাত্র সক্রিয় কারণ,** অন্যসব কিছু নিষ্ক্রিয় ফলাফল মাত্র, মোটেই তা নয়। বরং পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয় অর্থনৈতিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে যা সর্বদাই **শেষ পর্যন্ত** আত্মপ্রতিষ্ঠা করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সংরক্ষণ শুল্ক, অবাধ বাণিজ্য, ভাল বা মন্দ ফিনান্স ব্যবস্থা দ্বারা রাষ্ট্র প্রভাব বিস্তার করে। ১৬৪৮ সাল থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত জার্মানির শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত জার্মান ফিলিস্তিনদের যে মারাত্মক অবসাদ ও অক্ষমতা প্রথমে ভক্তিধর্মে এবং পরে ভাবালুতা এবং রাজা ও অভিজাতদের কাছে পদলেহী দাসত্বে আত্মপ্রকাশ করে, তার পর্যন্ত অর্থনৈতিক ফল ফলেছিল। পুনরুজ্জীবনের পথে সেই সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং যতদিন পর্যন্ত না বৈপ্লবিক ও নেপোলিয়নীয় যুদ্ধবিগ্রহ দীর্ঘস্থায়ী দুর্গতিকে সুতীব্র করে তুলেছিল, ততদিন এই বাধাকে নড়ানো যায়নি। তাই, কেউ কেউ যে এখানে ওখানে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী ধরে নেন অর্থনৈতিক অবস্থার ফল আপনা থেকেই ফলে, তা আদৌ ঠিক নয়। মানুষ নিজের ইতিহাস নিজেরাই সৃষ্টি করে, কিন্তু সে কেবল একটি প্রদত্ত পরিবেশের মধ্যে, যা দিয়ে এই ইতিহাস সর্তবদ্ধ, এবং আগে থেকেই বিদ্যমান প্রকৃত সম্পর্কাবলীর ভিত্তিতে; এই সম্পর্কাবলীর মধ্যে অবশ্য অর্থনৈতিক সম্পর্কাবলী যতই অন্যান্য রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সম্পর্কের দ্বারা প্রভাবিত হোক

না কেন, শেষ পর্যন্ত তা-ই নির্ধারক হয়, মূল সূত্রের মতো তা সমস্ত বিকাশের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত এবং একমাত্র তার দ্বারাই বিকাশের উপলব্ধি সম্ভব হয়।

খ) মানুষ নিজেরাই তাদের ইতিহাস সৃষ্টি করে, কিন্তু এখনও তা কোনো যৌথ পরিকল্পনা অনুযায়ী একটা যৌথ অভিপ্রায় অনুসারে অথবা এমনকি একটি নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ প্রদত্ত সমাজের মধ্যেও নয়। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সংঘাত ঘটে এবং ঠিক সেইজন্যই এই সমস্ত সমাজ যে **আবশ্যিকতার** দ্বারা শাসিত হয়, তা **আপতিকতার** দ্বারা পরিপূরিত এবং আপতিকতা রূপে উদ্ভূত হয়। সমস্ত আপতিকতার বিরুদ্ধে যে আবশ্যিকতা এখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, সেটা হল শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক আবশ্যিকতা। এখানেই আসে তথাকথিত মহাপুরুষদের কথা। ঠিক অমুক ব্যক্তিই যে একটি বিশেষ দেশে ও বিশেষ সময়ে আবির্ভূত হল সেটা অবশ্য নিছক আকস্মিক ঘটনা। কিন্তু তাকে সরিয়ে রাখুন, দেখতে পাবেন তাঁর বিকল্পের দাবি উঠেছে এবং এই বিকল্প পাওয়া যাবে, ভাল হোক মন্দ হোক শেষ পর্যন্ত এই বিকল্প মিলবেই। নিজের যুদ্ধ বিগ্রহে অবসন্ন ফরাসী প্রজাতন্ত্র যে একজন সামরিক ডিক্টেটরকে আবশ্যক করে তুলেছিল, সে যে ঠিক ঐ কর্সিকাবাসী নেপোলিয়নই হলেন, তা আকস্মিক ঘটনা; কিন্তু নেপোলিয়ন না থাকলে অন্য যে-কোনো লোক তার স্থান পূরণ করত। তার প্রমাণ এই যে, যখনই প্রয়োজন হয়েছে তখনই কাম্য লোকটি পাওয়া গেছে: সিজার, অগাস্টস, ক্রমওয়েল ইত্যাদি। মার্কস ইতিহাস সম্পর্কে বস্তুবাদী ধারণা আবিষ্কার করেছিলেন বটে, কিন্তু এই আবিষ্কারের জন্য যে চেষ্টা চলছিল, তিয়েরি, মিনিয়ে, গিজো এবং ১৮৫০ সাল পর্যন্ত সমস্ত বৃটিশ ঐতিহাসিকই তার প্রমাণ এবং মর্গান কর্তৃক ঐ একই ঐতিহাসিক ধারণার আবিষ্কার প্রমাণ করেছে যে, এই আবিষ্কারের সময় এসে গিয়েছিল এবং সে আবিষ্কার **করতেই হত**।

ইতিহাসের অন্য সমস্ত আপতিকতা এবং আপাত আপতিকতার বেলাতেও ঠিক এই। অনুসন্ধানাধীন বিশেষ ক্ষেত্রটি যতই অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকে দূরে, বিশুদ্ধ বিমূর্ত-মতাদর্শগত ক্ষেত্রের নিকটবর্তী হবে, ততই বেশী করে তার বিকাশপথে আপতিকতা দেখা দেবে, ততই তার বক্ররেখাটি এঁকেবেঁকে চলবে। কিন্তু এই বক্ররেখার গড় অক্ষকে যদি টানা যায় তাহলে দেখা যাবে আলোচ্য কাল যত দীর্ঘ হবে এবং আলোচ্য ক্ষেত্র যতই বিস্তৃত হবে, ততই বেশি এই বক্ররেখার অক্ষ অর্থনৈতিক বিকাশের অক্ষের কাছাকাছি, সমান্তরালভাবে যাবে।

জার্মানিতে অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে পুঁথিপত্রের দায়িত্ব-হীন অবহেলাই হচ্ছে বিষয়টিকে নির্ভুলভাবে বুঝার পক্ষে বাধা। ইস্কুলে থাকতে ইতিহাস সম্পর্কে যে সমস্ত ধারণা মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয় সেগুলি থেকে মুক্ত হওয়া খুবই কঠিন শুধু তাই নয়, এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে বার করা আরও কঠিন। যেমন, কে পড়েছে

বৃদ্ধ গু. ফন গ্যুলিখের* লেখা, যাঁর তথ্য-সঙ্কলন নীরস হলেও অসংখ্য রাজনৈতিক ঘটনা ব্যাখ্যার উপযোগী মালমসলায় ভর্তি?

তাছাড়া, মার্কস তাঁর 'আঠারোই ব্রুমেয়ার' গ্রন্থে যে চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, আমার মনে হয় তাই থেকেই আপনি আপনার প্রশ্নগুলির যথেষ্ট জবাব পাবেন শুধু এই জন্যে যে, এটি একটা ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত। আমার মনে হয়, ইতিপূর্বেই আমি অধিকাংশ বিষয় নিয়েই আলোচনা করেছি 'অ্যান্টি-দ্যুরিং'এ, প্রথম অধ্যায় ৯—১১ পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় অধ্যায় ২—৪ পরিচ্ছেদ এবং তৃতীয় অধ্যায় ১ পরিচ্ছেদে, কিম্বা মুখবন্ধে, তাছাড়া 'ফয়েরবাখ'এর শেষ অংশেও।

অনুগ্রহ করে উপরোক্ত প্রতিটি কথা নিক্তিতে ওজন করবেন না, সাধারণ সম্পর্কটি মনে রাখবেন। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, প্রকাশের জন্য লিখতে হলে ঠিক যেমন যথাযথভাবে আমাকে লিখতে হত, আপনার চিঠির জবাবে তা লেখবার মতো সময় আমার নেই ...

* বহু খণ্ডে সমাপ্ত গ. গ্যুলিখের এই বইটির কথা এঙ্গেলস বলছেন: *Geschichtliche Darstellung des Handels, der Gewerbe und des Ackerbaus der bedeutendsten handelstreibenden Staaten unserer Zeit* (আমাদের কালের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক রাষ্ট্রগুলির বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষির ঐতিহাসিক বিবরণ), ইয়েনায় প্রকাশিত, ১৮৩০-৪৫। — সম্পাঃ

বিষয় সূচি

উ

ঐ

ও

ক

খ

গ

চ

জ

ট

ড

ত

দ

স

হ

নামের সূচি

ব

র

ল